সমাজসংস্থা আশানিরাশা

অশোক মিত্র

প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭২ : জুন, ১৯৬৫

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ ২১১ ০০১
১০২ প্রসাদ চেম্বার্স, অপেরা হাউস, বোম্বাই ৪০০ ০০৪
৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড, নতুন দিল্লি ১১০ ০০২

প্রচ্ছদশিল্পী :
বাদশাহ্‌ আলম

মুদ্রক :
শ্রীবিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

শচীন চৌধুরী-র স্মৃতিতে

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বারো-তেরো বছরের সময় জুড়ে এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছে ; হয়েছে না-ব'লে হয়েছিল বললেই হয়তো অধিকতর ন্যায়ভাষণ হতো। এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত নানা রচনা, আজ হঠাৎ এক বন্ধনীর মধ্যে জায়গা পেল।

গ্রন্থটির নামকরণ ক'রে দিয়েছেন বন্ধুবর লোকনাথ ভট্টাচার্য ; নাম থেকেই নিহিত দ্যোতনা অনেকটা ধরা পড়ছে। বারো-তেরো বছর মানে আমাদের ঐতিহ্যশুদ্ধ এক যুগ। এক যুগের দূরত্ব পেরিয়ে আসতে-আসতে মনের চেহারা কীরকম ঘোরতর বদলে যেতে পারে তার প্রমাণ এই প্রবন্ধাবলী। আশা থেকে নিরাশায় অতিক্রমণে কোনো আনন্দ নেই, নিছকই গ্লানি। আপাতত আমার মনে গ্লানিরই একমাত্র অধিকার : সমাজসংস্থা নিয়ে বছর বারো-তেরো আগে যে-উজ্জ্বলকজ্জল স্বপ্নশোভা বুনন ক'রে আনন্দ পেতাম, তা নির্বাপিত-বিসর্জিত। অনেক ঘাটের জল খেয়ে, অনেক মাঠের রোদে পুড়ে আমরা অভিজ্ঞ হই, প্রাগল্ভীক্ষিক আশাকে সংযত ক'রে আনতে শিখি। সেই সংযমে বৃত হবার ধারাবাহিক কাহিনী এই বই।

সমাজের শ্রেণীগত সম্পর্ক না-বদলালে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশাল-কোনো পটান্তর না-ঘটলে, ভারতবর্ষে আর্থিক প্রগতি ব্যাহত থাকবে, মোটামুটি এই প্রত্যয়ে আমি এখন স্থিত হয়েছি। প্রগতি কলাকৌশলের ব্যাপার নয়, আরো গহনে যেতে হবেই। স্রেফ শৈলীর দীপ্তি দিয়েই যদি আর্থিক অবস্থার মোড় ফেরানো সম্ভব হতো, তা হ'লে আমরা গত দেড় দশকে বহুদূর এগিয়ে যেতাম। কিন্তু স্থূল ব্যাপার তা নয়। শ্রেণীগত স্বার্থ, খণ্ডরাজ্যগত স্বার্থ, দলসম্প্রদায়উপসম্প্রদায়গত স্বার্থ, যেখানে প্রতি পদে জাতির মূল লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রয়াসকে ব্যাহত করছে, আস্তিকতায় শিব হয়ে থাকা সেখানে হয় ভণ্ডামি, নয় মূর্খতা। দুধ-ও-তামাকে একই সঙ্গে সমান আগ্রহ থাকলে জাতীয় উন্নতি পরাহত থাকবে, অন্তত ধনবিজ্ঞান সে-কথাই বলে। দেশের যাঁরা হাল ধ'রে আছেন, উৎকীর্ণ সমস্যাগুলি সমাধানের প্রধান দায়িত্ব যাঁদের, তাঁরা কিন্তু এই সত্যটি মানতে রাজি নন। তিতিক্ষার কাছাকাছি অলিন্দ দিয়েও হাঁটতে তাঁরা গররাজি,অপ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের অনীহা. গোষ্ঠীস্বার্থের মায়া কাটিয়ে উঠতে তাঁরা অপারগ। এই চার্বাকভক্তরা যতদিন রাজত্ব করবেন, মনে হয়

না দেশের খুব-একটা হালফিল বদলাবে। সাময়িকভাবে, এক বছর-দু'বছর, এখানে-ওখানে, একটু-আধটু শ্রী-ছাঁদ পরিবর্তিত হ'তে পারে, কিন্তু সব-মিলিয়ে কিছু হবার নয়। শেষ পর্যন্ত, ইতিহাস তার দ্বান্দ্বিকতার নিয়মে প্রত্যাবর্তন করবেই।

আমাদের সামনে প্রাবৃট অশান্তি। উপায় নেই, অনেক আরক্ততার মধ্য দিয়ে যেতে হবেই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ফের নতুন ক'রে আশাপোষণ শুরু করবার আগে, এ ধরনের আশাপোষণ যাতে সম্ভব হয় আসলে সেজন্যই, উপস্থিত মুহূর্তে তাই নিরাশায় তন্নিষ্ঠ হ'তে হচ্ছে।

'চতুরঙ্গ', 'পরিচয়', 'পূর্বাশা', 'ক্রান্তি', 'এক্ষণ', 'কম্পাস', 'গণবার্তা' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল; বেশ কয়েকটি 'চতুরঙ্গে'। আমার পরম সুহৃদ আতাউর রহমানের আগ্রহ এবং উৎসাহ না-থাকলে এদের অধিকাংশই হয়তো অলিখিত থাকতো। আজ রচনাগুলি একত্র করতে গিয়ে এই তথ্যটি সুগভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

'রূপা'র স্বত্বাধিকারী শ্রীদাউদয়াল মেহ্‌রা অত্যন্ত যত্ন নিয়ে নিজে থেকে এই বই প্রকাশ করতে এগিয়ে এসেছেন; তাঁকেও আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার।

১ মার্চ, ১৯৬৫ — অশোক মিত্র

নতুন দিল্লি

সূচী

পরিকল্পনার ভূমিকা

অজ পাড়াগাঁ থেকে ধ'রে এনে একটা হাবা ছেলেকে ব্যস্তমুখর নগরের ভিড়ে ছেড়ে দাও : লেখাপড়া শেখানোর দিকে নজর দেওয়ার দরকার নেই, কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারেও না ভাবলে চলবে ; শুধু সে ঘুরে বেড়াক নগরের রাস্তায়-ঘাটে, দেখুক গাড়ি-বাড়ি-বিদ্যুতের ঝলক ; এক মাসের মধ্যে অন্য মানুষ হয়ে যাবে সে, তার চলনে-বলনে-বুদ্ধিতে উজ্জ্বলতা ছুঁয়ে যাবে, তার দক্ষতা বাড়বে অনেকগুণ।

অত্যন্ত মেঠো কথা এটা, সাধারণ ভাবনাতেই যা ধরা পড়ে। এই প্রায়-তুচ্ছ সিদ্ধান্তটিকে ব্যবহার ক'রেই আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে মার্কিন ধনবিজ্ঞানী এ্যালীন ইয়ং অর্থনীতির একটি চমৎকার সূত্র বাৎলেছিলেন। কোনো দেশে যখন শিল্প-আলোড়ন দানা বেঁধে ওঠে, একই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক কলকারখানার গোড়াপত্তন হয়, চারদিকে উৎপাদন আর বিনিয়োগবৃদ্ধির সমারোহ, তখন যে শুধু বিভিন্ন শিল্পের পারস্পরিক বিনিময়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মোড় ফিরে যায় তা নয়, এমন তীব্র কর্মব্যস্ততার ফলে আবহাওয়াই অন্যরকম হয়ে যায়, কারখানার নিঃশ্বাসে আকাশ আরক্ত হয়ে আসে, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের প্রয়াসে প্রতি দিগন্তে একটি চকিত ভাব ছড়িয়ে পড়ে। লোকের মুখে-মুখে আর্থিক উন্নতি নিয়ে চিন্তা, বৈজ্ঞানিক সূত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারিক প্রণালী নিয়ে আলোচনা, হঠাৎ এক ধাপে সমাজের সামগ্রিক জ্ঞানের পরিমাপ অনেক উঁচুতে উঠে যায়। সাধারণ লোকের দক্ষতা বাড়ে, সাহসও সেই সঙ্গে ; যা শুরুতে ছিল বিচ্ছিন্ন কয়েকটি শিল্পের পত্তন, তা রূপ নেয় এক বিরাট আশাবাদের মহীরুহে, ফলে আর্থিক প্রগতির বেগ ও বিস্তার দুটোই লাভবান হয়। জাতীয় উন্নতির এই যে গোপন কাঠি, ইয়ং তার নাম রেখেছিলেন potential indivisibility, যেহেতু এই

সম্ভাব্য শক্তিকে জাগিয়ে তোলা যায় একমাত্র যদি একটি অখণ্ড, সমগ্র চেষ্টা হয় দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য, তা হ'লেই।

অর্থনীতিকে বলা হয়ে থাকে 'হতাশার বিজ্ঞান'। কিন্তু আসলে জাতীয় চেতনায় সুদৃঢ় আশাবাদ সঞ্চার করতে না পারলে দেশের ধন-সম্পদ, দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান, শিল্পবাণিজ্যের সম্ভার, সমস্ত-কিছুই অসম্ভব। বিনিয়োগের প্রসার সর্ববিধ আর্থিক উন্নতির মূল সূত্র। তার জন্য প্রয়োজন সাহস, ঝুঁকি নেবার মানসিক প্রস্তুতি, সংগঠনপ্রতিভা, এবং, অন্য সব-কিছু ছাপিয়ে, দেশের লোকের ত্যাগ-স্বীকার করবার মতো প্রবণতা। এই প্রবণতা থাকতে পারে যদি লোকের মনে আশা থাকে, ভবিষ্যতের স্বপ্নে যদি তাদের বিশ্বাস থাকে। যেখানে অনীহা বা অনাস্থা, কর্মকর্তাদের হাজার উপরোধও সেখানে অসফল হ'তে বাধ্য। এ-উক্তির মানে অবশ্য এই নয় যে, যে-মুহূর্তে অনীহা এসে জাতীয় অগ্রগতির পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে, সঙ্গে-সঙ্গে হাল ছেড়ে দিয়ে শুভতর সংযোগের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে। বরঞ্চ এ-রকম অবস্থায় সমস্ত প্রাথমিক অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার লক্ষ্য হবে অনীহাকে জয় করা, জাতির সামগ্রিক চেষ্টার ফলে শতাব্দীর দৈন্যকে যে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে লাঘব করা চলে, এই সত্য সম্বন্ধে লোক-মানসকে নির্দ্বন্দ্ব করা। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে, স্বীকার করতেই হয়, আর্থিক পরিকল্পনার সমান্তরালতায় এ-ধরনের লোকশিক্ষা বিস্তারের প্রচুর চেষ্টা হয়েছে ও হচ্ছে, যদিও, সাম্প্রতিক কিছু-কিছু ঘটনাবলী থেকে মনে হয়, কোথাও-কোথাও সে-সাযুজ্য নিটোল হয়নি, অতএব অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ঘটেছে।

এ-রকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমাদের দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বিচার করা শ্রেয়। এই শতাব্দীর গোড়ায়, স্বদেশী আন্দোলনের সময়, গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ সত্যাগ্রহের মধ্যে, তিরিশ সালের সন্ত্রাসবাদ ও আইন-বিরোধী আন্দোলনের শীর্ষে, সব শেষে অগস্ট বিপ্লবের সময় পর্যন্ত, একটা অদ্ভুত উত্তেজনা

ও আলোড়নের তীব্র প্রবাহ জাতির মেরুদণ্ড সদাশিহরিত রেখেছে। খবরকাগজের ভাষায় এই উদ্দীপ্তিকে বলা হতো 'জাতীয়তাবোধ', এবং, সন্দেহ নেই, অনেক ধরনের খাদ মেশানো ছিল তাতে। তা হ'লেও যে-আশাবাদ বাদ দিয়ে জাতি উঠতে পারে না, তীক্ষ্ণ সংঘর্ষের আরক্ততার মধ্যে বাঁচতে পারে না, এগিয়ে যেতে পারে না, সেই আশার আবহাওয়া সে-রকম বোধ থেকে জন্ম নিয়েছিল। স্বাধীনতা-লাভের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে উদ্দীপ্তি ফিকে হয়ে যায়, কিছুটা বিষাদ, কিছুটা অবসাদ, এমনকি কখনো-কখনো সুবংকিম নাস্তিকতা সমাজের অনেক স্তরে ১৯৪৭ সালের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে আচ্ছন্ন ক'রে আসে। কারণ অবশ্য অনেকগুলোই : যে-উৎসাহ জাতিকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধ'রে চালিয়ে নিয়ে এসেছিল, তা রাজনৈতিক মুক্তিলাভের সঙ্গে-সঙ্গে অনেকের মধ্যে ঝিমিয়ে আসে ; যে-বিশেষ রূপ নিয়ে রাজনৈতিক মুক্তি এলো, অনেকের কাছে তা মেকি ব'লে মনে হলো, তাঁরা তাই নিজেদের বিযুক্ত ক'রে নিলেন ; স্বাধীনতালাভের সঙ্গে-সঙ্গে দেশের লোকের শ্রীসম্পদ সহস্রগুণ এমনিতেই বৃদ্ধি পাবে, এ-রকম বাষ্পসর্বস্ব ধারণা নিয়ে যাঁরা এতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁদেরও উত্তেজনায় ছন্দপতন ঘটলো। প্রাক্-স্বাধীনতা জাতীয় আন্দোলনের সম্ভবত জাদু ছিল এটাই যে, যেহেতু তার কল্পনা খুব অস্পষ্ট ছিল, সকলেই নিজের মনের মাধুরী দিয়ে তা পূরণ ক'রে নিতে পারতো, পূরণ ক'রে নিয়ে সুখী থাকতো, উৎসাহে তদ্গত হ'তে বাধা ছিল না তাই। যে-মুহূর্তে সে-কল্পনাশ্রিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ক্রান্তিসময় এলো, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল জাতির সামগ্রিক উৎসাহবোধ।

দেশের আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে থেকেছে, অন্তত গত দশ বছরের কথা বলা চলে, লোকমানসের এই নিরুৎসাহবোধ। ধনবিজ্ঞানের সাধারণতম সূত্র এগুলো যে, জাতীয় বিনিয়োগের হার বাড়াতে হবে, শ্রমিকশ্রেণীর উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতে হবে, অন্যথা জাতীয় উপার্জনের হার একই রকম থেকে যাবে, উন্নতির

সব রাস্তা বন্ধ। বিনিয়োগবৃদ্ধির একমাত্র উপায় হলো নিবৃত্তি, নিবৃত্তি থেকেই কৃষিতে-শিল্পে-বাণিজ্যে অধিকতর নিযুক্ত করা চলে এমন সম্পদের সংস্থান হওয়া সম্ভব, তা থেকেই গড়পড়তা উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি। দেশের আর্থিক প্রগতির গোড়ার কথা তাই নিবৃত্তি-দর্শন। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধ'রে ভারতবর্ষের মানুষ এই দর্শনে সমাহিতির সঙ্গে কান পেতেছে। কিন্তু সে-সমাহিতি যখন আর নেই, নতুনভাবে কী ক'রে তা হ'লে নিবৃত্তির ধর্ম প্রচার করা চলে?

এটা তাই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। নেতারা যতই শ্রদ্ধা পেয়ে থাকুন না কেন, সে-আশ্চর্য যুগ আর নেই যখন তাঁদের নিছক আহ্বানেই কাতারে-কাতারে লোক প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসবে; লোকের বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা কমেছে, যে-লক্ষ্যের কথা বলা হচ্ছে তার সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণাও তেমন নেই। অতএব প্রতীক্ষা প্রয়োজন; যে-মানসিকতা না থাকলে দ্রুত প্রগতি সম্ভাব্যতার বাইরে, তাকে সন্তর্পণে লালন করতে হবে, তাকে বাদ দিয়ে এগোতে গেলে পা পিছলে বিপর্যয় বাধবারই আশঙ্কা।

এই মুখবন্ধটি স্বীকার ক'রে নিলে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্রিয়াক্রর্মের অনেক-কিছুই সহানুভূতির সঙ্গে দেখা চলে। সম্প্রতি অবশ্য আর্থিক পরিকল্পনাবিষয়ক লেখালেখি ও বইপত্রের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে, কিন্তু কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এ-বিষয় সম্বন্ধে লোকের মনে মাত্র ভাসা-ভাসা ধারণা ছিল। সোভিয়েট দেশে এ-ধরনের পরিকল্পনা কেমন অদ্ভুত রূপান্তর এনে দিয়েছে, তা নিয়ে রূপকথা-প্রতিম জল্পনা অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু পরিকল্পনার প্রত্যয়, গঠন, প্রণালী, ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে সামান্য চিন্তার সূত্রপাতও হয়নি। তা ছাড়া, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোগুলো বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভূমিকাতেও যে আর্থিক পরিকল্পনার একটি বিশেষ বিবর্তন সম্ভব, সে-সম্বন্ধেও ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। সব শেষে, দেশ-ভাগের ফলে যে-বিশৃঙ্খলা যাচ্ছিল, সব-ছাপিয়ে খাদ্যদ্রব্যের অনটন, তা প্রায় অনুশাসন উচ্চারণ ক'রে গেল ঐ মুহূর্তে অর্থনীতির ক্ষেত্রে

আগে-পরের ব্যাপার কী ক'রে ঘোচাতে হবে, এবং প্রথম পরিকল্পনায় কোন্-কোন্ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম পরিকল্পনায় যা তাই প্রধান লক্ষণীয় বিষয় তা একটি অনুচ্চারিত বিনয়, পরিমিতিবোধ। দু'দিক দিয়েই বিনয়: লক্ষ্যের বিষয়ে, সেই সঙ্গে প্রকরণের ব্যাপারেও। লক্ষ্য ছিল খুবই সীমিত: পাঁচ বছরে জাতীয় উপার্জন শতকরা এগারো বিন্দু এগোবে, বিশেষ ক'রে চাল, গম, কার্পাস, পাট, চিনি এ-রকম কৃষিজ দ্রব্যাদির উৎপাদন নির্দিষ্ট কতগুলো হারে বাড়াতে হবে; তা ছাড়া, কয়েকটি বহুঔদ্দেশ্যিক বিদ্যুৎ উদ্যোগের পত্তন, রেল এঞ্জিন ও চাষের সারের কারখানা, ছোটোখাটো নানা এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে উৎসাহদান, একটা ইস্পাতের কারখানা শুরু করা যায় কিনা সে-সম্বন্ধে প্রস্তাব। সেই সঙ্গে অবশ্য পল্লীউন্নয়নের জন্য অনেকপ্রকার ব্যবস্থা। প্রকরণের দিক থেকেও বলা চলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গঠন খুবই ঋজু, সহজ: জাতির আর্থিক ব্যবস্থার সব-কিছু প্রভাবান্বিত করার কোনো অভিলাষ নেই, ধনবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম সাম্প্রতিকতম সূত্রের মারফত জ্ঞান-কপচানো নেই, কার্যক্রমের তালিকাগুলোকে সামান্য-একটু বিশ্লেষণের মালা পরিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, শুধুমাত্র যোগ করা হয়েছে পাঁচ বছর শেষ হ'লে জাতীয় আয়ের চেহারা কেমন দাঁড়াবে, এবং সে-অবস্থায় বিনিয়োগের হারই বা কেমন রূপ নেবে, তা নিয়ে একটি চিত্রকল্প।

যেখানে লক্ষ্য উঁচু নয়, আশাভঙ্গের সম্ভাবনাও সেখানে কম। প্রথম পরিকল্পনা তাই মোটের উপর সফলই হয়েছে: কৃষিজাত উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে, তা সে পরিকল্পনাভুক্ত বহুবিধ উদ্যমের জন্যই হোক, কি সুমিত বৃষ্টির জন্যই হোক; শিল্পোৎপাদনও চমৎকার গতিতে অগ্রসর হয়েছে; এবং সব-মিলিয়ে জাতীয় আয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে শতকরা এগারোর কিছু বেশিই বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য পক্ষে যেটা উদ্‌বেগের কথা, বিনিয়োগের হার আপেক্ষিকভাবে বাড়েনি, এবং এ-হার যথাশীঘ্র বাড়াতে না পারলে অচিরে প্রগতি রুদ্ধ হয়ে

যাবে। বিভিন্ন শিল্পে পূর্ববর্তী বিনিয়োগের ফলে যেহেতু বাড়তি উৎপাদনক্ষমতা ছিল, সমকালীন বিনিয়োগ সুবিধাজনক না হওয়া সত্ত্বেও তাই প্রথম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় ব্যাহত হয়নি। কিন্তু নতুন পুঁজি খাটানো না হ'লে প্রাক্তন ক্ষমতার উপর নির্ভর ক'রে এ ধরনের উৎপাদন সম্প্রসারণ খুব বেশিদিন সম্ভব নয়। বিনিয়োগের হার অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে কারণ জাতীয় করের হার বাড়ানো যায়নি, অতএব প্রতিশ্রুত অনেক সরকারি উদ্যোগ হয় আরম্ভ করাই হয়নি, নয়তো ঢিমে তালে এগিয়েছে; ঘাটতি অর্থনীতি প্রয়োগ করার যে-প্রস্তাব প্রথম দিকে হয়েছিল তা-ও শেষ পর্যন্ত প্রায় অনারব্ধ থেকেছে; এবং বেসরকারি মহলেও উদ্যোগের বিস্তার বাড়ানোর জন্য তেমন-কোনো উৎসাহ দেখা যায়নি। শেষোক্ত শ্রেণীর মানসিকতা বুঝে ওঠা অবশ্য কঠিন নয়, জনমনে সাধারণত পরিকল্পনা বিষয়টির সমীকরণ হয়ে থাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে; গণ্যমান্য অনেক ব্যবসায়ী-সমর্থিত বোম্বাই পরিকল্পনার খসড়া সত্ত্বেও, অনেকেই তাই নতুন উদ্যমে অঙ্গীকার নেওয়ার আগে কয়েকটা বছর প্রতীক্ষারত থাকাই বুদ্ধিমত্তা ব'লে মনে করেছেন।

তা হ'লেও প্রথম পরিকল্পনার পরোক্ষ শুভফল হয়েছে অনেকগুলো। উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতির আতঙ্ক ঘুচেছে, কৃষির শ্রীবৃদ্ধির ফলে দুর্ভিক্ষের ছায়াও স'রে গেছে। সর্বসাধারণের মনে একটা প্রত্যয় ও আস্থাশীলতার ভাব এসেছে। পল্লীউন্নয়নের হরেকরকম কার্যক্রম থেকে গ্রামাঞ্চলের লোকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তাৎক্ষণিক কোনো উন্নতি যেখানে-যেখানে না-ও হয়েছে, সংযোগের সেতু অন্তত একটি স্থাপিত হয়েছে, পল্লীবাসীদের ঐতিহ্যগত অনীহা ও হতাশা দূরীকরণের জন্য অনেক নিরীক্ষা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। যৌথবদ্ধতার জাদুকরী ক্ষমতা, আর্থিক পরিকল্পনার উপকারিতা, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার পরিমণ্ডল গ'ড়ে তোলা থেকেই পরিণামে অনেক লাভের সম্ভাবনা।

আসলে প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বছরে এটাই হয়েছে সবচেয়ে মস্ত

লাভ: যে-আবহের কথা প্রবন্ধের শুরুতে বলা হয়েছে, যাকে বাদ দিয়ে জাতীয় অগ্রগতি আদৌ সম্ভব নয়, আস্তে-আস্তে সেই পরিবেশ দেশে যেন গ'ড়ে উঠছে। লোকসভা ও বিধানসভার আলোচনায়, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, নেতা ও মনীষীদের ভাষণে ফল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও যা বড়ো, লোকমানসে পরিকল্পনার শুভংকরিতা সম্বন্ধে প্রতীতি অভিজ্ঞতার উৎস থেকেই এসেছে। ছোটো উদাহরণেও চমৎকার উপকার পাওয়া যায়, যদি তা সঙ্গে-সঙ্গে কল্পনাকে হরণ করতে পারে। প্রথম পরিকল্পনার সীমা খুব স্বল্প হ'লেও লোকে তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় তার শুভ অনুভব করছে, সেখানেই তাই সফলতা।

আর এক দিক দিয়েও মহৎ সমৃদ্ধি হয়েছে। লোকে ঠেকে শেখে, দেখে শেখে; অভিজ্ঞতা ও সংঘাতের ভিতর দিয়ে জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে নেয়। গেলো পাঁচ-ছ বছরে পরিকল্পনার রূপ, গঠন, প্রকরণ ও বিবিধ সমস্যা নিয়ে দেশে এত বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে যে অনেক অস্পষ্টতা সরল হয়ে এসেছে। অনেক কুসংস্কার ঘুচেছে, সাধ্য ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে ধারণা আবেগের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ অন্বীক্ষার ঋজুতা পেয়েছে। চিন্তার এই বিস্তার ও ব্যাপ্তি শুধু যে পেশাদারী ধনবিজ্ঞানী ও সরকারি পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে ছড়িয়েছে তা নয়, ব্যবসায়ীমহল, সাধারণ কর্মজীবী, ছাত্র, শ্রমিক—এমনকি সাধারণ চাষী—সর্বশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, সাধ্য, সিদ্ধি, প্রণালী প্রভৃতি ব্যাপারে প্রভূত জ্ঞানপ্রাপ্ত হচ্ছে। বিশেষ ক'রে, এ-জ্ঞান যে উপর থেকে জোর ক'রে চাপানো হচ্ছে না, অন্তঃশীল আগ্রহেই—এবং নিজের-নিজের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে নিয়ে—যে লোকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সূত্রগুলো শিখে নিচ্ছে, সে-লাভের তুলনা নেই।

অতএব এটা জোয়ারের সময়। যে-উত্তাল উৎসাহবোধ জাতীয় অগ্রগতিকে এক ঝাপটায় অনেক যোজন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তার সূচনা নিঃসন্দেহে দেখা দিয়েছে। এই চেতনার সুযোগ না

নিলে আরো হয়তো অনেক বছর ধ'রে নতুন ক'রে অপেক্ষায় থাকতে হবে। প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বছরে জাতীয় আয় এক-দশমাংশের কিছু বেশি বেড়েছে, কিন্তু আমরা যে-দৈন্যদশায় আছি, তা ঘোচাতে হ'লে এই বৃদ্ধির হার কিছুই নয়। পশ্চিমের সমৃদ্ধিশীল সব-ক'টি দেশেই জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার এর চেয়ে বেশি, সুতরাং আমাদের প্রগতি আরো দ্রুত না করতে পারলে আমরা তুলনায় ক্রমশ পিছিয়েই পড়বো। তজ্জনিত যে-সমাজবিক্ষোভ একদিন অবশেষে বিস্ফোরণ হয়ে দেখা দেবার আশঙ্কা, তা এড়াতে হ'লে তাই যে-ক'রেই-হোক বর্তমান মুহূর্তে বিনিয়োগের হার টেনে উপরে তুলতে হবে। এখানেই ত্যাগস্বীকারের প্রশ্ন আসছে: সরকারকে কর এবং ধার দু'টোই অনেক বেশি ক'রে লোককে দিতে হবে, নইলে দ্রুত অবস্থা-পরিবর্তন সম্ভব নয়; তা ছাড়া, কিছু-পরিমাণ ঘাটতি অর্থনীতি প্রয়োগ করলে মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে সাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিশপত্র যে একটু মহার্ঘ হয়ে উঠবে, সে-ত্যাগও প্রসন্নহৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে। সরল বিবৃতির সাহায্যে লোকমনে এ-সত্যগুলো অনুপ্রবেশ করানো প্রয়োজন। প্রত্যেক জিনিশের জন্যই একটা মূল্য দিতে হয়ে থাকে, জাতির দ্রুত শ্রীসম্পদবৃদ্ধি করতে হলে তার জন্য আপাতত যে-দাম দেওয়ার তা-ও তাই দিতেই হবে। অধুনা আর্থিক পরিকল্পনার বিষয়ে দেশে যে-আগ্রহ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তা থেকে মনে হয় কল্পনা ও কুশলতার সঙ্গে দেশবাসীকে এ-আহ্বান জানানো হ'লে প্রয়োজনানুরূপ সাড়া পাওয়া যাবেই।

এই সিদ্ধান্তই দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভূমিকা। পরিকল্পনাটির যাঁরা খসড়া করেছেন, প্রথম পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা থেকে তাঁদের সাহস বেড়েছে, আশা বেড়েছে, প্রাকরণিক দক্ষতাও অনেকখানি এগিয়েছে। এবার লক্ষ্য আগামী পঞ্চবর্ষে জাতীয় আয়ের পরিমাণ আরো-একচতুর্থাংশ বাড়িয়ে তোলা। যদিও কৃষির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট, শিল্পের ক্ষেত্রে—বিশেষ ক'রে বড়ো-বড়ো কলকব্জা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সিমেন্ট, সমস্ত-কিছু খনিজ—বিনিয়োগ বহুগুণ

বৃদ্ধির উপর প্রধান ঝোঁক গিয়ে পড়েছে। জাতীয় প্রগতির হার যেহেতু মূলত শিল্পের প্রসারের উপরেই বিশেষ ক'রে নির্ভরশীল, তাই এই ঝোঁক খুবই স্বাভাবিক ও সময়ানুগ। সেই সঙ্গে বড়ো-বড়ো কারখানায় যেহেতু বেশি লোক-খাটানো সম্ভব নয়, যাতে বেকার সমস্যা বেড়ে না চলে সেজন্য কুটিরশিল্প বিস্তারের জন্যও ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হয়েছে। লোকমানসে আগ্রহ, এবার শুধু যদি প্রয়াস ক'রে এক সঙ্গে অনেকগুলি কলকারখানার শুরু ক'রে দেশে শিল্পসাধনার একটি ঘন আবহাওয়া সৃষ্টি করা চলে, তা হ'লে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে দেশের সম্পদ বেড়ে যাবে, ইয়ং-কথিত potential indivisibility-র প্রসাদে আমরা বহুল লাভের অংশভাগী হবো।

ঘুরে-ফিরে একই কথাতে ফেরা তা হ'লে : সমস্যা হলো বিনিয়োগ বাড়ানো নিয়ে, লোকে ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি হবে কিনা তা নিয়ে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রে বলা হয়েছে জাতীয় বিনিময়ের হার এ-পাঁচ বছরে শতকরা সাত থেকে শতকরা এগারোতে তুলতে হবে। সে-সাফল্য নির্ভর করছে সম্মিলিতভাবে ধার, কর ও ঘাটতি অর্থনীতি প্রয়োগের কুশলতার উপর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লোক সম্মতি ছাড়া কোনো-কিছু সম্ভব নয়; বিনিয়োগের হারবৃদ্ধিও তাই শেষ পর্যন্ত সাধারণের ছাড়পত্রের উপব নির্ভর করছে।

অনেকেই অবশ্য অসহিষ্ণু হয়ে ঘাড় নাড়বেন, এমন উক্তিও করা হবে যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই পরিকল্পনাতেই ঝিমোনো-ঝিমোনো ভাব, জাতীয় আয় বাড়ার হার অপ্রতুল; উদাহরণ হয়তো দেওয়া হবে সোভিয়েট ইউনিয়ন কিংবা পূর্ব ইওরোপের পরিকল্পনাগুলো থেকে উদ্ধৃত ক'রে : আমাদের প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বছরে জাতীয় আয়ের যে-উন্নতি হয়েছে, এ-সমস্ত কোনো-কোনো দেশে সে-হারে উন্নতি মাত্র এক বছরে সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনা রচয়িতা যাঁরা, তারা অতএব ভীরু, ভুবনের ভার তাঁদের হাতে নেই।

এ-যুক্তির প্রসঙ্গে আপাতত শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, ধনবিজ্ঞানীদের কতকগুলো শর্তের সীমায় সম্পাদ্যের খসড়া তৈরি

করতে হয়, যাদের মধ্যে প্রধান রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামো। রাজনৈতিক সংস্কার বাইরে আর্থিক পরিকল্পনাকে দাঁড় করানো অসম্ভব। পূর্ব ইওরোপে যে-হারে জাতীয় আয়ের উন্নতি হয়েছে, তার জন্য প্রয়োজন শতকরা ২০ থেকে ৩০ পর্যন্ত বিনিয়োগ হার, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান হারের তিন চারগুণ বেশি। নিবৃত্তির পরিমাণের সঙ্গে তাই জাতীয় আয়ের অগ্রগতির হার অঙ্গাঙ্গি বাঁধা। উল্লিখিত দেশগুলিতে যে-যে প্রকরণের সাহায্যে এই উঁচু মানের নিবৃত্তি নির্ধারণ ও নিয়োগ করা হয়েছে, তা আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যবর্তিতায় সম্ভব নয়। রাজনৈতিক সংস্কার অতএব পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন কিনা সে-প্রশ্নের জবাব দেওয়া পরিকল্পনার যাঁরা খসড়া করেছেন, তাঁরা বলবেন, তাঁদের দায়িত্বের বাইরে।

১৯৫৭

একটি ভক্তিবাদী উক্তি দিয়ে আলোচনার অবতারণা করছি : গত দশ বছরে ধান্যে-শিল্পে-পুষ্পে আমরা যতটুকু এগিয়েছি, স্খলন-পতন না ঘটলে তার চেয়ে বহুগুণ দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধি হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, সেদিক দিয়ে বিচার করলে প্রথম দুই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হবার কিছু নেই। কিন্তু যা অবিশ্বাস্যরকম বৃদ্ধি পেয়েছে তা পরিকল্পনার তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান এবং জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা। আর্থিক বৃদ্ধির সংজ্ঞা, পরিমাপ ও বিন্যাস নিয়ে যে-ধরনের পরিশীলিত আলাপ ইদানীং আশে-পাশে হ'তে শুনি, দশ বছর আগে তা অভাবনীয় ছিল। আলোচনা চিন্তা-বিশ্লেষণের এই উন্নত মান থেকেই মাঝে-মাঝে আশা হয়, আপাতত আমবা তেমন দ্রুতসঞ্চারী যদিও নই, খুব ক্ষতি হয়নি তাতে; উন্নতির পিপাসা যেখানে এত তীব্র, ভুলভ্রান্তিব পাহাড় পেরিয়ে শিগ্‌গিবই সেখানে উচ্ছল প্রগতির প্রবাহমানতা দেখা দেবে।

ধনবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান সূত্রই হলো এবংবিধ আশাপোষণ; যা আশা করা যায়, স্রেফ আশা করার ফলেই অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর হয়। লোকে বলাবলি করতে থাকে এটা ঘটবে, আবহাওয়ার সুর অন্যরকম হয়ে যায় তাতে, উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয় চারদিকে, এবং এ-উৎসাহ থেকেই এমন কার্যপরম্পরা সৃষ্টি হয় যে, যা হ'লে ভালো হতো মনে হয় সেটাই ঘ'টে যায়। সুতরাং দেশের দ্রুততর আর্থিক প্রগতির জন্য আশাপোষণ আমাদের কর্তব্য। তবে 'আমরা চমৎকার উন্নতি করছি, খুবই ভালো করছি, যারা বলছে আমরা তেমন এগোচ্ছি না তারা বিশ্ববিন্দুক', এসব মন্ত্র না আউড়ে যদি আর্থিক বৃদ্ধির মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে সবাইকে সজাগ করার চেষ্টা চলে, তা হ'লেই মহত্তম মঙ্গল। বিশ্লেষণ থেকেই বিবেচনা আসে, এবং বিবেচনা

পরিপক্ক হ'লে কাজকর্মেও স্বতই দক্ষতা বাড়ে। সুতরাং আর্থিক প্রগতির প্রধান সূত্রগুলি নিয়ে সতর্ক বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। বর্তমান প্রবন্ধে কিছু-কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা উত্থাপন করা হচ্ছে।

সব কথার গোড়ার কথা বিনিয়োগ, এবং বিনিয়োগের হার। সঞ্চয়, এবং সেই সঞ্চয়ের বিনিয়োগ: উৎপাদনের সঙ্গে এদের কার্যকারণ সম্বন্ধ। জাতির যা সামগ্রিক উৎপাদন, বর্তমান মুহূর্তে তা পুরোপুরি উপভোগ না ক'রে কিছু-কিছু যদি সঞ্চয় করা যায়, সেই সঞ্চয়ের সাহায্যে যন্ত্রপাতি-কলকারখানার ব্যবস্থা একদিকে যেমন সম্ভব, অন্য দিকে তেমনি কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি, যানবাহনের বিস্তার, বিদ্যুৎ সরবরাহের পত্তন, ঘরবাড়ি-দালানকোঠার প্রসারও সম্ভব। ইত্যাকার নানা আয়োজনের ফলে জাতির উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে চলে। যত বেশি সঞ্চয়, তত বেশি বিনিয়োগ, অতএব তত বেশি উৎপাদন। সঞ্চয়-ও-বিনিয়োগের হারের সঙ্গে আর্থিক বৃদ্ধির নিবিড়তম যোগ।

অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন দেশের পক্ষে অবশ্য একটু ঢিলে দিলে ক্ষতি নেই: বিনিয়োগের হার ধীর হয়ে এলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার অবশ্যই ক'মে আসবে, কিন্তু সমুৎপন্ন সর্বনাশের সূচনা নেই তাতে, এক বছর-দু'বছর বৃদ্ধির হার সামান্য নেমে এলেও জীবনযাত্রার সমৃদ্ধ মানের খুব হানি হবে না তাতে। অন্য দিকে, গরিব দেশের পক্ষে উচ্চহারের বিনিয়োগ ছাড়া উন্নতির অন্য পন্থা নেই। বিনিয়োগ না বাড়ালে উৎপাদনশক্তি বাড়বে না, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার এগোবে না, যে-তিমিরে আছি সে-তিমিরেই থেকে যাবো। ঢিলে দেওয়া মানেই পিছিয়ে-প'ড়ে-থাকা। যদি তা না চাই, সঞ্চয় বাড়াতে হবে।

এখানে তাই একটা হেঁয়ালির মধ্যে পড়তে হয়: যে-দেশ যত গরিব, তার সঞ্চয়-ও-বিনিয়োগের হার তুলনায় তত বেশি হওয়া প্রয়োজন। অথচ, অন্য পক্ষে, দরিদ্র দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়ের সামর্থ্য কম, অধিকাংশ লোক কোনোক্রমে খেয়ে-প'রে আছে, তাদের সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়াতে বলা পরিহাসের মতো ঠেকতে পারে। এই

দ্বন্দ্বের দু'রকম মীমাংসা হতে পারে: এক, অনেক দরিদ্র দেশেই ধনবণ্টনের প্রচণ্ড অসাম্য ; অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী এক শ্রেণী, যাঁরা হয়তো দেশের পুরো জনসংখ্যার মাত্র শতকরা পাঁচ, জাতীয় আয়ের পুরো এক-তৃতীয়াংশ কিংবা তারও বেশি উপভোগ করছেন। জাতির সামগ্রিক সঞ্চয়ের হার বাড়াতে হ'লে অতএব এই ধনী শ্রেণীর উপর বেশি মাত্রায় কর বসাতে হবে। সামর্থ্যের মাত্রা-অনুযায়ী এমন-এক রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়তো সম্ভব যার ফলে দেখা যাবে দরিদ্রতর শ্রেণীদের উপর চাপ তুলনায় কম পড়েছে, বড়োলোকদের উপর বেশি পড়েছে, এবং সামগ্রিক চিত্র গড়ে এমন দাঁড়িয়েছে যে, জাতীয় সঞ্চয়ের হার আগের তুলনায় বেড়ে গিয়েছে। বিকল্প যে-মীমাংসা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে তা সঞ্চয়ের মাত্রা স্থির রেখে বিদেশ থেকে পুঁজি এনে বিনিয়োগ বাড়ানো, অর্থাৎ কিনা অপরের সাহায্যে নিজেদের উৎপাদনশক্তির প্রসার করা। এর ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে: সুবিধে এই যে, নিজেদেব অতিরিক্ত কষ্ট করতে হয় না, অন্যের উদ্‌বৃত্ত অর্থে চটপট জাতীয় উন্নতির ব্যবস্থা করা যায়। অসুবিধের দিক হলো—যেখানে সঞ্চয়ের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে না, হাত বাড়ালেই বিনিয়োগের সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে দ্রুত উন্নতির জন্য প্রয়োজনানুগ মানসিক প্রস্তুতি হয় না, কাজ চলে অনেক সময়েই ধীর গতিতে ; সস্তায়-পাওয়া টাকার অপচয়ের আশঙ্কা অনেকটাই বেশি। তা ছাড়া, বিদেশে হাত পেতে টাকা নিলে তার রাজনৈতিক কতগুলি কুফল তো আছেই।

আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের আর্থিক ব্যবস্থা: কোনো-কোনো দেশে খাঁটি সমাজতন্ত্র, অনেক দেশে পাঁচমিশেলি ধনতন্ত্র, এমনকি কয়েকটি দেশে সনাতন মালিকানা ব্যবস্থা। যেসব দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে, তাদের জাতীয় উন্নতির হার অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় অনেকগুণ বেশি। এটাও এক হিশেবে খুব ধাঁধা-লাগানো ব্যাপার। প্রথম বিচারে মনে হবে

যেখানে ধনতন্ত্র প্রবল, সেখানেই সঞ্চয়-ও-বিনিয়োগের মাত্রা বেশি হওয়া উচিত। ধনতন্ত্রবাদের গোড়ার কথাই হলো লাভ এবং লাভের হার, এবং লাভ বেশি হওয়া মানেই তো সঞ্চয় বেশি হওয়া। তা হ'লে এটা কী ক'বে সম্ভব যে বিনিয়োগের প্রতিযোগিতায় ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রের কাছে হেরে যাচ্ছে ?

কারণ সোজা। প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক সব-ক'টি দেশে রাষ্ট্র-ক্ষমতা ভীষণরকম কেন্দ্রীকৃত। বিশেষ ক'রে কেন্দ্রে যাঁরা দায়িত্ব নিয়ে আছেন, বিনিয়োগের হার বাড়ানো তাঁদের প্রায় প্রধানতম কর্তব্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কাজটা খুব এলোমেলোভাবে হয়ে থাকে, ব্যক্তির উৎসাহ ও উদ্যোগের উপর তার গতি-প্রকৃতি, স্নুতরাং মাঝে-মাঝে ক্লান্তির ঢল নামলে বিনিয়োগেও ভাঁটা আসে। এই অনিশ্চয়তা থেকে সমাজতন্ত্র মুক্তি লাভ করেছে। যাঁরা হাল ধ'রে আছেন, বিনিয়োগ ও সেই সঙ্গে জাতীয় আয়ের হার বাড়ানোর জন্য তাঁরা তদ্‌গতমন। এমনও হওয়া সম্ভব, বিনিয়োগের মাত্রা ক'মে এলে তাঁদের কাজই চ'লে যাবে, স্নুতরাং শ্লথগতি হবার উপায় নেই। তা ছাড়া, যেহেতু রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবার ফলেই এই সব-ক'টি দেশে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে, সম্পত্তিব্যবস্থার সম্পূর্ণ উৎখাতও সম্ভব হয়েছে সেই সঙ্গে, সম্পত্তি থেকে আয়ও তাই নিশ্চিহ্ন। শ্রমিকশ্রেণীর জীবিকার উদ্‌বৃত্ত যে-সম্পদ আগে ধনী-শ্রেণীর ব্যসনে ব্যাপৃত হতো, তার পুরোটাই এখন বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব।

অবশ্য এটা মানতেই হয়, শুরুতে এই উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ খুব বেশি নয়। জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট সঙ্কুচিত ক'রে এনে সম্পূর্ণ উদ্‌বৃত্ত বৃদ্ধির যজ্ঞে নিবেদন করলেও এমন হয়তো হবে যে, বিনি-য়োগের হার এরূপ যে, কিছু-কিছু শিল্পের সূচনা সম্ভব, কিন্তু খুব বেশি নয়। হয়তো শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেড়ে গিয়েও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ধরতে পারছে না, অতএব কৃষিকর্মে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ক্রমশ আরো-একটু বাড়ছে। যারা কলকারখানায় ঢুকতে

পারছে না তারাই গ্রামে প'ড়ে থাকছে, কিন্তু নামে-কৃষিরত লোকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও কাজে কৃষির উৎপাদন বাড়ছে না। যদি এমনও হয় যে, বিনিয়োগের ফলে শিল্পে-নতুন-নিয়োজিত লোকের সংখ্যা জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে, তা হ'লেও প্রধান সমস্যা থেকেই যাচ্ছে, কারণ কৃষি এবং কুটিরশিল্পে ভিড়-ক'রে-থাকা লোকদের উৎপাদন-ক্ষমতার দ্রুত উন্নতি না ঘটলে জাতীয় আয়ের হার তেমন বৃদ্ধি পাবার নয়।

দ্রুত আর্থিক উন্নতি চাইলে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে হবে, অর্থাৎ কিনা জাতীয় উদ্‌বৃত্ত বাড়াতে হবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্‌বৃত্তবৃদ্ধি অনেকগুণ সহজতর। আর্থিক প্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে গড়পড়তা উৎপাদনও বেড়ে চলে : বাড়তি উৎপাদনের সামান্য এক-অংশ বাড়তি উপভোগের জন্য বরাদ্দ ক'রে বাকিটা বিনিয়োগের হার বাড়ানোর কাজে লাগানো তাই সম্ভব। এভাবে বিনিয়োগের মাত্রা ক্রমশ বাড়িয়ে নিয়ে আর্থিক প্রগতির হার তীব্রতর ক'রে তোলা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হামেশাই হচ্ছে। অবশ্য মাঝে-মাঝে গোলমাল যে দেখা দেয় না তা নয় যদি উপভোগের মাত্রা আদৌ বাড়তে দেওয়া না হয়, জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে : পূর্ব ইওরোপের গেলো পনের বছরের ইতিহাসে এ-রকম অসন্তোষ বেশ কয়েকবারই মাথা তুলেছে। তবে একটু সাবধানে এবং বিবেচনার সঙ্গে এগোলে সম্ভোগ ও নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু একটা মীমাংসা করা কঠিন হওয়া উচিত নয়। বিনিয়োগ বাড়ার সঙ্গে লাভের মাত্রা বেড়ে যায়, এবং যেহেতু লাভের সম্পূর্ণটাই রাষ্ট্রব্যবস্থার হাতে, তার এদিক-ওদিক হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। লাভের কতটা পরিমাণ পুনরায় বিনিয়োগে খাটানো হবে কর্তৃপক্ষ স্বচ্ছন্দে তার স্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারেন, এবং সে-নির্দেশ কার্যকরী হ'তে অন্য কোনো বাধা অনুপস্থিত।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও অবশ্য উচ্চমানের বিনিয়োগের ফলে উচ্চ-মানের লাভ সম্ভব হয়ে থাকে, কিন্তু মুশকিল হলো, এই উঁচু লাভের

বেশ-একটা অংশ উপভোগে ব্যয় হয়ে যায়। লাভ বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ধনীশ্রেণীর ব্যসনের পরিমাণ ঈষৎ বাড়ে। শিল্পপতিদের উপভোগের মাত্রা বাড়লে সেই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর পারিশ্রমিকও বাড়িয়ে দিতে হয়। সব-মিলিয়ে এমন দাঁড়ায় যে লাভের পরিমাণ যে-হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার বড়ো জোর অর্ধেক কিংবা তারো কম বিনিয়োগে ব্যবহৃত হ'তে পারে। বিনিয়োগের মান পিছিয়ে থাকে, অতএব ধনতান্ত্রিক দেশগুলির প্রগতির হার কিছুতেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বৃদ্ধির হারকে ছুঁতে পারে না।

ইতিহাসের লীলাই এমন বিচিত্র। সনাতন মালিকানা ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে মানতেই হয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধে হাজার গুণ বেশি, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিনিয়োগের প্রণালী আরো অনেক সুষ্ঠু, অনেক দ্রুততর। প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয়তম ব্যাপার হলো বিনিয়োগ, সুতরাং অনুন্নত যে-সমস্ত দেশে সামাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে, তাদেরই সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। উদ্‌বৃত্তের বিশ্লেষণ থেকেই তত্ত্বটি ধরা পড়ে, খুব শাদামাটা হলেও খুব অর্থঘন এই তত্ত্ব।

অবশ্য আমাদের উপরের সিদ্ধান্ত অনেকগুলি নতুন প্রশ্ন এনে জড়ো করে। যদি দ্রুত প্রগতির জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উৎকর্ষ সর্বস্বীকৃত হয়ে পড়ে, তা হ'লে আগামী দু'-তিন দশকের মধ্যে এমনটা হয়তো হবে যে, অধিকাংশ দরিদ্র দেশেই কোনো-না-কোনো ধরনের সমাজতান্ত্রিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, ইওরোপ, সেই সঙ্গে যদি এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেকগুলি দেশেও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, পশ্চিমের অত্যুন্নত রাষ্ট্রগুলির কী হাল হবে তা হ'লে? এ-বিষয়ে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে

আর্থিক বৃদ্ধির হার খুবই আপেক্ষিক ব্যাপার। এক হিশেবে পৃথিবীর সব দেশকেই অনুন্নত বলা চলে, কারণ সর্বত্রই দ্রুততর আর্থিক বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত সমৃদ্ধির

হার দ্রুততর করা চলে ; জীবনযাত্রার মান মার্কিন দেশে বাড়ছে সেটা ঠিক, কিন্তু এই বৃদ্ধির পরিমাপ সম্ভাব্যতম হারের চেয়ে অনেকটাই কম।

উন্নত ও অনুন্নত রাষ্ট্রের মধ্যে এদিক থেকে যদি পার্থক্য টানতে হয়, তা হ'লে বলতে হয় প্রভেদটা ইচ্ছার, দৃষ্টিভঙ্গির : যে-সব দেশে প্রগতির হার বাড়ানোর প্রয়োজন আছে ব'লে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সে-সব দেশ অনুন্নত। যে-সব দেশে এ-রকম তাগিদ নেই, এবং বিনিয়োগের উপস্থিত হার পর্যাপ্ত ব'লে ধরা হয়ে থাকে, তারাই উন্নত। যে-সেমস্ত দেশকে বর্তমানে উন্নত বলা হয়, তাদেরও অবশ্য অতীতে কোনো-একটা-সময়ে পীড়নের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে, উপভোগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ক'রে বিনিয়োগের হার বাড়াতে হয়েছে, উন্নতি সম্ভব হয়েছে সেজন্যই। এখন যেহেতু তারা সচ্ছল, বিনিয়োগের হার আর বাড়ানোর প্রয়োজন নেই : জাতীয় আয়ের শতকরা বারো থেকে পনেরো পর্যন্ত বিনিয়োগে ব্যবহৃত হচ্ছে, এই হার অটুট রাখলেই যথেষ্ট। অন্যদিকে অনুন্নত দেশগুলিতে বিনিয়োগের হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের শতকরা পাঁচ থেকে দশের মধ্যে, সুতরাং তাদের আপাতত বেশ-কিছু কৃচ্ছ্রের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

উন্নত দেশগুলিতে যে-সংকট দেখা দিতে পারে তা কৃচ্ছ্রসাধনার সংকট নয়, পর্যাপ্তির সংকট। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে New Yorker পত্রিকায় একটি ব্যঙ্গচিত্র বেরিয়েছিল, তাতে দুই মার্কিন শিল্পপতির মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে : 'You don't like tailfins, I don't like tailfins, but what will happen to the American economy if nobody likes tailfins?' এই আর্তভাষণের মধ্য দিয়ে সংকটের স্বরূপ চমৎকার ফুটে বেরিয়েছে।

সমস্যা কোথায়? পশ্চিমের শিল্পায়িত দেশগুলিতে, বিশেষ ক'রে আমেরিকায়, জীবনযাত্রার মান বেড়ে-বেড়ে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, লোকের নতুন পণ্য কেনবার ইচ্ছায় অবসাদ নেমেছে। উৎপাদনক্ষমতা তুঙ্গ শীর্ষে উঠেছে, ফলে বছরে বিভিন্ন ধরনের যত

জিনিশপত্র উৎপন্ন হচ্ছে, আনুপাতিকভাবে লোকের কেনার উৎসাহ তত বাড়ছে না। একমাত্র খাদ্যদ্রব্যই প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণে নিশ্চিন্ত মনে উৎপন্ন করা চলে, কারণ ন্যূনতম পরিমাণ খাবার লোকেদের বাঁচতে হ'লে দরকার হবেই। কিন্তু খাদ্য গ্রহণেরও একটা উর্ধ্বতম সীমা আছে, লোকের আয় যতই বাড়ুক, আনুপাতিক হিশেবে খাদ্যের পরিমাণ বাড়ে না, এক-জায়গায় থামতে হবে। তাই জাতীয় আয় যতই বাড়ে, সামগ্রিক উৎপাদনে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের, এবং সামগ্রিক উপভোগে আহার্যের, অনুপাত ক্রমেই ক'মে আসে। অন্য পক্ষে উৎপাদনে খাদ্য-ব্যতিরেক অন্যান্য জিনিশের অনুপাত জাতির আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুশকিল হলো এ-সমস্ত জিনিশই খুব চট ক'রে ক্ষয়ে যাওয়ার মতো নয়, এমনকি জামাকাপড় পর্যন্ত প্রতি বছর সমস্ত-কিছু নতুন ক'রে তৈরি করতে হয় না। গাড়ি, বাড়ি, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, ঘরের টেবিল, আকাশের উড়োজাহাজ ইত্যাদির আয়ু তো আরো অনেক বেশি।

সংকট অতএব এখানে; মার্কিন দেশে যত পরিমাণ সুস্থ-সমর্থ লোক, তারা সপ্তাহে পাঁচ দিন ক'রে কাজ করলে বাৎসরিক উৎপাদন যতটা হয়, বৎসরের নতুন চাহিদার পরিমাণ তার থেকে কম হ'লেই মুশকিল। চাহিদা কম হ'লে নতুন তৈরি জিনিশ বিক্রি হবে না, দোকানে-গুদোমে বোঝাই হ'তে থাকবে, ফলে পরের বছর উৎপাদনের পরিমাণ আরো কমিয়ে আনতে হবে, সুতরাং কিছু লোককে ছাটাই করতে হবে, তাতে সামগ্রিক আয় সংকুচিত হবে, সুতরাং জিনিশ-পত্রের চাহিদা আরো একটু কমবে, আরো লোক ছাঁটাই হবে, উৎপাদন আরো নেমে যাবে, এমনভাবে চক্রবর্ত হারে জাতির আর্থিক অবনতি হ'তে-হ'তে একদিন পুরো ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বে।

খুব সংক্ষেপে সংকটের সম্ভাব্য রূপ বর্ণনা করা হলো। অবশ্য পশ্চিমের সব-ক'টি দেশেই এক সঙ্গে যে এ-ধরনের সংকট দেখা দিতে পারে তা আদৌ নয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির জীবনযাত্রার মান এখনো অনেক পিছিয়ে আছে, চাহিদায়

মন্দা আসতে তাই এখনো বহুদিন বাকি। মার্কিন দেশেও সমাজের সব শ্রেণীর সমপরিমাণ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নেই, তবে সংকটের লক্ষণগুলি কয়েক বছর ধ'রে প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। লোকের জিনিশ কেনবার ইচ্ছায় যাতে ভাঁটা না-আসে, সেজন্য প্রতি বছর পুরোনো জিনিশপত্রে একটু-আধটু অদল-বদল ক'রে নতুন-নতুন উৎপাদন বাজারে ছাড়া হচ্ছে। একটি পরিবারে দুটো-তিনটে ক'রে গাড়ি না-থাকলে গাড়ির ব্যবসায় সংকট দেখা দেবে, আবার প্রতি দু'তিন বছরে গাড়ি না-পাল্টালেও সংকটের আশঙ্কা। কিন্তু লোকাচরণ পরীক্ষা ক'রে মনে হয় জনসাধারণ ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, ঘন-ঘন গাড়ি বদলাতে তেমন-যেন আর রুচি নেই। এ-রকম রুচিবিকার খুব বেশি পরিমাণে, বহুবিধ শিল্পের ক্ষেত্রে হ'তে থাকলেই আর্থিক সর্বনাশ। বছর-বছর তাই গাড়ির চেহারা-আকার ইত্যাদি ঈষৎ ওলট-পালট করা হচ্ছে, রেডিওগ্রামের শব্দসম্ভার নিয়ে অহরহ নতুন নিরীক্ষা হচ্ছে, লোককে ইচ্ছা-বাসনা-কামনার নতুন-নতুন মহলে বন্দী করার ফাঁদ পাতা হচ্ছে। আরো যা আপ্রাণ চেষ্টা চলছে তা সর্বপ্রকার পণ্যের অবক্ষয়ের মাত্রা বাড়ানোর। মাত্র কয়েক বছরের পুরোনো ঝকঝকে নতুন রাস্তা বা সাঁকো ভেঙে ফেলে ফের নতুন উদ্যমে নির্মাণের কাজ চলছে, দশ-বছর আগে তৈরি বাড়ি আগাগোড়া সংস্কার করা হচ্ছে। যে-জিনিশ—হোক তা রান্নার বাসন, হোক তা মেঝের গালিচা—আরো বেশ-কয়েক বছর চমৎকার ব্যববার করা চলতো, তা বাতিল ক'রে দিয়ে নতুন-একপ্রস্থ জিনিশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এত ভাবে জিনিশপত্র পাল্টানোর কোনো ব্যবহারিক কারণ নেই, একমাত্র সামাজিক অনুশাসনেই এই আপাতঅপচয় সম্ভব হচ্ছে। অবক্ষয়ের পরিমাপ না-বাড়ালে আর্থিক সংকট রোধ করা হয়তো সম্ভব হবে না, অতএব অপচয়েরই আশ্রয় নিতে হবে, অন্যথা মার্কিন সমাজের উপায় কী ?

শিল্পোন্নত দেশের প্রধান মাথাব্যথা, তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, বিনিয়োগের হার বাড়ানো নিয়ে নয়, হার যাতে না কমে তা-ই হচ্ছে

মূল্য সম্পাদ্য। মার্কস থেকে শুরু ক'রে রোজা লুক্সেমবার্গ, লেনিন প্রভৃতি অনেকেই অবশ্য ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশ নিয়ে তত্ত্ব বিস্তার ক'রে গেছেন। হালে যা ঘটছে অনেক ক্ষেত্রে তা মনীষীদের প্রাগুক্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, যদিও সর্বক্ষেত্রে নয়। মার্কসবাদীদের বক্তব্যের প্রধান সূত্র—ধনতন্ত্রে সংকট অপ্রতিরোধ্য, কারণ এই সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনক্ষমতার প্রসারের সঙ্গে শ্রমিক উপার্জনের হারবৃদ্ধির কোনো অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ নেই। যদি দুটো হার সমান্তরাল গতিতে বাড়তে পেতো মুশকিল আসান হতো; কিন্তু মার্কসীয় মনীষীদের বিচার এ-ধরনের সমান্তরালতা ধনতন্ত্রের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

উপরোক্ত দুটো হারের মধ্যে পরম্পরা না-থাকলে কী ঘটবে তার তিনটি ব্যাখ্যা তত্ত্বে পাওয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে হ্রস্ব-উপভোগ তত্ত্ব। ধনতন্ত্রে উৎপাদনশক্তি ক্রমাগত বাড়ছে, সুতরাং পণ্যের চাহিদা না বাড়লে সংকট কিন্তু শিল্পপতিরা এতই অবোধ যে, শ্রমিকশ্রেণীর পারিশ্রমিকের হার সামান্য পরিমাণও বাড়াতে তাঁরা অনিচ্ছুক। যেহেতু দেশের অধিকাংশ লোকই শ্রমজীবী, তাদের উপার্জন না বাড়লে জিনিশ কেনবার চাহিদাও বাড়ে না। সুতরাং অতিরিক্ত উৎপাদনের সংকটে ধনতন্ত্র দ্বন্দ্বিত হতে বাধ্য।

অন্য এক ব্যাখ্যায় উৎপাদনাধিক্যের প্রসঙ্গে না-গিয়ে লাভের হারের উপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে। শিল্পপতিদের প্রধান লক্ষ্য হলো লাভের হার, তাঁদের মতে যেখানে লাভ নেই, সেখানে বিনিয়োগও অর্থহীন। কিন্তু মার্কসবাদীরা হিশেব করে দেখিয়েছেন ক্রমাগত বিনিয়োগের ফলে পুঁজি যে-পরিমাণ বাড়ে জাতীয় আয় সেই হারে বাড়ে না, অতএব লাভের হার কমতে থাকে। এই হার যেদিন শূন্যের অঙ্কে গিয়ে দাঁড়াবে, সেদিনই ধনতন্ত্রের কথাটি ফুরোবে।

সর্বশেষ ব্যাখ্যায় ধনতন্ত্রের সমাপ্তি বক্তাক্ত বিপ্লবে। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগ বাড়ে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর পারিশ্রমিকের হার এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। লোকনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, ক্রমে বেকার সমস্যার নিরসন হয়। এমন অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হয়ে

পারিশ্রমিক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করে। পারিশ্রমিকের হার খানিকটা অবশ্য বাড়ে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ধনপতিরা শিল্প-কৌশলের উন্নতি সাধন ক'রে লোকনিয়োগ সংকুচিত ক'রে আনেন, ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক অবস্থা একই রকম থেকে যায়। এভাবে কিছুদিন চললে পরে অহিংস আন্দোলনে অশ্রদ্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণী বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, ধনতন্ত্রের কাঠামো ভেঙে চুরমার ক'রে দেবে, এ-রকম আভাস মার্কসীয় বিচারে সোচ্চারিত।

এই তিন ব্যাখ্যাতেই উজ্জ্বল আলোকপাত আছে, তবে পশ্চিমের দেশগুলিতে ধনতন্ত্রের বিবর্তন একটু অন্যরকম হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর পারিশ্রমিকের হার ঠিক এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি, যে-গতিতে উৎপাদনক্ষমতা বেড়েছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে অবশ্য শ্রমিক-আন্দোলনের জন্যই কিছুটা চতুরালির সঙ্গে এমনও আজকাল বলা হয়ে থাকে: পশ্চিম ইওরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্কসের ভবিষ্যদ্‌বাণী বিফল হবার জন্য মার্কস নিজেই দায়ী। মার্কসপন্থী রচনা ও ভাবধারা থেকে প্রেরণা সঞ্চয় ক'রে উনবিংশ শতকে শ্রমিক-আন্দোলন দানা বাঁধে, ক্রমশ তা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে শ্রমিকদের আপেক্ষিক অবস্থার অবনতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও আপাতত অসম্ভব।

অর্থনৈতিক কাঠামো এসব দেশে এখন যা রূপ নিয়েছে, শ্রীমতী জোন রবিনসনের ভাষায় তা a world of monopolies, সম্প্রতি অধ্যাপক গলব্রেথ এই ব্যাপারটাকেই countervailing power হিশেবে দেখেছেন: একদিকে শিল্পপতিদের জোট, অন্যদিকে শ্রমিকদের সংস্থা, মাঝখানে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, দেশের উৎপাদন কীভাবে কোন্ অনুপাতে বিতরিত হবে তা এই তিন দানবের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় স্থির হচ্ছে; শ্রমিকরা আজকাল তাই ধনতান্ত্রিক সমাজেও সুপ্রতিষ্ঠিত।

মার্কসীয় তত্ত্বে ধনতন্ত্রের যে-ক্রমবিলোপ কল্পনা করা হয়েছে, পশ্চিমের দেশগুলিতে সে-রকম হয়তো হবে না। তবে সংকটের

সম্ভাবনা এখনো যথেষ্ট, এবং উৎপাদনাধিক্য থেকেই ভয়। মার্কিন দেশে যা হচ্ছে, লোকের নতুন পণ্য আহরণে অবসাদ, তা অন্যান্য ধনতান্ত্রিক সমাজেও সংক্রামিত হ'তে বাধ্য। এই সর্বনাশ ঠিক এক-বছর-দু'বছরে হবে না, আস্তে-আস্তে নিস্পৃহতার আপাতবিষ ধনতন্ত্রের স্নায়ুকে নির্জীব ক'রে আনবে। তাই মার্কস যা বলেছিলেন তা-ই হয়তো ঘটবে, যদিও ঠিক যেভাবে ঘটবে ব'লে উনি ভেবেছিলেন প্রকৃত প্রণালী তার থেকে সামান্য স্বতন্ত্র হবে।

অবশ্য যে-সংক্রান্তি আজ অবশ্যম্ভাবী ব'লে মনে হয়, অনেক সময় কর্মচক্রে তার গতি অন্যরকম হয়ে যায়। সুতরাং আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ উচ্ছেদ পাবে এ-রকম প্রকট উক্তিতে পরিপূর্ণ আস্থা না-রাখাই ভালো। কারণ, ধনতন্ত্রের পক্ষেও, হয়তো এখনো সময় আছে, এখনো উপায় আছে। এমনকি, মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রেও সমাজসংস্কারের সাহায্যে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করা সম্ভব, তা হ'লেই ক্লান্তিকাল আরো কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকতে পারে। মার্কিন জনসংখ্যার এক দশমাংশের উপর নিগ্রো, এবং অধিকাংশেরই হতদীর্ণ অবস্থা। নিগ্রো সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতির জন্য একনিষ্ঠ আয়োজন করলে পরিণামে সমগ্র মার্কিন জাতিরই ভবিষ্যতে শুভ: সমাজের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র স্তরের উপার্জন বেড়ে গেলে জিনিশপত্রের চাহিদা বাড়বে। চাহিদা যত বাড়বে, সংকট থেকে মুক্তির সম্ভাবনা তত বেশি।

আর যা উপায় আছে তা বিলিয়ে দেওয়া আর্থিক কাঠামো অটুট রাখতে হ'লে উৎপাদনের পরিমাণ অব্যাহত হওয়া চাই। যে-পরিমাণ সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে, নিজেরা তা যদি পুরোপুরি ব্যবহার করতে না চাই বা না পারি, তা হ'লে সর্বনাশ এড়াবার চমৎকার পন্থা প্রতিবেশীকে ডেকে হাতে ধ'রে দিয়ে দেওয়া। একটু আগে এমন মন্তব্য করা হয়েছে যে, যেহেতু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগের হার ক্ষিপ্রতর অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক প্রগতির সম্ভাবনা সমাজ-তন্ত্রেই তাই সবচেয়ে বেশি। এ-রকম প্রলোভনে পড়লে অনেক

দেশই হয়তো আগে পরে সমাজতান্ত্রিক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখানেও কোনো অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়ম নেই। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যেই, যদি যন্ত্রপাতি এবং উন্নতি-সহায়ক অন্যান্য জিনিশপত্র নিয়মিত গরিব দেশগুলিকে পাঠাতে শুরু করে, তা হ'লে আমাদের স্বকীয় সঞ্চয়ের হার কম রাখলেও চলবে। যদি দ্রুত উন্নতির জন্য জাতীয় উপার্জনের শতকরা পনেরো ভাগ বিনিয়োগ লাগাবার দরকার মনে হয়, তা হ'লে আমরা নিজেরা শতকরা দশ-ভাগের মতো সঞ্চয় করতে পারি, শতকরা বাকি পাঁচ ভাগ বাইরে থেকে আসতে পারে। তাতে আমাদের যেমন সুবিধে, পশ্চিমের দেশগুলিরও তার চেয়ে কিছু অংশ কম নয়, কারণ তাদের মরণবাঁচনও উৎপন্ন সামগ্রীর সুষ্ঠু বিতরণের উপর নির্ভর করছে।

অতএব ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস এখনো হয়তো ঠেকানো যায়, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন বিবেচনা, ঔদার্য, ভবিষ্যৎদৃষ্টি। এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাচ্ছে, আত্মবিলোপের আশঙ্কা রোধ করা হচ্ছে, অন্য দিকে দরিদ্র দেশগুলিকে বিনিয়োগে সহায়তা ক'রে সমাজতন্ত্রের প্রলোভন থেকে সরিয়ে নেওয়া যাচ্ছে: পাশ্চাত্য জাতিসমূহে এই প্রতীতি ছড়াতে আরো অনেক সময় নেবে। তা ছাড়া, সব গরিব দেশই যে পশ্চিম থেকে বিনিয়োগপণ্য হাত পেতে নিতে সম্মত হবে তা নয়: আত্মসম্মানের ব্যাপার আছে, বিদেশী মূলধন থেকে অনেক সময় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে চায়, সেদিকটাও ভেবে দেখবার।

বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রক্রিয়া এবং গতি-প্রকৃতির উপর তাই পৃথিবীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে। এমন না-হ'লেই আশ্চর্য হ'তে হতো: কারণ কে কেমনভাবে খেয়ে-প'রে আছে বা থাকতে পারে তা-ই পৃথিবীর প্রধান সমস্যা। আদিম মানুষের সময়ে যা ছিল, এখনো তাই; সমস্যাটি ইতিমধ্যে জটিলতর হয়েছে, এইটুকু যা তফাত।

১৯৬১

বিনিয়োগ, ভূমিরাজস্ব, ভূমিসংস্কার

ধনবিজ্ঞানের পরিভাষায় যে-সব দেশকে বলা চলে অনগ্রসর তাদের ঔৎপাদিক কাঠামোর চরিত্র নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, জাতীয় উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি কৃষিকর্ম থেকে সঞ্জাত হচ্ছে, এবং সেজন্যই দেশগুলি এতটা গরিব। কৃষিকলার মান স্তিমিত: এমন হয়তো যে, দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোকই চাষবাস থেকে জীবিকা উপায় ক'রে থাকেন, ফলত ভীষণ ঠাসাঠাসি। এই পরম্পরার ফলে গড়পড়তা আয়ের মাত্রা নিচু থেকেই যায়। আরো দেখা যায়, কৃষিকর্মের বাইরে যা গড়পড়তা উপার্জন, কৃষিকর্মে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র, কখনো-কখনো অনুপাত কষলে অঙ্ক দাঁড়ায় গিয়ে ৫ : ১।

সুতরাং বলতেই হয় আর্থিক প্রগতি এসব দেশের পক্ষে তিনটি জিনিশের উপর নির্ভরশীল: (ক) কৃষিকর্ম থেকে জীবিকান্বেষীদের আনুপাতিক সংখ্যা হ্রাস, (খ) কৃষিকলার প্রাকরণিক প্রসার, এবং, সব শেষে, (গ) শিল্প বাণিজ্য-বিনিময় প্রভৃতির দ্রুততর ব্যাপ্তি। এ-রকম ব্যাপ্তি না-ঘটলে যে-সব লোক কৃষিকর্ম পরিত্যাগ ক'রে শহরে-গঞ্জে চ'লে আসছে, তাদের কাজ-জোগানো অসম্ভব।

এ-সমস্তের জন্যই প্রয়োজন মূলধনের। বিনিয়োগের সারাৎ-সারের অভাব হ'লে কোনো-কিছুই সম্ভব হবে না: কৃষিকলার মানও বাড়ানো যাবে না, অন্যদিকে কলকারখানায় কিংবা বন্দরে-ঘাটে লোক নিয়োগের পরিমাপ সীমিত থেকে যাবে। এটা প্রায় সর্বস্বীকৃত যে, জাতীয় আয়ের অন্তত শতকরা দশ থেকে পনেরো অংশের সমপরিমাণ বিনিয়োগে ব্যাপৃত না করতে পারলে প্রগতি ব্যাহত হবে। কখনো-কখনো অবশ্য বিনিয়োগের খানিকটা বৈদেশিক মূলধন দিয়ে পূরণ করা যেতে পারে; কিন্তু জাতির স্বকীয় সঞ্চয়

থেকেই তার প্রধান দায়িত্ব মেটাতে হবে। বিদেশী সাহায্য বড়ো জোর পরিপূরক হ'তে পারে, কিন্তু জাতীয় প্রগতি প্রধানতই নির্ভর করে দেশের লোকদের সঞ্চয়-প্রবৃত্তির উপর, ত্যাগস্বীকারের ইচ্ছার উপর। এই ত্যাগের বেশি বহর কারা বহন কববেন? বিনিয়োগের প্রয়োজন কৃষিতেও যেমন, শিল্প-বাণিজ্যেও তেমনি। কিন্তু সঞ্চয়ের জন্যও কি আমরা দেশের সর্ব শ্রেণীর, সব জীবিকার লোকদের দিকে তাকাবো, না কি বলবো এঁরা এঁরা শুধু সঞ্চয় করবেন, ওঁরা-ওঁরা অসমর্থ, ওঁদের উপর দায়িত্ব চাপানো ঠিক হবে না?

চারপাশে তাকালেই হালের একটা লক্ষণ প্রতীয়মান হয়, প্রায়-সব গরিব দেশেই জাতীয় সরকার বিনিয়োগের মুখ্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, আর্থিক প্রগতির পরিপোষক যে-ধরনের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন আবশ্যিক, নানা কারণে সবকাব সে-সবকিছুর জন্য মাথাবাথা মাথা পেতে নিয়েছেন। সুতরাং কি কৃষিতে, কি শিল্পে, কি বাণিজ্যে, সঞ্চয় যেখানেই হোক না, তার এক মস্ত অংশ কর প্রয়োগ ক'রে কিংবা সবকারি লগ্নির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সরকারের হাতে পৌঁছুতেই হবে। যেহেতু লগ্নির কারুকলা এসব দেশে এখনো খুব-একটা সুগঠিত নয়, এখানে-ওখানে গ'ড়ে-ওঠা জাতীয় সঞ্চয়কে সরকারের হাতে অর্পণের জন্য কবপ্রথাই আপাতত মহত্তম পন্থা। করের সাহায্যে প্রথম দফায় সঞ্চয় সরকারের খাতে জমা হয়, তারপরে অবশ্য সরকারের নানা ব্যয়ব্যবস্থাব মধ্য দিয়ে এই সঞ্চয়ই দেশের লোকের হাতে ফিরে আসতে থাকে।

একটু আগে বলা হয়েছে যে, কৃষি থেকে গড়পড়তা আয় তুলনায় অত্যন্ত কম, জাতির সামগ্রিক যা গড়পড়তা উপার্জন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেকটাই কম। এই তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে মাঝে মাঝে যুক্তি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, কৃষিক্ষেত্রে যে-বিনিয়োগের প্রয়োজন, তার জন্য যাবতীয় মূলধন অন্যত্র থেকে সংগ্রহ করতে হবে। অধিকাংশ কৃষিজীবীই কোনোক্রমে ধুঁকে-পুকে বেঁচে আছে, জাতীয় প্রগতির জন্য করনির্ধারণ অবশ্যই দরকার, কিন্তু এদের বাদ দেওয়া

হোক, দেওয়ার ক্ষমতাই যে নেই এদের ; শিল্প-বাণিজ্যে যাঁরা আছেন, তাঁরা তুলনায় সমৃদ্ধ, তাঁদেরই তো কর্তব্য কৃষিতে বিনিয়োগের প্রয়োজনানুগ মূলধন জোগানো।

ইতিহাসের নজির টানলে অবশ্য বিপদ. কারণ দেখা যায় ঘটনাক্রম উল্টোরকম। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের দ্রুত আর্থিক প্রগতি দেড়শো বছর আগেকার শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত, এবং শিল্পবিপ্লব সাফল্যের জন্য দায়ী সম্ভ্রান্ত-সম্পন্ন কৃষিপতিদের উদ্‌বৃত্ত সঞ্চয়। নতুন যন্ত্রপাতির পেটেণ্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কারখানা বসানো, তৈজস কেনা বেচা : কৃষিজাত সঞ্চয় ছাড়া এর কিছুই সম্ভব হতো না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তেমনি : কার্পাস উৎপাদন থেকে জর্জিয়া, আলাবামা প্রভৃতি দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলিতে যে-সঞ্চয়ের সঞ্চার, গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে তার ভিত্তিতেই নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে শিল্পব্যবস্থার গোড়াপত্তন। সাম্প্রতিক কালে চ'লে এলে, সোভিয়েট রাশিয়া ও জাপানের ক্ষিপ্র প্রগতির মূলেও আসলে সেই পুরোনো ব্যাপার : কৃষিজাত সঞ্চয়।

অবশ্য তর্ক উত্থাপন করা যেতে পারে, অতীতে হয়েছে ব'লেই বর্তমানেও যে ঠিক তেমনটি হ'তে হবে এমন-কোনো কথা নেই। হাজার হ'লেও প্রায় প্রত্যেকটি অনুন্নত দেশেই অপেক্ষাকৃত-সমৃদ্ধ এক শিল্পব্যবস্থার বনিয়াদ গাঁথা হয়ে গিয়েছে, এবং এই শিল্পের ক্ষেত্রে গড়পড়তা আয় ইতিমধ্যেই কৃষিকর্মে-নিরতদের গড়পড়তা উপার্জনের চেয়ে যথেষ্ট বেশি। তা ই যদি হয়. যেমন ধনী দেশ থেকে হালে গরিব দেশগুলিতে অর্থসাহায্য যাচ্ছে, শিল্প-বাণিজ্যের তরফ থেকেই বা কেন কৃষির উন্নতির জন্য বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে না ?

একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে যুক্তিটি আরো-একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে। ধরা যাক, এক অনুন্নত দেশের জাতীয় আয়ের তিন-চতুর্থাংশ কৃষিকর্ম থেকে সঞ্জাত হচ্ছে ; জাতীয় আয় যদি ধরা হয় এক হাজার কোটি টাকা, কৃষি থেকে তা হ'লে পাওয়া

যাচ্ছে সাড়ে সাতশো কোটি টাকা। দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যা পাঁচ কোটি তেত্রিশ লক্ষ তিন হাজার তিনশো তেত্রিশ। যেহেতু শিল্পের পরিমাণ সীমিত, পুরো পাঁচ কোটি লোক কৃষিকর্মের উপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল। অতএব, সামান্য ভাগ করলেই দেখা যাবে, কৃষিক্ষেত্রে গড়পড়তা উপার্জন মাত্র দেড়শো টাকা; অন্য পক্ষে কৃষিকর্মের বাইরে শিল্পে-বাণিজ্যে আয়ের পরিমাণ গড়পড়তা সাড়ে সাতশো টাকা। আরো ধরা যাক, উপস্থিত করের পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা ছয়, অর্থাৎ সব-মিলিয়ে ষাট কোটি টাকা। কিন্তু এরই মধ্যে তফাত আছে, কৃষিক্ষেত্রে করের পরিমাণ আয়ের মাত্র শতকরা তিন, একুনে সাড়ে বাইশ কোটি টাকা; সুতরাং কৃষিকর্মের বাইরে যে যে উৎপাদন ক্ষেত্র. তাদের উপর করের পরিমাণ সাড়ে সাঁইত্রিশ কোটি টাকা। যেহেতু শিল্পে-বাণিজ্যে পুরো আয় আড়াইশো কোটি টাকা, এই কর তা হ'লে অনুপাতে দাঁড়ায় গিয়ে শতকরা পনেরোতে। অতএব দেখা গেল সামগ্রিক জাতীয় আয়ের উপব শতকরা ছয় কর, দুটো ভগ্নাংশের সমষ্টি: কৃষিক্ষেত্রে শতকরা তিন, এবং কৃষিক্ষেত্রের বাইরে শতকরা পনেরো। একদিকে যেমন শিল্পবাণিজ্যে গড়পড়তা আয় কৃষিকর্মজাত আয়ের পাঁচগুণ, আনুপাতিক করের ভারও পাঁচগুণ। জাতীয় প্রগতির জন্য যে-বাড়তি করের প্রয়োজন, শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকেই তা শুধু আসবে, কৃষি থেকে আদৌ নয়, এই যুক্তির প্রতি এ-অবস্থায় ঠিক ততটা মন আঁকড়ায় না।

তবে এখনো বিতর্ক প্রলম্বিত ক'রে বলা চলে, উপার্জনের ক্রমক্ষয়িষ্ণু-উপযোগিতার প্রসঙ্গ ভুললে চলবে কেন? এটা তো ধনবিজ্ঞানের অন্যতম প্রথম সূত্র, যদি শ্রীযুক্ত 'ক' শ্রীযুক্ত 'খ'-এর তুলনায় পাঁচগুণ উপার্জন করেন, তাহলে 'খ'-এর কাছে উপার্জিত শেষতম মুদ্রার যে-উপযোগিতা, 'ক'র সব শেষের উপার্জিত মুদ্রার উপযোগিতা তার তুলনায় আত্যন্তিক কম। সুতরাং 'খ' যা কর দিয়ে থাকেন, 'ক' তার পাঁচগুণেরও বেশি দিলেই ন্যায়নিষ্ঠ হয়।

আমাদের উদাহরণে কৃষিজীবীরা যদি আয়ের শতকরা তিন সরকারকে কর দিয়ে থাকেন, শিল্পে-বাণিজ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা তা হ'লে কর দেবেন শতকরা পনেরো নয়, তারো কিছু বেশি।

তর্কের খাতিরে যুক্তিটি যদি মানাও যায়, কতগুলি ব্যবহারিক সমস্যার হাত এড়ানো সম্ভব নয়। ধরা যাক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে করভার জাতীয় আয়ের শতকরা ছয় থেকে শতকরা বারোতে উত্তীর্ণ করতে হবে, এবং এই বৃদ্ধির পুরোটাই অ-কৃষিজীবীদের উপর চাপাতে হবে। পুরো করের পরিমাণ তা হ'লে ষাট কোটি থেকে বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে একশো কুড়ি কোটি টাকা। যেহেতু কৃষিক্ষেত্রে করবৃদ্ধি অমঞ্জুর, সেখানে করের পরিমাণ সাড়ে বাইশ কোটিই থেকে যাবে, অন্য পক্ষে শিল্পে বাণিজ্যে বেড়ে গিয়ে হবে সাড়ে সাতানব্বই কোটি, অর্থাৎ শিল্পে বাণিজ্যে সঞ্জাত আয়ের প্রায় শতকরা চল্লিশ। শিবঠাকুরের আজব দেশ ছাড়া অন্য-কোথাও এত গুরু করভার চাপানো সম্ভব নয়, দেশে বিদ্রোহ দেখা দেবে।

অবশ্য উপরের উদাহরণটি কাল্পনিক, এবং অঙ্কের হিশেব-নিকেশ-গুলি তেমন সাংঘাতিক সূক্ষ্ম নয়। কিন্তু আমার মূল বক্তব্য, আশা করা যায়, এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয়েছে: পৃথিবীর অন্য-সব ক্ষেত্রে যেমন, সম্ভাব্যতার একটা গণ্ডি প্রাকৃতিক-স্বাভাবিক-ব্যবহারিক নিয়মে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, সে-গণ্ডির বাইরে পা বাড়ালেই বিপদ। শুধু শিল্প-বাণিজ্য-বিনিময়ে নিযুক্ত লোকদের উপরই কর বসিয়ে, যাবো, কৃষিজীবীদের কৃষ্ণের জীব বিবেচনা ক'রে কেবলই সম্মান ক'রে যাবো এ-উক্তি সর্বনেশে। শিল্প-বাণিজ্যের উপর চড়া হারে কর বসিয়ে যেতে থাকলে হঠাৎ একদিন দেখা যাবে যে, উদ্যমে নিরাশ্বাস এসে গেছে, কর ফাঁকি দেওয়ার পালা শুরু হয়েছে, শিল্পব্যবস্থায় এলোমেলো বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এ-রকম হ'তে থাকলে বাড়তি বিনিয়োগ তো সুদূর পরাহত, অন্য পক্ষে হয়তো দেখবো উৎপাদন কমেছে, সঞ্চয় কমেছে, এবং সব-কিছুই আগের তুলনায় ম্রিয়মাণ।

আরেকটি ব্যাপারের উল্লেখ করা যাক। ব্যবহারিক জীবনে মানুষের একটি আশ্চর্য আচরণ, যাকে এক তরুণ ভারতীয় ধনবিজ্ঞানী আখ্যা দিয়েছেন 'একাকিত্ব হেঁয়ালি', লক্ষ্য করা যায়। একা-একা যে-ত্যাগস্বীকার বা দুঃখবহনে মানুষ গররাজি, দলে প'ড়ে তা করতে তার সামান্যতম আপত্তি নেই। একা ডুবতে রাজি নই, কিন্তু পড়শীরা যদি রাজি থাকে, তা হ'লে আমিও সম্মত। শিল্পে বা বাণিজ্যে যাঁরা নিয়োজিত, তাঁরা এমনিতে হয়তো অতিরিক্ত কর দিতে আদৌ উৎসাহিত হবেন না; কিন্তু যদি তাঁদের বলা যায় যে, করভার কৃষিজীবীদের উপরও বৃদ্ধি পাবে, তা হ'লে তাঁরাও সঙ্গে-সঙ্গে বোধহয় সম্মতি জ্ঞাপন করবেন। যদি প্রমাণ কিংবা প্রমাণের ভাণ ক'রে দেখানো যায় যে, অতিরিক্ত ত্যাগের বহর সর্বক্ষেত্রেই সমান, কারো পক্ষেই বেশি-কম নয়, তা হ'লে শিল্প-বাণিজ্যে যাঁরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কর দিচ্ছেন, তাঁদের কাছ থেকেও আরো-কিছু টাকা বের ক'রে আনা সম্ভব। অতএব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কৃষিক্ষেত্রে করের মাত্রা কিছু বাড়ানো গেলে সামগ্রিক করের পরিমাণ চক্রাবর্ত হারে বৃদ্ধি পাবে।

উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু এর পরেই প্রশ্ন আসবে, কৃষির উপর কর কতটা বাড়ানো সমীচীন? এটা প্রায় ধ'রেই নেওয়া চলে যে, সমস্ত অনুন্নত দেশেই বর্তমানে কৃষিকর্ম অন্যমুখাপেক্ষী; কৃষি থেকে যে-পরিমাণ ধন-অর্থ অন্যান্য অঞ্চলের খাতে প্রবাহিত হচ্ছে, অন্যত্র থেকে কৃষিকর্মের প্রসারে প্রবাহিত ধন-অর্থ তার তুলনায় অনেক-গুণ বেশি। এ অবস্থার পরিবর্তন সাধনই কৃষিক্ষেত্রে কর-ব্যবস্থা পাল্‌টানোর প্রধান উদ্দেশ্য হিশেবে ধ'রে নেওয়া উচিত। অন্তত এটুকু নির্দিষ্ট লক্ষ্যরূপে মেনে নিতে পারি যে, কৃষিকর্মে উন্নতির জন্য যত মূলধন প্রয়োজন, তার পুরোপুরি আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বিদেশ থেকে অবশ্য ঈষৎ সাহায্য হয়তো সর্ব সময়েই আসবে, কিন্তু স্বদেশী মূলধনের প্রয়োজনের কিছুটাও যেন অন্য ক্ষেত্র থেকে না-আসে, সম্পূর্ণ ই যেন কৃষিজীবীদের সঞ্চয়-সঞ্জাত হয়

এটা অসম্ভব কোনো প্রস্তাব নয়; সামান্য গবেষণার সাহায্যে এমন পরিকল্পনার খসড়া সম্ভব যাতে মাত্র চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই কৃষিগত করের পরিমাণ দ্বিগুণ করা চলে, এবং সেটা করতে পারলেই কৃষির উন্নতির জন্য আর অন্যত্র মূলধনের খোঁজে যেতে হয় না।

কেউ-কেউ মন্তব্য করবেন, বলা সোজা করা কঠিন; ধনবিজ্ঞান-গত যুক্তি যা-ই হোক্ না-কেন, অধিকাংশ কৃষিজীবীদের আয়ের পরিমাপ এমন যে, করবৃদ্ধির প্রসঙ্গ বাতুলের প্রস্তাব। কৃষিতে উদ্‌বৃত্ত থাকলে তবে কর বাড়ানো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু সে উদ্‌বৃত্ত আদৌ নেই, সুতরাং অতিরিক্ত কর দেবে কারা? যারা কোনোক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছে, তাদের উপর চাপ দিতে গেলে তারা না-খেয়ে মারা যাবে। উদ্‌বৃত্ত যেখানে অনুপস্থিত, বিনিয়োগের মূলধন সেখানে আর কী ক'রে সংগ্রহ করা সম্ভব?

কৃষিতে উদ্‌বৃত্ত আছে কি নেই সেটাই তা হ'লে উপস্থিত সমস্যা। এ নিয়েও আলোচনা প্রয়োজন। গড়পড়তা হিশেব বড়ো লোক-ঠকানো জিনিশ। আমরা যখন কোনো দেশের বা অঞ্চলের লোক-সংখ্যার গড় আয়ের কথা বলি, এক দিকে সম্ভ্রান্ত-সম্পন্ন, অন্য দিকে দরিদ্র ক্লিষ্ট সবশ্রেণীর লোকের আয়ের যোগফলের-ভাগফলের কথাই বলি। কৃষিক্ষেত্রে গড় আয় সুতরাং জমিদার, রায়তদার, ভাগচাষী, দিনমজুর সকলের আয়ের সমষ্টির গড় ছাড়া অন্য কিছু নয়। গড় হিশেব তাই যতটা ব্যক্ত করে গুপ্ত করে প্রায় ততটাই। কৃষিকর্মে গড় আয় যত কমই হোক না কেন অন্তত কতিপয় কৃষিজীবীর আয় এই গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। অধিকাংশ অনুন্নত দেশে কৃষকশ্রেণীর গড় উপার্জন অতি নিম্ন কিন্তু এটাও ঠিক যে ভূমিব্যবস্থায় প্রবল অসাম্যহেতু বিত্তবান সম্পন্ন কৃষিজীবীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয় এবং এদের কারো-কারো উপার্জন অনেক শিল্পপতিদের উপার্জনের তুলনায় কম তো নয়ই, অনেক ক্ষেত্রে বহুগুণ বেশি।

এমন-অনেক গরিব দেশ আছে, সমাজবিপ্লব যেখানে এখনো অনারব্ধ, ধনবণ্টনে অতএব গভীর অসাম্য বর্তমান। এই অসাম্যের

প্রধান কারণই হলো কৃষিভূমির অসমান বণ্টনব্যবস্থা। ভারতবর্ষে যেমন, অন্যান্য আরো দেশেও হয়তো ঠিক সে-রকম, কৃষিজীবীদের সম্পূর্ণ জনসংখ্যার মাত্র শতকরা দশ দেশের অর্ধেক কৃষিভূমি দখল ক'রে ব'সে আছেন। কৃষিভূমির অর্ধেক যাঁদের হাতে, সাধারণত কৃষিজাত আয়ের অর্ধেক উপার্জনও তাঁদের। সুতরাং অসাম্য।

তাই যদি হয়, সমৃদ্ধতর কৃষিজীবীদের ভোগ্য উদ্‌বৃত্তের অন্তত কিছুটা অংশও যাতে দেশের বৃহত্তর কাজে লাগে, সেজন্যই করব্যবস্থার সংশোধন প্রয়োজন। যতই রাজনৈতিক গলাবাজি করা হোক না কেন, এ-সত্য এড়াবার উপায় নেই যে, কি আমাদের দেশে কি শ্যামে কিংবা পাকিস্তানে, সচ্ছল উদ্‌বৃত্ত নিয়ে বর্ধিষ্ণু অবস্থায় এখনো একশ্রেণীর জমিদারপ্রতিম লোক বিরাজ করছেন। তাঁদের বিত্ত চোখে দেখা যায়, খরচের বহর থেকে ধরা পড়ে, তাঁদের জীবনযাত্রার মান কোনো-কোনো মাঝারি শিল্পপতিদের মানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এই শ্রেণীর সঙ্গে কোমল আলাপের ভূমিকা অযৌক্তিক : দেশের আর্থিক প্রগতির জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন, বিনিয়োগের উপায় এখান-ওখান থেকে বাড়তি উদ্‌বৃত্ত, যা হয়তো শিথিল সম্ভোগে ব্যবহৃত হবে, সরকারি কোষখানায় গ্রেপ্তার করা সুতরাং উচ্চশ্রেণীর চাষীদের উদ্‌বৃত্তই বা পাকড়ানো হবে না কেন? দরিদ্রতর কৃষিজীবীদের উপর মৃদু কর-আরোপ, অন্য পক্ষে সমৃদ্ধতর কৃষিজীবীদের সম্পত্তি ও উপার্জনের উপর প্রাগ্রসর হারে করের মাত্রা বাড়িয়ে চলা : এ-রকম ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে অনেক দেশেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সঞ্চয় প্রভূত বাড়ানো সম্ভব।

তা ছাড়া যে-সব দেশে মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে আর্থিক-প্রগতির-জন্য-প্রয়োজন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে, উচ্চতর চাষীদের সেখানে আরো সুবিধে হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির একটি প্রকট ফল হলো তুলনাগতভাবে কৃষিজাত পণ্যাদির মূল্য বৃদ্ধি। যেহেতু মজুরখাটা কৃষকদের যূথবদ্ধতা এখনো আদৌ সুষ্ঠু নয়, এই মূল্য

মানের প্রকারফের থেকে যা লাভ, তার সম্পূর্ণই ধনী চাষীদের করায়ত্ত হয়েছে। কর ধার্য ক'রে রাষ্ট্র কর্তৃক এই লাভের কিছুটা আয়ত্তে নিয়ে এসে দেশের বিনিয়োগে খাটানো খুবই যুক্তিসহ প্রস্তাব।

কৃষিক্ষেত্রে, করব্যবস্থা এবং ভূমিব্যবস্থা সংস্কারের সপক্ষে এবার অন্য-এক যুক্তি উত্থাপন করা যাক। প্রায় সব-ক'টি অনুন্নত দেশেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, সংখ্যায় সহস্র, গৃহস্থ-চাষীরা কৃষিকর্মের বৃহত্তম দায়িত্ব বহন করছেন। কৃষি-উৎপাদন, এবং বৃহৎভাবে দেখতে গেলে উৎপাদনের প্রযোজনা, তাই তেমন সুষ্ঠু নিয়মে হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। তা ছাড়া, যেহেতু জমি তৈরি করা এবং বীজ বোনা থেকে শুরু ক'রে ফসল ঘরে তোলার মধ্যে বেশ কয়েক মাসের ব্যবধান, এই প্রযোজনা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, রাতারাতি ফসলের পরিমাপ বাড়ানো-কমানো সম্ভব নয়। সুতরাং এমন প্রায়ই দেখা যায়, যে-যে তথ্য বা বিচারের বিশ্লেষণে কয়েকমাস আগে উৎপাদন প্রসারণ কিংবা সংকোচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ফসল তৈরি হ'তে-হ'তে সে-সমস্ত তথ্য ও বিচারের প্রকৃতি খোল-নল্চে বদলে গেছে। আরো যা, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক যোগাযোগে হিশেবের গরমিল বেড়েই চলে।

কৃষিকর্মের উদ্যোগে এরকম বহুবিধ অনিশ্চয়তা। এক সঙ্গে সহস্র-লক্ষ কৃষিজীবী আলাদা-আলাদা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, কোন বীজ বপন করা হবে কি হবে না, কোন্-কোন্ ফসল বাড়ানো কি কমানো হবে, কতটা বাড়ানো বা কমানো হবে, ইত্যাদি। এ-অবস্থায় সম্মিলিত, সুচিন্তিত, সুনিয়ন্ত্রিত কৃষি-কল্পনা দুরূহ ব্যাপার। ঘর-পোড়া গোরুর সিঁদুরে মেঘের আতঙ্ক। আমাদের দেশে, এবং আমাদের মতো কৃষিব্যবস্থা যে-সব দেশে, গৃহস্থ চাষীকে পরিকল্পনার মূলসূত্র শেখানো, বিশেষ ক'রে কৃষিকর্মের সম্প্রসারণে উৎসাহিত করা, গলদ্‌ঘর্ম ব্যাপার। তার কারণ আছে। গৃহস্থ, চাষী, তাঁর মনে বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে ভয়। চিরাচরিত যে-ধরনের চাষাবাদ

ক'রে আসছেন, তার এক সুষ্ঠু হিশেব তাঁর মনে কষা আছে—তিরিশ মণ চাল ঘরের জন্য, দশ মণ চাল বাইরের মজুরি বাবদ, তেরো মণ কার্পাস গ্রামের হাটে বিক্রি হবে, মোট খরচ এই, অতএব মুনাফার বহর এত। কিন্তু যে-মুহূর্তে চাষাবাদ বৃদ্ধির কথা বলা হলো, বাড়তি খরচের একটা হিশেব যদিও সঙ্গে-সঙ্গে করা সম্ভব, বাড়তি মুনাফার একেবারেই না। খরচটা সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় করতে হয়, কিন্তু লাভ ভবিষ্যতের গর্ভে: যদি ফসল ভালো হয়, যদি বাজার না মন্দা হয়, যদি বাড়তি ফসলের চাহিদা বজায় থাকে, তা হ'লেই খরচ পোষাবে, অন্যথা নয়। কিন্তু আজ থেকে ছ-মাস বা ন-মাস বাদে দাম কী হবে তা গৃহস্থ চাষীর পক্ষে সঠিক অনুমান করা অসম্ভব, তাই তাঁর ফসল বাড়ানোতে বীতস্পৃহা। দাম বাড়বে এই প্রত্যয়ে নির্ভর ক'রে যদি সব গৃহস্থচাষীই ফসল বাড়াবার সিদ্ধান্ত নেন, ছ-মাস বাদে ফসল হয়তো এতটাই বাড়ে যে মূল্যবৃদ্ধির বদলে বাজারে মূল্যহ্রাসের সূত্রপাত হয়।

আরো এক কারণে কৃষি উৎপাদনে তেমন প্রসার নেই। যন্ত্রপাতি-কলকব্জা ব্যবহার না ক'রে ফেলে রাখলে জঙ্ ধ'রে বিগড়ে যায়, কিন্তু কৃষিভূমির পক্ষে সেরকম আশঙ্কা নেই। জমি পতিত রাখলে একমাত্র ফসলের বহর কম হয়, অন্য-কোনো ক্ষতি নেই। সেজন্য প্রায়ই দেখা যায় বিত্তশালী ভূস্বামীরা নিজেদের বিপুল জমিজমার মাত্র ভগ্নাংশ কোনো-এক বছর আবাদ করেন, বাকিটা ফেলে রাখেন। ফেলে রাখেন এজন্য যে পুরো জমি আবাদ করলে ফসল যদিও বেশি হবে, তুলনায় দাম কিন্তু নিচে নেমে যেতে পারে, সব-মিলিয়ে হয়তো বাড়তি আবাদের খরচ পোষাবে না। অতএব চাষের প্রসার ব্যাহত থাকে, যার মানে কিনা জাতির সামগ্রিক প্রগতি ব্যাহত থাকে।

কৃষি উৎপাদনে যাতে উদ্যম আসে, কৃষিজীবীরা যাতে উৎপাদন-সম্প্রসারণে আগ্রহ দেখান, সেজন্য ইদানীং অনেক ধরনের চেষ্টা আমাদের দেশে এবং অন্যত্র করা হচ্ছে। পূর্ব-নির্ধারিত মূল্যে ফসল

কেনার জন্য রাষ্ট্র থেকে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, ফসল বিক্রয়ের সুবিধের জন্য মার্কেটিং বোর্ড খোলা হয়েছে, ফসল-বীমার সূত্রপাত করা হয়েছে, ফসল তোলবার জন্য দেশের সর্বত্র গোলাঘর তৈরির দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, চাষীদের অজ্ঞতার জন্যই হোক্, অন্ধতার জন্যই হোক্, এখন পর্যন্ত কোনো দেশেই এসব ব্যবস্থায় আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। হালে একটা প্রস্তাব প্রায়ই শোনা গিয়ে থাকে, চাষাবাদ বাড়ানো আশু প্রয়োজন, সুতরাং চাষীদের নামমাত্র মূল্যে কিংবা বিনামূল্যে সেচের জল, সার, ভালো বীজশস্য, উন্নত প্রকরণে শিক্ষা ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হোক্। ইত্যাকার ব্যবস্থাদি ক'রে দিলে আর দেখতে হবে না, যেহেতু আবাদ-বাড়ানোর খরচের বহর অনেকটাই ক'মে আসবে, অধিকাংশ চাষীই সম্প্রসারণে উৎসাহী হবেন, দেশের সমস্যা ঘুচে যাবে।

কিন্তু যা মনে হয় আসলে অনেক ক্ষেত্রেই তা ঘটে না। সর্ব-প্রকার সুযোগ-সুবিধে জুগিয়ে দিয়েও দেখা গেছে যে, তেমন-কিছু অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না, উদ্দীপনা আসছে না। তা ছাড়া মস্ত প্রশ্ন থেকে যায়, এই যে চাষীদের জন্য নানা সুবিধের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এর খরচের টাকা আসবে কোত্থেকে। সুতরাং পুরোনো সমস্যায় ফিরতে হয়: কৃষিউন্নতির জন্য যে-বিনিয়োগ প্রয়োজন, যেন-তেন-প্রকারে তার প্রয়োজনানুগ উদ্‌বৃত্তও কৃষিক্ষেত্র থেকেই আহরণ করতে হবে।

তা হ'লে ভাবতে হয়, চাষাবাদের খরচের একটা ভাগ রাষ্ট্র থেকে বহন করা হবে, সে-আশ্বাসেও যদি সম্ভ্রান্ত চাষীদের চেতনায় বিপ্লবের ছোপ না-ধরানো যেতে পারে, বিপরীত পন্থা অনুসরণ করলে কি ফল হবার সম্ভাবনা আছে? কম খরচের ঝলকানিতে যদি কাজ না হয়, বেশি খরচের পীড়নের চাপেই কি তবে ফলন বাড়বে? প্রস্তাবটি হেঁয়ালির মতো শোনাতে পারে, সুতরাং বিশদ ক'রে বলা যাক। ধরা যাক্, এক কৃষিজীবী, যাঁর তিনশো বিঘা জমি, আপাতত দু'শো বিঘা আবাদ করা হচ্ছে, বাকি একশো বিঘা এমনি প'ড়ে

আছে ; নয়তো অন্য-এক কৃষিজীবী, যাঁর মাত্র তিরিশ বিঘা জমি, পুরো তিরিশ বিঘাই আবাদ করা হচ্ছে, কিন্তু চাষীর সেচের জল নিতে আগ্রহ নেই, উন্নত বীজশস্যে উৎসাহ নেই, সার কিনতে তাঁকে কোনোদিন দেখা যায় না। এই দুই ক্ষেত্রেই যদি ভূমিকর কিছুটা উঁচু হারে হঠাৎ বেঁধে দেওয়া যায়, চাষীর খরচ সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে, উপার্জন না-বাড়লে লাভের পরিমাণে সুতরাং টান পড়বেই। লোকচরিত্র বোঝা মুশকিল, তবে এমন অবস্থায় মনে হয় প্রথম চাষী বাধ্য হবেন দুশো বিঘার উপর আরো-কিছু জমি আবাদ করতে, এবং দ্বিতীয় চাষী বাধ্য হবেন চাষের প্রকরণে কিছু উন্নতিসাধনে, কিছু পরিমাণে সেচের জল, ভালো বীজ, উন্নত সার ইত্যাদির দিকে নজর দিতে। ফলে সামগ্রিক কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, তোয়াজে যা সম্ভব হয়নি, চোখরাঙানিতে তা হবে।

বলা হয়ে থাকে, কৃষি-উৎপাদনে উপলগতি আসছে না কারণ অধিকাংশ কৃষিজীবী রক্ষণশীল, ভয়ভীত, সীমিত গণ্ডিতে তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা হিশেব-নিকেশের পরিক্রমা ; ছোট গণিতের ভূমণ্ডলে সাধারণ কৃষকের প্রব্রজ্যা, রোমাঞ্চকর অভিযানে তাঁর বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। যদি তা-ই হয়, তা হ'লে হয়তো উপরের প্রস্তাব অনুযায়ী কর চাপিয়ে ব্যয়ের মাত্রাধিক্য ঘটালেই তবে প্রয়াসের ব্যাপ্তি আশা করা যেতে পারে। বিশেষ ক'রে বিত্তবান উচ্চচাষীর কাছে বর্তমান অবস্থায় জমি এবং মজুর দুই-ই অপেক্ষাকৃত সুলভ: ভূমির রাজস্ব নামমাত্র, দিনমজুরিও সামান্য। এ-অবস্থায় কৃষিকর্মের হিশেবের অঙ্কে শিথিলতা আসতে বাধ্য। বেশি ভূমি আবাদ ক'রে পর্যাপ্ত শস্যোৎপাদনে আশঙ্কা যে, সরকারের শ্যেন দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে, অন্য পক্ষে বেশি মজুর খাটাতে গেলেও আশঙ্কা যে মজুরচাষী হঠাৎ একদিন বেশি মজুরি দাবি ক'রে বসবে। সুতরাং ঢিলে দাও, অল্প-কিছু আবাদ ক'রে সন্তুষ্ট থাকো, কী দরকার বেশি লাভের স্বপ্ন দেখে: ব্যয়ের বহর বাড়বে, ঝুঁকি বাড়বে, পরিশ্রম বাড়বে, কিন্তু লাভের পরিমাণ বাড়বে কিনা সেটা আগে থেকে নিশ্চয় ক'রে তো বলা চলে না।

এ-ধরনের ভীরু পাটিগণিতে যুক্তি আছে, অভিজ্ঞতার স্বাক্ষরও আছে। যুক্তির যা স্খলন, তা এই যে, স্থির ভূমিতে দাঁড়িয়ে অঙ্ক কষা হচ্ছে। যে-মুহূর্তে বাড়তি ভূমিরাজস্ব বসিয়ে চাষের ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হবে, এই যুক্তির সারবত্তা শেষ হয়ে যাবে। কারণ যদি সঙ্গে-সঙ্গে উৎপাদন বাড়ানো না-হয়, ব্যয়বৃদ্ধিহেতু উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ আগের তুলনায় হ্রাস পেতে বাধ্য। যদি প্রাক্তন উদ্‌বৃত্তে ফিরতে হয়, তা হ'লে আবাদের পরিমাপ বাড়িয়েই হোক্, কি উন্নত প্রকরণ প্রয়োগ ক'রেই হোক, চাষীকে উৎপাদন বাড়াতেই হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে-আলোচনা হলো, তার মুখ্য প্রস্তাব তা হ'লে এই যে, কৃষিকর্মের উন্নতি সম্ভব একমাত্র কৃষিভূমি এবং কৃষিশ্রম তুমূর্ল্যায়ণে। ভূমিমূল্য বাড়াতে গেলে প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত ভূমিরাজস্বের, নয় ভূমিসংস্কারের। ভূমিসংস্কারের ফলে রাষ্ট্রকর্তৃক সম্পন্ন কৃষকদের কিছু-কিছু জমি কেড়ে নেওয়া হবে, সুতরাং আওতায় থাকা ভূমির পরিমাণ কমবে, অতএব ভূমির নিহিত মূল্য বাড়বে। অন্য পক্ষে যা করা যেতে পারে, তা গ্রামাঞ্চলে দিনমজুরির হার বাড়িয়ে দেওয়া, ফলত সঙ্গে-সঙ্গে কৃষিকর্মের ব্যয়বৃদ্ধি। কিন্তু যতদিন আমাদের দেশে, এবং অন্যত্র, কৃষক আন্দোলন দানা না-বাঁধছে, গ্রামে দিনমজুরি বাড়ানো ততদিন সম্ভব নয়। সুতরাং ভূমিকর-বৃদ্ধি ও ভূমিসংস্কারের উপরই আপাতত প্রধান জোর দিতে হবে।

বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন-কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি যার শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ নেই। আমার বর্তমান মতামতও তাই সমালোচনাসাপেক্ষ, এবং নিশ্চয়ই মনীষী ও পণ্ডিতব্যক্তিরা অনেক আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। তবে, যেহেতু কৃষিতে প্রগতি না-হ'লে সর্বপ্রকার প্রগতির গতিই রুদ্ধ থাকবে, বিষয়টি নিয়ে নিষ্ঠাশীল চিন্তা প্রয়োজন। সে-চিন্তা যত বাড়ে, দেশের পক্ষে মঙ্গল: সেজন্যই এই প্রবন্ধের ভূমিকা।

১৯৬৩

অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা মিলিয়ে বিজ্ঞান। শুধু অনুভূতির ধাতু দিয়ে যা রচনা সম্ভব তা দর্শন, আর একমাত্র অভিজ্ঞতায় ভর ক'রে এগোতে যদি হয়, তা হ'লে যেখানে পৌঁছবো তা বড়ো জোর পুরাণবৃত্তান্তে। আমাদের বিশুদ্ধ চিন্তা যে-উপপাদ্যে উত্তীর্ণ করে, তার কানে-কানে তারপর অভিজ্ঞতার কথা বলা: তোমার এইটুকু ঠিক, বাকি অংশ বদলে নিতে হবে, কারণ আমি অন্যরকম দেখেছি। চিন্তা বিনম্র ধৈর্যে ফিরে যায়, পরিশুদ্ধ বিন্যাসে ফিরে আসে, আরেকবার অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়, সিদ্ধান্তের আরো-একটু রদ-বদল। চিন্তার কাঠামো হয়তো অটুট থাকে, যা বদলে যায় তা বিবৃতির একটি-দুটি পরিসঙ্গ-অনুষঙ্গ। অভিজ্ঞতা থেকে দর্শন, দর্শন থেকে অনুশীলন; কিছু-কিছু সংস্কার প্রাক্তন মোহ-আবরণ ঘুচিয়ে ফেলে, নতুন আবিষ্কার থেকে নতুন চিন্তার সাযুজ্যবন্ধন হয়। চিন্তা এবং পরিচয়ের রসায়নে এমনি ক'রেই বিজ্ঞান গতির আবেগ পায়।

ধনবিজ্ঞানেও তাই। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধনবিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, বিনিয়োগের হারের সঙ্গে আর্থিক প্রগতির অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক, এখনো অখণ্ডিত। চিরকালই এই অখণ্ডতা বজায় থাকবে ব'লে মনে হয়। বিনিয়োগের পরিমাপ বেশি ব'লেই পূর্ব ইওরোপে-চীনে-জাপানে জাতীয় উপার্জন বৃদ্ধির হার উপলগতি: আমাদের প্রগতির বেগ স্তিমিত, কারণ আমাদের বিনিয়োগের অঙ্ক তুলনায় অনেকটাই কম। কিন্তু এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তটির সূত্র ধ'রে কতগুলি নিবন্ধের জন্ম হয়েছে যাদের সব-ক'টিই হয়তো সমান তথ্যসম্পন্ন নয়। বিনিয়োগের আনুপাতিক কত অংশ ইস্পাত-যন্ত্রপাতি-সড়ক-বন্দর-বিদ্যুৎ-সেচনে ব্যয়িত হবে, কত অংশ নিত্যকার তাৎক্ষণিক চাহিদার ইন্ধন মেটাতে ব্যয়িত হবে, তা নিয়ে

অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের মনে একটা স্পষ্ট-গোছের অঙ্ক কষা ছিল। শুধু তাই নয়, মোট যা যন্ত্রপাতি তৈরি হবে, তার কত পরিমাণ জামাকাপড়-চকোলেট-কলের-গান-হাওয়া-খাওয়ার-মোটরগড়ি ইত্যাদি তৈরি করার মতো যন্ত্রপাতি, আর কত পরিমাণ আরো-এক দফা নতুন যন্ত্রপাতি করার সরঞ্জাম হিশেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিতব্য, সে-বিষয়েও এক আদর্শ গ'ড়ে উঠেছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের আশ্চর্য প্রগতি আমাদের মুগ্ধতার উজ্জ্বল আকাশে উত্তীর্ণ করে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সূচনা-সময়ের সঙ্গে সে-দেশের একেবারে হালের অবস্থা তুলনা ক'রে বিস্মিত-হতচকিত আমরা, সোভিয়েট পরিকল্পনার মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে অতএব আমাদের উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা: বিনিয়োগের হার যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে চলো, আপাতত আদৌ ঢিলে দিও না; বিনিয়োগের সাহায্যে যে-যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উৎপাদন-উপকরণ তৈরি হবে, তাদের ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে নিয়োগ কোরো না বরঞ্চ সেই যন্ত্রপাতিগুলির একটা বড়ো অংশ আরো যন্ত্রপাতি তৈরি করার জন্য ব্যবহার করো; তা হ'লেই দেখতে পাবে কয়েক বছর বাদে কলকারখানা-যন্ত্র-বিদ্যুতে সারা দেশ ছেয়ে গেছে। এই যন্ত্র-বিদ্যুৎ-পরিবহনের সাহায্যে এবার তোমরা দ্রুততর উৎপাদন বাড়িয়ে যেতে পারবে, এবং এখন আর-কোনো বাধা নেই যে-কোনো-রকম জিনিশেরই উৎপাদনে। প্রথম দিকে কৃচ্ছ্রসাধন করো, অন্তিমে অপরূপ ফল পাবে। প্রথম দিকে অশনে বসনে অভাব ঘটে ঘটুক, পরে তা পুষিয়ে যাবে। অন্য পক্ষে গোড়া থেকেই যদি বিনিয়োগের বৃহদংশ ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে নিয়োগ করো, তা হ'লে দু'এক বছর হয়তো একটু ভালো খাবে-পরবে, কিন্তু তার পরেই টানাটানির ঋতু। যেহেতু ভবিষ্যতের কথা ভাবোনি, নতুন-নতুন যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ বৃদ্ধির দিকে নজর দাওনি, আখেরে মুশকিল। যন্ত্র এবং অন্যবিধ সরঞ্জাম যেহেতু বাড়বে না, উৎপাদনক্ষমতা তাই মোটামুটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে, ইতিমধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, সাচ্ছল্য ভোগ ক'রে-ক'রে

অধিকতর সাচ্ছল্যের জন্য জনসাধারণের বাসনা জাগবে, অথচ খাদ্য, পরিধেয়, এবং বিলাসব্যসনের সামগ্রীর উৎপাদন পূর্ববৎ। সুতরাং, পরিণামে যদি দুঃখলগ্ন না-হ'তে চাও, আপাতত নিবৃত্তির মন্ত্র শেখো, বিনিয়োগ বাড়াও, এবং বিনিয়োগের গুরু অংশ প্রতিনিয়ত যন্ত্র-পরিবহন-বিদ্যুৎ ইত্যাদির প্রসারে বিন্যস্ত করো।

সোভিয়েট পরিকল্পনার এই যুক্তিসূত্রে অবশ্যই প্রত্যক্ষ সমস্যার রঞ্জন ছিল। দুটো বিষয় বিশেষ ক'রে লক্ষণীয়। শত্রু এবং শত্রুমন্য দিয়ে ঘেরা; সোভিয়েট দেশে সে-সময় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনেও ইস্পাত এবং কলকব্জার উপর জোর দেওয়ার তাগিদ দেখা দিয়েছিল তাই। তা ছাড়া, বিনিয়োগের মাত্রা যেহেতু বাড়ানো কর্তব্য, সম্ভোগের পরিমাণ যে-ক'রেই-হোক তুলনায় কমিয়ে আনতে হবে। বহির্বাণিজ্য রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং বাইরে থেকে ভোগ্যপণ্য আসার আশঙ্কা নেই। কিন্তু এ তো হলো শুধু এক দিক। দেশজ পণ্য থেকেও সম্ভোগের মাত্রা বাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব : সে-সম্ভাবনা প্রতিরোধ করার সর্বোত্তম উপায় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা, এবং ভোগ্যপণ্য তৈরিতে নিযুক্ত হতে পারে এ-ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি পর্যন্ত ভীষণভাবে কমিয়ে নিয়ে আসা। ভোগ্যপণ্য না-থাকলে লোকেরা উপার্জিত অর্থ সম্ভোগে ব্যয় করতে অক্ষম হবে, বাধ্যত সঞ্চয় বাড়বে, অতএব সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ।

সোভিয়েট সিদ্ধান্তগুলির অধিকাংশই অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হয়েছে, ঐ দেশের মানুষ প্রাথমিক কৃচ্ছ্রসাধনার প্রসাদ ইদানীং পেতে শুরু করেছে। শুধু এক-জায়গায় অঙ্ক মেলেনি। ভেবে অবাক হ'তে হয়, কৃষিকর্মের বাইরে সোভিয়েট দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে কুড়িগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ কৃষি-উৎপাদন এমনকি দ্বিগুণ পর্যন্ত হয়নি। এবং কৃষিতে যে-পরিমাণ উৎপাদন বেড়েছে তার সমগ্রাংশই নতুন জমি আবাদ করার ফলে, গড়ে জমির উৎপাদনক্ষমতা সামান্যতমও বাড়েনি। যেহেতু, যন্ত্রের মতো, পরিবহনের মতো, বিদ্যুৎশক্তির মতো, কৃষিজাত পণ্যাদিও

প্রগতিসঞ্চারের বড়ো উপকরণ—কাঁচামালের কথাই ধরা যাক শুধু—, সম্প্রতি সোভিয়েট দেশের আর্থিক উন্নতির হার এই কারণে দ্রুত ক'মে আসছে।

কৃষির ব্যাপারে মনে হয় সোভিয়েট ইউনিয়নে দুই ধরনের ভুল অঙ্ক গোড়া থেকেই কষা হয়ে আসছিল। প্রথম ভুল ঘটে কৃষির জন্য প্রয়োজনানুগ বিনিয়োগের হিশেবে। কৃষিকর্মের মোড় ফেরাবার উদ্দেশ্যে প্রধানত জোর দেওয়া হয়েছিল বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ট্রাক্টর তৈরির উপর। যে পরিমাণ টাকা ট্রাক্টরশিল্পে ব্যয়িত হয়েছে, তার কণাংশও সার তৈরির জন্য বরাদ্দ হয়নি। কীটনাশক ঔষধাদি প্রস্তুতের ব্যাপারেও অবহেলা দেখানো হয়েছে, উন্নত বীজশস্যের উপকারিতা নিয়েও তেমন মাথাব্যথা দেখা যায়নি। সব-মিলিয়ে, অন্তত ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত, সোভিয়েট দেশে কৃষিখাতে নির্দিষ্ট বিনিয়োগের মোট অঙ্ক অনুপাতে যেমন কম থেকে গেছে, বরাদ্দ অর্থের বণ্টনেও সে-রকম একপেশে চিন্তাভাবনা আধিপত্য বিস্তার করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং পশ্চিম ইওরোপে কৃষিভূমির গড় উৎপাদনক্ষমতা গেলো পঞ্চাশ বছরে পাঁচ-ছয়-সাতগুণ বেড়েছে: এর প্রায় পুরোটাই সম্ভব হয়েছে রাসায়নিক সার, উন্নত বীজশস্য ও কীটনাশক প্রণালী-প্রয়োগে। শ্রীযুক্ত ক্রুশ্চেভের ক্ষমতায় আসীন হবার আগে পর্যন্ত, সোভিয়েট দেশে কৃষিবিনিয়োগের এ-দিকটা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামানো হয়নি।

কৃষিক্ষেত্রে দ্বিতীয় সমস্যা এক হিশেবে আরো অনেক জটিল। উৎপাদনের প্রক্রিয়া সাধারণত খুব আবেগহীন ব্যাপার। কেউ যদি বাণিজ্যে নামতে চান, কিংবা কোনো কারখানা বসাতে উৎসাহী হন, প্রশস্ত সরল রেখায় তিনি এগোতে পারেন। তাঁর হাতে হয়তো মূলধন আছে, তার কিছু খরচ ক'রে তিনি যন্ত্র কিনবেন, কোনো জায়গা ভাড়া ক'রে সেই যন্ত্র স্থাপন করবেন, কাঁচামাল-বসদের ব্যবস্থা করবেন, এবং, সব শেষে কিছু শ্রমিক নিয়োগ করবেন। শ্রমিকরা মজুরি নিয়ে খাটবে, পণ্য উৎপাদন করবে, মালিক পণ্য বিক্রয় ক'রে লাভের

ব্যবস্থা করবেন। যদি সমাজতান্ত্রিক কাঠামো হয়, তা হ'লেও খুব-একটা ব্যবস্থার রকমফের নেই: রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মালিকানায় শ্রমিকদের এবার অধিকার জন্মাবে, কিন্তু শিল্পোৎপাদনের চরিত্র তাতে তেমন বদলাবে না। যন্ত্রের ভূমিকা শিল্পে যতই বাড়ছে, শিল্পোৎপাদনের প্রক্রিয়া ততই অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে আসছে। তা ছাড়া, দেশের দু'তিন হাজার বড়ো-বড়ো কারখানার যদি সালতামামি করা যায় দেখা যাবে, উৎপাদিত শিল্পপণ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই কিংবা হয়তো তারো বেশি—এই কারখানাগুলিতে তৈরি হচ্ছে। সুতরাং এই দু'তিন হাজার কারখানার সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করতে পারলেই উৎপাদনের প্রগতি অব্যাহত থাকবে।

কিন্তু কৃষির ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্যরকম। কৃষিকম সমস্ত দেশ জুড়ে, হাজার হাজার লক্ষ-লক্ষ পল্লীগ্রামে একই গ্রামে হয়তো দু'তিনশো কৃষিজীবী, তাঁরা প্রত্যেকেই মনের দিক থেকে সার্বভৌম, ইচ্ছার দিক বিবেচনা করলে পরস্পর অবচ্ছিন্ন: উৎপাদন বাড়াতে হ'লে এঁদের সবাইকেই সমমন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে: একই চেতনার বিদ্যুৎ সকলের মনে এক সঙ্গে প্রবাহিত না-হ'লে ফসল পরিকল্পনা-অনুযায়ী বাড়বে না। এই কাজ তাই দু'হাজার-তিনহাজার চাষীকে শিখিয়ে-পাড়িয়ে সমাধা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত না-হ'লে কৃষি-উৎপাদন খুব বেশিদূর এগোবে ভাবা দুরাশা। সোভিয়েট দেশে প্রধান ভুল ঘটেছিল কৃষিজীবীদের মানসিকতা নিয়ে সমস্ত জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর প্রায় ধ'রেই নেওয়া হয়েছিল যে, শোষণের প্রতীক জমিদারদের যেহেতু উচ্ছেদ ঘটনো হয়েছে, চাষীরা এবার উৎফুল্ল হৃদয়ে রাষ্ট্রভক্তিতদ্‌গত হয়ে ফসল বাড়াবার দিকে মনোনিবেশ করবে। কিন্তু ভূমিস্বত্ব সম্পর্কে চাষীদের মনে যদি মোহ থাকে, জমিদারি ঘুচিয়ে রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করলেই তা ঘুচবে না। জমি এক দিকে যেমন কৃষিভূমি, অন্যদিকে তেমনি বসতির ভিটেমাটিও: জমি সম্পর্কে তাই অধিকাংশ কৃষিজীবীর মনে এক অদ্ভুত দুর্বলতা, অনেক নিবিড়-

হয়ে-জড়ো-হওয়া আবেগের ব্যাপ্তি। যে-জমি রাষ্ট্রের, সে-জমিতে তারও অধিকার : এ-ধরনের দূরাগত যুক্তিতে অধিকাংশ কৃষকের মন হয়তো সায় দেবে না। সোভিয়েট দেশে সুদীর্ঘ সময় কেটেছে এই সায় পাওয়ার চেষ্টায় ; ইতিমধ্যে উৎপাদনের হার অবশ্যতই স্তিমিত থেকে গেছে। চাষীদের মন অসেতুসম্ভব হবার ফলে মনের আদানপ্রদানও অবরুদ্ধ থেকেছে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা সর্বজ্ঞ নন, কোন গ্রামে কীসের অভাব—সেচের জলের, না কি উন্নত বীজশস্যের. না কি সারের—সব-সময় তাঁদের পক্ষে নির্ভুল জানা মুশকিল। তা ছাড়া বিশ-তিরিশ-চল্লিশের দশকে সব গ্রামেই কমিউনিস্ট পার্টির সমান প্রভাব না-থাকায় অনেক জায়গাতেই কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে সরকারের সংযোগ ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের প্রয়োজন এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রায়ই তাই গরমিল থেকে গেছে, যে-গ্রামে যে-সালে সার পৌঁছনো দরকার, সে-গ্রামে সে-বছর হয়তো চকচকে ঝকঝকে ট্রাক্টর পৌঁছেছে, যেখানে সেচের জল দরকার সেখানে হয়তো পৌঁছেছে সার।

কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ ক'রে ভাবা দরকার, যন্ত্রপাতির খাতে বিনিয়োগ অনির্দিষ্টভাবে বাড়িয়ে গেলেই আর্থিক প্রগতি করতলগত আমলকীর মতো হয়ে আসবে না : সোভিয়েট দেশ এটা ঠেকে শিখলো। ইদানীং আমরা চীন দেশ থেকে খুব বেশি খবরাদি পেয়ে থাকি না, কিন্তু যতটুকু পৌঁছয় তা থেকে মনে হয় কৃষি উৎপাদনে সোভিয়েট অসাফল্যের দৃষ্টান্ত চীনেদের সাবধানতা শিখিয়েছে। শুধু বিদ্যুৎ-পরিবহন-যন্ত্রের প্রসারের দিকেই নজর দিলে চলবে না, কৃষিঘটিত বিনিয়োগের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বাড়াতে হবে, নইলে সোভিয়েট দেশের দশা হবে : মনে হয় এই উপলব্ধি চীন দেশে এসেছে। গোড়াতে অবশ্য ঠিক এ-রকম ছিল না, বরঞ্চ চীনের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সোভিয়েট বিনিয়োগ প্রথার আদি দোষগুণ সব-কিছুই উপস্থিত। কিন্তু, সম্ভবত ১৯৫৯-৬০ সালের খাদ্যাভাবের প্রত্যক্ষ ফলে, চীন-পরিকল্পনায় গোঁড়ামি ইদানীং অনেকটাই কমেছে।

নতুন যে-সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে কৃষিবিনিয়োগের তুলনামূলক হার বেশ-কিছু বাড়ানো। সার, কীট-নাশক ঔষধ, উন্নত বীজশস্য, উন্নত রোপন-প্রণালী প্রভৃতি ব্যাপারেও চীনেদের মনোনিবেশ বেড়েছে, নতুন ধরনের হাল-লাঙল-কাস্তে-খুরপি নিয়েও প্রচুর আলাপ-আলোচনা চলছে। সব-মিলিয়ে মনে হয়, কৃষি-উন্নয়ন প্রণালীর সমস্যাদি কেন্দ্র ক'রেই উপস্থিত চীনের বিনিয়োগ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলা হয় 'ভারি শিল্প' তার উপর আগের মতো আর জোর দেওয়া হচ্ছে না। ট্রাক্টরের উপযোগিতা নিয়ে এখনো যদিও গম্ভীর-রাশভারি প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, কৃষির ক্ষেত্রে ট্রাক্টরকে পাশে সরিয়ে রেখে যে অন্য-ধরনের বিনিয়োগ সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়, সে-স্বীকৃতি অন্তত এসেছে।

কিন্তু এ তো গেল স্রেফ কৃষি-প্রণালীর কথা ; রুশদের যেমন ছিল, চীনেদেরও সবচেয়ে বড়ো সমস্যা কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে হার্দ্য বিনিময়ের। এই ব্যাপারে চীন সরকার কতটা সফল হচ্ছেন বলা কঠিন। সাত লক্ষ গ্রাম নিয়ে চীনদেশে কৃষিভূমির বিস্তার, এবং অন্তত চল্লিশ কোটি লোকের জীবিকা কৃষিকর্ম। এত লক্ষ গ্রাম এবং এত কোটি লোককে বশংবদ করতে পারলেই তবে কৃষিতে উন্নতি সম্ভব, উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা চালানো সম্ভব। একনায়কত্বের দেশে সব-কিছুই নিয়ন্ত্রণ করা চলে, এ-ধরনের একটা কুসংস্কার আমাদের অনেকেরই মনে আছে। কিন্তু আইন ও দণ্ডের ভয় দেখিয়ে চল্লিশ কোটি লোককে বশে আনা যায় না, সেজন্য প্রয়োজন অন্যবিধ প্রতিভার! শতাব্দীর তিরিশ শতকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির যে-ব্যাহব্যাপ্তি ছিল, এমন হ'তে পারে, তুলনায় চীনের গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমানে অধিকতর প্রভাব। তা হ'লেও সন্দেহ হয়, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যস্থতা পেরিয়ে অতিরিক্ত-কিছু করার প্রয়োজনীয়তা চীন কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করছেন, এবং সেজন্যই গ্রামাঞ্চলে 'কমিউন' গঠনের হিড়িক। কমিউনের সপক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তি দাঁড় করানো যেতে পারে, তবে শুভফল যা-যা

পাওয়া যাচ্ছে, উদাহরণ-স্বরূপ তাদের একটির উল্লেখ করছি। কমিউন প্রথা শুরু হবার পর থেকে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের ঘরের কাজের বহর অনেকটাই ক'মে গেছে, ফলে অনেক সমর্থ মেয়ে বাড়তি উপার্জনের জন্য বাইরে যেতে পারছেন; অতএব একদিকে কৃষির উৎপাদনও যেমন বাড়ছে, অধিকাংশ পরিবারের গড় উপার্জনের পরিমাণও সেই সঙ্গে ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে। এ-রকম যদি কয়েকটি বছর নিস্তরঙ্গ অতিবাহিত হয়, গ্রামাঞ্চলে সন্তুষ্টির মাত্রা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে এবং এমন হ'তে থাকলে কর্তৃপক্ষ কৃষিজীবীদের কাছ থেকে অধিকতর সহযোগিতা আশা করতে পারেন।

চীনের কর্তৃপক্ষ হয়তো সফল হবেন, হয়তো হবেন না। প্রসঙ্গটি ইচ্ছে ক'রেই আমি উত্থাপন করেছি, কারণ চীনে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার হদিশ রাখা এক হিশেবে ভারতবর্ষের পক্ষে মস্ত প্রয়োজন। আমাদের আর্থিক অবস্থার প্রতিবিম্ব খুঁজতে হলে বাইরের পৃথিবীতে চীন ছাড়া অন্য-কোনো দেশই নেই। না সোভিয়েট দেশ, না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, না ব্রাজিল, না অন্য-কোথাও, একমাত্র চীনেই আমাদের মতো পুঞ্জ-পুঞ্জ সমস্যা: শিল্প বিদ্যুৎ-পরিবহনের অভাব, কৃষিক্ষেত্রে জরাজীর্ণতা, জনসংখ্যাবৃদ্ধির বর্ধমান হার। চীনের যেমন, আমাদেরও প্রধানতম সমস্যা হলো পাঁচ লক্ষ গ্রামে ছড়ানো প্রায় পঁয়তিরিশ কোটি কৃষিজীবীর মন-বোঝা মন-পাওয়ার সমস্যা: কৃষি-উৎপাদন স্রোতস্বিনী না-হ'লে আমাদেরও মুক্তির আশা পরাহত।

১৯৫১ সালে দেশে আর্থিক পরিকল্পনা শুরু হয়েছে, কিন্তু এই বারো-তেরো বছরে কৃষির ব্যাপারে আমরা তেমন-কিছু অগ্রসর হয়েছি ব'লে মনে হয় না, গত দু'তিন বছরে কৃষি-উৎপাদন আদৌ বাড়েনি। সবসাকুল্যে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন সম্ভবত ১৯৫১ সালের তুলনায় শতকরা তিরিশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু কৃষিজীবীর সংখ্যা বেড়েছে তারো বেশি হারে, অতএব কৃষকের গড় উৎপাদনের সূচক আসলে হ্রাস পেয়েছে। তা ছাড়া উৎপাদন যা বেড়েছে তা প্রধানত সম্ভব হয়েছে আবাদি জমির পরিমাণ বাড়িয়ে, প্রণালীতে উৎকর্ষ থেকে

আদৌ শস্যসম্ভার হয়নি। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আমাদের খাদ্যশস্যের ঘাটতি ছিল সম্পূর্ণ চাহিদার শতকরা পাঁচ ভাগ পরিমাণ: এত অর্থব্যয়-অধ্যবসায়-আন্দোলন সত্ত্বেও ঘাটতির আনুপাতিক অঙ্ক একই রকম আছে, এবং এখনো প্রতি বছর বিদেশ থেকে আমাদের তিরিশ-চল্লিশ লক্ষ টনের মতো খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। আপাতত অবশ্য খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য অপরের সাহায্যে আহরণ করতে পারছি। কিন্তু পরদেশীদের মহানুভবতায় একদিন-না-একদিন ক্লান্তির ঢল নামবেই, আমরা ইতিমধ্যে যদি কৃষি-উৎপাদনে উদ্দিষ্ট বিপ্লব ঘটাতে না-পারি, তা হ'লে সহানুভূতির ঘড়াও শূন্যে গিয়ে ঠেকবে বাড়তি কৃষিজমিও আর অবশিষ্ট থাকবে না যে আবাদ বাড়িয়ে কোনোক্রমে সংকট রোধ করবো। আমরা যে-তালে এগোচ্ছি তাতে মাঝে-মাঝে আশঙ্কা হয় শেষের সেদিন ভয়ংকর খুব বেশি দূরে নেই। এখন পর্যন্ত জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের সঙ্গে কৃষি-উৎপাদন প্রসারের হার কোনোক্রমে পাল্লা দিতে পেরেছে, কিন্তু তাতে আত্মপ্রসাদের অবকাশ কোথায়? কৃষিপণ্যে উদ্‌বৃত্ত আমাদের অন্বিষ্ট, সে-উদ্‌বৃত্তের অভাবে শিল্প শ্লথগতি হবে, বৈদেশিক মুদ্রার অনটন অব্যাহত থাকবে নয় তো বাড়বে, কিছুতেই সেই আশ্বাসের ঋতুকে টেনে এনে হাজির করা যাবে না যার আবেষ্টনীতে দাঁড়িয়ে বলতে পারবো, আমাদের বিজয়-কেতন ওড়াবার সময় আগত, আমাদের জন্য সব প্রস্তুত এবার আমরা হু-হু এগোবো। অন্য সব-কিছু ছেড়ে দিলেও, দেশের শতকরা সত্তর ভাগ কর্মজীবী এখনো কৃষি থেকে জীবিকা আহরণ করেন সুতরাং চাষাবাদের হাল না-ফিরলে তাঁদের অবস্থাও ফেরবার নয়। তাঁদের অবস্থা উন্নত হ'লেই শিল্পেও উদ্দামগতি আসবে, তার আগে নয়। শিল্পজাত পণ্য কেনবার সঙ্গতি চাই দেশে, কৃষির প্রসার ঘটলেই তা সম্ভব। শিল্পে যে-মজুরসম্প্রদায় খাটবে, তাদের খাদ্যও আসবে কৃষিগত উদ্‌বৃত্ত থেকে, এবং এই একই উদ্‌বৃত্ত মেটাবে কাঁচামালের চাহিদা।

সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি সব-কিছুই তাই কৃষিসম্পদ; এই সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি এখনো যেহেতু ধরাছোঁয়ার বাইরে,

আমাদের পরিকল্পনার ব্যর্থতা সর্বত্র এক অপ্রচ্ছন্ন নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। এই উৎকণ্ঠা এক হিশেবে ভালো : উদ্‌বেগ থেকেই প্রশ্নের উৎস, আত্মবিশ্লেষণের আরম্ভ। এমন নয় যে কৃষির জন্য আদৌ কিছু করা হয়নি ; সে-রকম অভিযোগ অন্যায় অনৃতভাষণ হবে। রাষ্ট্রের তরফ থেকে গত বারো-তেরো বছর অন্তত তিন হাজার কোটি টাকা কৃষিসম্প্রসারণে বিনিয়োগ করা হয়েছে ; এই বিনিয়োগের অর্থ প্রায় সম্পূর্ণই অ-কৃষিজীবীদের কাছ থেকে এসেছে, কৃষকদের উপর করভার চাপিয়ে সংগ্রহ করা হয়নি। ভূমিসংস্কার যেটুকু হয়েছে তাতে বড়ো-বড়ো রাজা-মহারাজাদের একটু অসুবিধে হ'লেও অধিকাংশ ভূম্যধিকারীর আদৌ অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটেছে ব'লে মনে হয় না। রাষ্ট্রকর্তৃক সেচের জল বাড়াবার, উন্নত কৃষিপ্রণালী শেখাবার, শস্যের উচিত মূল্য বজায় রাখবার, উন্নত বীজশস্য এবং উৎকৃষ্ট সার পৌঁছবার হরেকরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে, হচ্ছে ; কৃষিতে তা হ'লেও ব্যাপ্তি আসছে না কেন ?

সন্দেহ না হয়েই পারে না, আমাদের সমস্ত ব্যবস্থায় কোথাও একটা মস্ত ফাঁকি থেকে যাচ্ছে, গ্রামোন্নয়নের গঠনপ্রণালীতে কোনো অবহেলা প্রবেশ করেছে। খুঁটিয়ে দেখলে অনেকগুলি অর্ধপ্রত্যয় মনে স্থান পাবে : হয়তো যে-সব সাহায্য বিলোনো হচ্ছে, অর্ধপথে তারা লক্ষভ্রষ্ট হচ্ছে। আমাদের পল্লীসমাজ এখনো অসাম্য দিয়ে ঘেরা : শ্রেণী-ও বর্ণভেদহেতু অনাচার এখনো প্রচুর, সমাজতন্ত্রের ধুয়ো আওড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে বিত্তবানদের সমৃদ্ধতর করবার সুযোগ-সুবিধে বাড়ছে বই কমছে না। কাগজে-কলমে পুঁথি-পত্রে সংবিধানে-সনদে যা-ই লেখা থাকুক না কেন, যেহেতু গ্রামাঞ্চলে এখনো ধনীপক্ষই প্রবল, এমন হ'তে পারে সেচের জল, উন্নত বীজশস্য, রাসায়নিক সার সমস্ত-কিছুই উচ্চবিত্ত কৃষিজীবীদের করায়ত্ত হচ্ছে, সুতরাং রাষ্ট্রীয় সাহায্যের শুভফল সর্বব্যাপী হ'তে পারছে না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে ব'লে শোনা গেছে, কৃষিপ্রসারের উদ্দেশ্যে যে-অর্থানুকূল্য করা হয়েছে, তা কতিপয় মহাজনের হাতে গিয়ে পড়েছে।

এবং তাঁরা কৃষিকার্যে সে-অঙ্ক ব্যয় না-ক'রে হয় সুদে খাটাচ্ছেন, নয় মজুতদারিতে নিয়োগ করছেন। শাদামাঠা হিশেব-নিকেশ থেকে মনে হয়, কৃষিক্ষেত্রে ধনবণ্টনের অসাম্য, গত দশ বারো বছরে, পরিকল্পনার নানা উদাত্ত বিঘোষণা সত্ত্বেও, আসলে বৃদ্ধিই পেয়েছে। আমাদের দেশের অন্তত এক-চতুর্থাংশ কৃষিজীবীর কোনো চাষের জমি নেই, আরেক চতুর্থাংশের জমির পরিমাণ গড়প্রতি চার-পাঁচ বিঘের বেশি নয়, অন্য পক্ষে নানা ভূমিসংস্কার আইনের পরেও, পুরো কৃষিভূমির অর্ধেকেরও বেশি উচ্চবিত্ত চাষীদের অধিকারে : এঁরা সংখ্যায় সমগ্র কৃষককুলের মাত্র এক-দশমাংশ। সরকারি প্রসাদে সবচেয়ে সুবিধে হচ্ছে এই শাঁসালো মহাজন চাষীদেরই। সাধারণ মজুরচাষী অথবা ভাগ-চাষীদের মনে হতাশা এবং অনীহা উদ্রিক্ত হবেই। খাটবার বেলায় আমরা, কিন্তু লাভের বেলায় মহাজন, সুযোগ-সুবিধে ভোগ করবার বেলায় মহাজন এরকম তিক্ততা একবার মনে প্রবেশ করলে উৎপাদনবৃদ্ধির মহান্ ব্রতে শ্রমজীবী-কৃষকশ্রেণীর সায়-সমর্থন পাওয়া সম্ভব নয়। শাঁসালো মহাজন হ'লেই কেউ যে কৃষিকর্মে সুনিপুণ হবেন এমন নয়, তাই এ-রকমও হয়েছে যে, মূল্যবান রাসায়নিক সার যে-জমিতে ঢালা দরকার সেখানে পৌঁছয়নি, কালো-বাজারে ঘুরে-ফিরে কোনো অপাত্রের হাতে গিয়ে ঠেকেছে, ভুল জমিতে অপব্যয়িত হয়েছে।

পণ্যমূল্য বেঁধে দিয়ে সরকার কৃষিজীবীদের ত্রাণ করার যে-প্রয়াস ক'রে থাকেন, উচ্চবিত্ত চাষীদের লাভের বহর তাতে অবশ্যই বেড়ে যায়, কিন্তু মজুরচাষীদের বরঞ্চ ক্ষতিই হয় বেশি। মজুরচাষীরা, এবং এমন কি ভাগচাষীরাও, কখনো-কখনো মহাজনদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য কিনতে বাধ্য হন : শস্যের মূল্য উর্ধ্বমান হ'লে যে-বাড়তি লাভ হয়, তার ছিটেফোঁটাও তাঁদের ভাগ্যে জোটে না, কিন্তু অন্য দিকে খিদের খাবারটুকু চড়া দাম দিয়েই কিনতে হয়।

অধিকাংশ কৃষকের অভাব-অসন্তোষের ভিত্তিতে নতুন পৃথিবী গড়া সম্ভব নয়, উৎপাদনে উদ্দাম বন্যার ঢল এ-অবস্থায় নামবার নয়।

গণতন্ত্রের ছায়ায় যে-মস্ত পরীক্ষা আমাদের দেশে চলছে তাকে সফল করতে হ'লে তাই বিনম্রচিত্তে কৃষিসমস্যার উৎসানুসন্ধানে যেতে হবে, নিরপেক্ষ তুলাদণ্ড নিয়ে বিচার ক'রে দেখতে হবে কোথায় স্খলন-পতন ঘটেছে, কোথায় কোন ধরনের উন্নতি সম্ভব। আমরা সর্বজ্ঞ নই, আমাদের ভুল হ'তে পারে, ভুল না-শোধরালে এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, এক দিকে প্রয়োজন এরূপ স্বীকৃতির; অন্য দিকে, যাকে দেখতে পারি না তার আপাতবাঁকা চলনেও কী জানি হয়তো কোনো অপরূপ মাধুরী লুকিয়ে থাকতে পারে, সে-রকম ঔদার্যেরও সমান প্রয়োজন। এই নির্দ্বিধা আত্মবিশ্লেষণের, এবং নির্মোহ পরানুশীলনের আরো বিলম্ব ঘটলে ঘোর অমঙ্গল: সত্যিই আমাদের হাতে সময় বেশি নেই।

১৯৬৪

চাল-গম পাওয়া যাচ্ছে না, বাজার থেকে চিনি-তেল-মাছও উধাও, সব মিলিয়ে মজুতদার-মুনাফাখোরদের মসৃণ পৌষমাস। বিগত তিন বছরে খাদ্যশস্যের সামগ্রিক উৎপাদন দেশে সামান্যতমও বাড়েনি, শিল্পের ক্ষেত্রেও যে-উচ্ছ্বলিত প্রগতির হার কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সোচ্চার গর্বে আমরা পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করেছি, তা ঢিমে হয়ে এসেছে। ঋণজর্জর ভারতবর্ষ, পরমুখাপেক্ষী হয়ে খিদের খাবার থেকে কাঁচামাল-যন্ত্রপাতি-অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত-কিছু সংগ্রহ করতে হচ্ছে। যদি হঠাৎ বিদেশীদের দাক্ষিণ্য বন্ধ হয়ে যায়, আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা ও সোনাদানা ঢেলে বড়ো জোর দু-মাসের আমদানির যোগান দিতে পারবো, তারপর ঘোর অন্ধকার।

কবিতার মতো শোনাবে, এবং এই অবস্থায় কবিতার প্রসঙ্গ সত্যিই ককশ, নইলে বলা চলতো ঝাঁকবাঁধা অন্ধকার আমাদের আকাশ ছেয়ে আসছে। আমাদের সংবিধানে সাম্যের অঙ্গীকার, আমাদের প্রতিনিধিসভায় একাধিকবার সমাজতন্ত্রের আদর্শের কথা বিঘোষিত হয়েছে, পর-পর প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভূমি-ব্যবস্থা আমূল সংসাধনের সংকল্প বহু বিভঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে; সেই সঙ্গে ধনবণ্টনের সৌষাম্যসাধনার্থ নানা নির্দেশের ইঙ্গিত ইতস্তত ছড়ানো। অথচ ১৯৫০-৫১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে, অধ্যবসায়ী হিশেব নিলে দেখা যাবে, পুঁজিপতিদের প্রাধান্য উৎকীর্ণতর হয়েছে, বণ্টনব্যবস্থার ঈষদসাম্য অব্যাহত, গ্রামাঞ্চলে অন্তত এক-চতুর্থাংশ কৃষিজীবীর এখনো চাষের জমি নেই, আরো এক-চতুর্থাংশের আবাদের জমির আয়তন গড়ে পাঁচ বিঘে কি তারো কম; অন্য পক্ষে একেবারে-মগডালে-বসা উচ্চবিত্ত ভূম্যধিকারীরা আগের মতোই গ্রামে-গ্রামে অর্ধেকেরও বেশি চাষের জমি দখল ক'রে ব'সে আছেন।

যে-চাষাদের জমি নেই, দিনমজুরি ক'রে কোনোক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়, একটা হিশেবে ধরা পড়েছে যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশেই গত দশ-বারো বছরে তাদের মজুরির হার হ্রাস পেয়েছে।

সমাজতন্ত্র প্রসারের একটি সূত্র, যা আমরা সবাই মেনে নিয়ে থাকি, ঋতু-অঋতু নির্বিশেষে মন্ত্রোচ্চারণের মতো আউড়ে থাকি, তা শিল্পব্যবস্থার উত্তরোত্তর অধিকতর জাতীয়করণ। বিশেষ ক'রে ভারি শিল্পের প্রসঙ্গে, সংবিধানে এ-বিষয়ে নির্ভুল নির্দেশ দেওয়া আছে, ১৯৪৮ এবং ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি 'প্রামাণ্য' বিবৃতিতে সেই নির্দেশের পুনর্ঘোষণা ছিল, কংগ্রেসের প্রস্তাবাদি না-হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু ঘোষণা এবং ঘটনার মধ্যে দুস্তর সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। ভারি শিল্পে রাষ্ট্রের আপাতপ্রভাব বেড়েছে সন্দেহ নেই, ইস্পাত-কয়লা-বিদ্যুৎ-যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উৎপাদনে সরকার অনেক দূর এগিয়েছেন, কিন্তু এই প্রগতিতে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার স্বাক্ষর সামান্যই। রাষ্ট্রের প্রসাদাশ্রয়ে বিদ্যুৎ, পরিবহন, সেচের জল, লোহা, কয়লার উৎপাদনে নিশ্চয় প্রচুর প্রসার ঘটেছে—ক্রমেই আরো ঘটবে—কিন্তু তাতে শিল্পপতিদের লাভ বই ক্ষতি হয়নি। সমাজতন্ত্র নিছক কাঠামো গড়ার ব্যাপার নয়, আদর্শের ওঙ্কার ছাড়া সমাজতন্ত্র অসম্ভব। বিষয়ীকে বাদ দিয়ে বিষয়ান্বেষণ তেমন যুক্তিসহ নয়। আসলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির হাল ধ'রে আছেন যে-রাজপুরুষরা, সমাজতন্ত্রে তাঁদের আস্থা প্রায় শূন্য। জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়। আমাদের প্রধান রাজপুরুষরা সমাজের যে-স্তরের মানুষ, সমাজতন্ত্র সেখানে হয় মন্ত্রিমশাইয়ের খেয়াল, নয় জুজুবুড়ি। মনের দিক দিয়ে এঁরা অনেকেই সামন্ততান্ত্রিক, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পব্যবস্থা অতএব তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত ক্ষমতাবিস্তারের সুযোগস্তম্ভ; সমাজতন্ত্রের প্রস্তাব অবশ্যতই অতএব উহ্য। যেহেতু শিল্পপতিদের সঙ্গে এই শ্রেণীর রাজপুরুষদের অন্তরঙ্গ হৃদ্যসম্পর্ক, শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অধিকাংশ ব্যবসায়ী-পুঁজিপতির অসুবিধা তো হয়ইনি, বরঞ্চ রাজ-কর্মচারী-প্রসাদে পুষ্ট হয়ে তাঁরা আরো ঘন বিন্যাসে জাঁকিয়ে

বসেছেন। এ যেন প্লেটোর আদর্শে এক রিপাবলিক গঠন করছি আমরা। কোটি-কোটি সাধারণ লোক প্রতি বছর রাষ্ট্রের কাছে রাজস্ব অর্পণ করে, সেই রাজস্বের সাহায্যে যে-বিদ্যুৎশক্তির সৃষ্টি হয়, যে-সেচের জলের ব্যবস্থা হয়, যে-পরিবহনের উদ্যোগ হয়, যে-সারের উৎপাদন হয়, নামমাত্র মাশুলের বিনিময়ে সে-সমস্ত কিছুই স্বল্পসংখ্যক ভূম্যধিকারী-শিল্পপতির কাজে লাগছে, মুনাফার পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করছে। বিদেশী পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ ক'রে সরকার শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের অপরিমেয় লাভের সুযোগ ক'রে দিয়েছেন। অন্য পক্ষে, প্রধানত ধনবণ্টনে অতিবিকৃতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে যে-নিয়ম করা হয়েছিল, নতুন শিল্প চালু, আর পুরোনো শিল্প সম্প্রসারণ, উভয় ক্ষেত্রেই সরকারি অনুমোদন প্রয়োজন, তা-ও দণ্ডাধিকারদের শ্রেণীগত পক্ষপাতের ফলে বিপরীত উদ্দেশ্যই সাধন ক'রে আসছে। বৈদেশিক মুদ্রাবিতরণের কাঠামো মারফত আরো এক-দফা সমাজ-তন্ত্রের কণ্ডুয়ন ঘটছে।

উপরের সালতামামি অনেকের কাছে কাতর প্রলাপোক্তির মতো শোনাতে পারে। কিন্তু মনে হয়, এই বছর বিশেষ ক'রে, আর্থিক পরিকল্পনার ফলাফলের হিশেব করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুতে আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক ধরনের পরিবর্তন ঘটবে। আপাতত কিছুটা সময় এক অদ্ভুত অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা স্থিত থাকবো। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দীর্ঘ সতেরো বছর আমাদের মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। রাজভক্ত, গুরুভক্ত জাতি আমরা: শুনতে ভালো না-শোনালেও বলতেই হয়, যেখানে শতকরা পঁচাত্তরজন লোক এখনো নিরক্ষর, শ্রেণীচেতনা-শ্রেণীস্বার্থ-শ্রেণীদ্বন্দ্ব ইত্যাদির প্রভাব সেখানে তেমন-কিছু নিবিড় হ'তে পারে না। শ্রেণীচেতনা ছাপিয়ে ভারতবর্ষে তাই গুরুভক্তির উল্লাস, দৈনন্দিন গ্লানিকে পাশে ফেলে—সেই গ্লানিকে ভোলবার প্রেরণায়ই হয়তো—রূপকথা শোনার জন্য অতি-অধীর আগ্রহ। শাদামাটা ভাষায় যাঁকে 'রাজামানুষ' হিশেবে অভিহিত করা চলে, পণ্ডিত নেহরু দেশের

অধিকাংশ লোকের কাছে ঠিক তা-ই ছিলেন, এবং সতেরো বছরের এই অন্তর্লীন সময়ে, ঔজ্জ্বল্যে-বৈভবে-জ্যোতিতে-জাদুতে তাঁর কাছাকাছি আসতে পারেন, এমন আর-একজনও কেউ ছিলেন না। সুতরাং আমাদের অনেকেরই পক্ষে পণ্ডিত নেহরুর দুই অভিব্যক্তির বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ কঠিন হয়ে পড়ে। প্রায় সব সময়েই রূপকথার ধারক, সেই জন্য ঔদার্যের বাহক, জাতীয় সংকটত্রাতা জবাহরলালের অভিভাব আমাদের সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন ক'রে থাকে, যে-জবাহরলাল সতেরো বছর ধ'রে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আর্থিক পরিকল্পনার সাফল্য-অসাফল্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সমাজতন্ত্রের আকাশকুসুম বাস্তবে রূপান্তর করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর প্রসঙ্গে কদাচিৎ পৌঁছই।

কিন্তু ঘটনাপরম্পরার ধারা বুঝতে হ'লে বিগত সতেরো বছরের ইতিবৃত্তকে পাশ-কাটানো মূঢ়তা হবে: পণ্ডিত নেহরু কী ভেবেছিলেন—কী করতে চেয়েছিলেন—কী করতে পারেননি—কতটুকু করেছেন—যা করতে পারেননি কেন করতে পারেননি তা সবচেয়ে আগে বিচার করা দরকার। কিছুটা পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে, কিছুটা বর্তমান মূল্যবৃদ্ধিহেতু চঞ্চলতার আড়ালে দাঁড়িয়ে, ইদানীং অনেক ধনী শিল্পপতি এবং তাঁদের আজ্ঞাবাহী কতিপয় পণ্ডিতম্মন্য পরিকল্পনার কার্যসূচী, এবং সেই সঙ্গে বিশেষ ক'রে রাষ্ট্রের খাতে বিনিয়োগের মাত্রা, কমিয়ে আনার জন্য চিৎকার শুরু করেছেন, কয়েকজন রাজপুরুষও তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, শিক্ষা-বিদ্যুৎ-পরিবহন-পোতনির্মাণ-সেচের জলের ব্যবস্থাপনা, অর্থাৎ যে-যে ক্ষেত্রে লাভের বহর স্বল্পমাত্র, রাষ্ট্রশক্তির প্রসারে পুঁজি-পতিদের আদৌ আপত্তি নেই, কিন্তু যে-মুহূর্তে ভিত্তিমূলক বিনিয়োগ ছাড়িয়ে সরকার লাভ-প্রতুল কোনো উৎপাদনশিল্পে প্রবেশ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, পরিকল্পনার বিপক্ষে ব্যবসায়ীশ্রেণীর নানা যুক্তি-তর্ক তখনই একটু বেশি উচ্চনাদ হয়ে ওঠে। ১৯৫১ সাল থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত যে-নানা ধরনের বিনিয়োগের উদ্যোগ করা

হয়েছে, তাতে দেশের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি একটা দার্ঢ্যে পৌঁছেছে ; যদিও ভবিষ্যতেও প্রতিটি পরিকল্পনায় পরিবর্ধন-সংরক্ষণ-পরিবর্তনহেতু পর্যাপ্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে, তা হ'লেও মনে হয় রাষ্ট্রীয় খাতে বিনিয়োগের বিন্যাস এখন থেকে একটু নতুন ক'রে সাজানো সম্ভব : ইস্পাতে, সিমেণ্টে, কলকব্জা তৈরিতে, সারোৎপাদনে রাষ্ট্রকর্তৃক বিনিয়োগের আনুপাতিক মাত্রা বাড়িয়ে গেলে এমনকি উৎপাদনগত লাভের একটি মহদংশও বছরের পর-বছর পুনর্বার রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের প্রয়োজনে ব্যবহার করা চলে। রাষ্ট্রের কর্মসূচী সম্প্রসারণে তাঁদের নিজেদের লাভের পরিমাপ এবার থেকে ক'মে যাবার আশঙ্কা, এই প্রজ্ঞাপারমিতা থেকেই যে হঠাৎ ব্যবসায়ী-শিল্পপতি-ধনী জমিদার প্রভৃতিদের পরিকল্পনার ব্যয়সংকুচন ঘটাবার, এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ কমানোর আগ্রহ, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। ব্যয়বৃদ্ধিহেতু মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিশপত্রের দাম বাড়ছে, গরিবরা না-খেয়ে মারা যাচ্ছে, অতএব বিনিয়োগ কমাও : এমন উদারচরিত্রজনিত ব্যাকুলতায় এই শ্রেণীর লোকেরা অবশ্যই ভুগছেন না।

পুঁজিপতিরা অতীতে চেঁচামেচি করেছেন, এখন করছেন, ভবিষ্যতেও করবেন, সুতরাং নিজেদের লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে আমরা যদি কৃতনিশ্চয় থাকি, তাঁদের বক্তব্য নিয়ে তেমন মাথা না-ঘামালেও চলে। কিন্তু বিপদের সূত্রপাত ঘরের শত্রু বিভীষণদের কাছ থেকে। পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ পরিণতি এই মূল্যবৃদ্ধিতে, সুতরাং হঠকারিতা আর নয়, ভারি শিল্পে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ এবার বন্ধ করতে হবে, পরিকল্পনাকে ছোটো ক'রে আনতে হবে, পণ্ডিত নেহরুর আরব্ধ আকাশকুসুমচয়নে এবার যতি পড়ুক : এ-রকম উক্তি করতে শোনা যাচ্ছে সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষদের, সমাজতন্ত্র-গঠনের প্রকরণ-প্রকল্পের জন্য যাঁদের উপর আমরা নির্ভরশীল। সমাজতন্ত্রের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন এমন কোনো-কোনো রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে পর্যন্ত এই আতঙ্কধর্মে দীক্ষা নিতে দেখা যাচ্ছে আজকাল।

সতেরো বছরের প্রয়াসে কোথায় পৌঁছুলাম আমরা তা হ'লে ?

স্বাধীনতার প্রথম প্রহরেই পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেছিলেন, মাত্র দু-তিন বছরের তদ্গত চেষ্টার ফলে খাদ্যসমস্যা দূর হবে, আমরা খাদ্যশস্য রপ্তানি করতে শুরু করবো। অথচ আড়াইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরও আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি, মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ ১৯৪৭ সালের তুলনায় আদৌ বাড়েনি। অবশ্য বলা চলে সোভিয়েট ইউনিয়নেও বিপ্লবের পরবর্তী পনেরো বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ক'মে গিয়েছিল, সুতরাং আমাদের খুব-একটা উতলা হওয়ার হয়তো এখনো কারণ ঘটেনি কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে সোভিয়েট দেশে অন্তত-আর্থিক-প্রগতিতে-যাদের-আদৌ-বিশ্বাস-ছিল-না সেই কুলককুলকে কৃষিভূমি থেকে অপসারিত করা সম্ভব হয়েছিল, এবং শিল্পক্ষেত্রে শুধু যে কয়লা-ইস্পাত-বিদ্যুৎ-ভারি শিল্পের বিশ-পঁচিশ গুণ বৃদ্ধি ঘটেছিল তা-ই নয়, সমাজতন্ত্রের চিন্তা-আদর্শ-অনুভাবনার সঙ্গে চেতনার ওতপ্রোত সংমিশ্রণমণ্ডিত শত-সহস্র এক রাজকর্মচারী বাহিনী সংগঠিত হয়েছিল: পরের দুই দশকে এই রাজপুরুষরাই যুগপৎ আর্থিক প্রগতিকে দ্রুততর, এবং সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ়তর, করেছে।

পণ্ডিত নেহরু সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বহু জায়গায় বহু বিভঙ্গে নিজের স্বপ্ন-ইচ্ছা-বাসনা ব্যক্ত করেছেন, এবং অন্তত আদর্শের দিক থেকে সাম্যবাদী সমাজ তাঁর বিচারে সর্বোচ্চ স্থান পেতো তা জোর দিয়েই বলা চলে। নিজে শৌখিন বড়ো ঘরের মানুষ, এবং কংগ্রেসের ভিতরে সাম্যবাদী দল গড়ার সক্রিয় ভূমিকা তিনি কোনোদিনই নেননি, কিন্তু তা হ'লেও অগণিত সাম্যবাদে-আস্থাশীল রাজনৈতিক কর্মী তাঁর থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, উৎসাহ পেয়েছেন, কখনো-কখনো অর্থসাহায্য পর্যন্ত পেয়েছেন। আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট ক'রে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ নেই, কিন্তু বিকল্পভাষণে যে-সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রতিজ্ঞা সংবিধানে ঘোষিত, তা সমাজতন্ত্রের নিকট প্রতিচ্ছায়া। কংগ্রেসী শাসনের প্রথম পনেরো বছরে রাষ্ট্রচালনার বিভিন্ন ব্যাপারে কখনো-কখনো একটু-আধটু সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ছোঁয়া লেগেছে: এ-রকম আকস্মিকতা

কিয়দংশে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বপ্রসূত, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান ওজস জুগিয়েছেন পণ্ডিত নেহরু স্বয়ং। সর্দার বল্লভভাই পটেলের সমচিন্তাধর্মী কেউ গোড়া থেকে কংগ্রেসী শাসনের প্রথম পুরুষ হ'লে আজ যে-অবস্থায় আমরা পৌঁছেছি, তা হয়তো আরো দশ বছর আগে উপস্থিত হতো।

এ-সমস্ত কথাই বিনম্র চিত্তে মেনে নেওয়া ভালো, কিন্তু তা হ'লেও শেষ পর্যন্ত এটাও মানতে হয় পণ্ডিত নেহরুর সমাজতন্ত্রপ্রীতি আখেরে ভারতীয় জনসাধারণকে কোনো বৈষম্যবিদূরিত পারিজাতভূমিতে উত্তীর্ণ করতে পারেনি, ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আপাতত তমিস্রাচ্ছন্ন, এবং তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকেই এ-ধরনের পরিণতির আশঙ্কা স্পষ্ট হচ্ছিল। অন্তত ১৯৬০ সাল পর্যন্ত, পণ্ডিত নেহরুর সার্বভৌম সম্রাটপ্রতিম ক্ষমতা ছিল, অথচ এই ক্ষমতার অত্যন্ত সামান্যই সমাজতন্ত্রপ্রসারে নিয়োজিত হয়েছে। সন্দেহ না হয়েই পারে না, জবাহরলালজির কাছে সমাজতন্ত্র বরাবর সন্তর্পণে-তুলে-রাখা আদর্শের মতো হয়ে ছিল, জাতীয় জীবনে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করার প্রাকরণিক দিক সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা কোনোদিন ঘোচেনি। অথবা একটু সংশোধন ক'রে এটাও বলা চলে, হয়তো প্রকরণগুলির বিষয়ে তিনি জানতেন, কিন্তু লক্ষ্য, যা দূরের জিনিশ, আপাতত আমাকে-আপনাকে কুম্ভিপাকে জড়াচ্ছে না, তাতে আস্থা থাকলেও, লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য নিয়োজিতব্য প্রকরণে তাঁর বিন্দুমাত্র সায় ছিল না।

এখানে শ্রেণীবিভাজনের প্রসঙ্গে বাধ্য হয়ে আসতে হয়। আমার একটু আগের উক্তিতে ফিরছি, জবাহরলাল শৌখিন বড়ো ঘরের মানুষ। এক সঙ্গে অনেকগুলি গুণে তাঁর আজন্ম বিহার: চারিত্রিক ঔদার্য, সহচরবাৎসল্যবোধ, বিনয়সৌজন্যমমতা, নোংরামি-নীচুতা ইত্যাদি ঘোর অপছন্দ করা; অন্য পক্ষে আবার তেমনি আত্মীয়-পরিজন সম্পর্কে অন্ধ বিশ্বাস, কোনো সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে অনীহা, যে-কোনো সংঘাতের অদ্বান্দ্বিক সমাধান অন্বেষণ। মুশকিল

হলো সমাজতন্ত্র শৌখিন প্রকল্প নয়, শ্রেণীসমস্যাকে উহ্য রেখে সমাজ-তন্ত্র প্রবর্তন সম্ভব নয়। আমি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু স্থির করলাম ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র হবে, অতএব আমি ঢালাও হুকুম দিলাম, সঙ্গে-সঙ্গে আমার যারা রাজপুরুষ তারা সমস্ত ব্যবস্থাপনার ভার নিল, চোখের পলকে দেশে সাম্যের বন্যা বইলো, এমনধারা হবার নয়। দেশে শ্রেণীগত সাম্যসংগঠন তিতিক্ষার ব্যাপার, অনেক অধ্যবসায়, অনেক নির্দয় সংস্কার, অনেক সুচিন্তিত স্থাপত্য পেরিয়ে তবে সমাজতন্ত্র আনা সম্ভব। মনে হয় পণ্ডিত নেহরুর সেই হৃদয়-হীনতা ছিল না, সেই সহিষ্ণুতা ছিল না, সে-রকম কোনো চিন্তার প্রহার তাঁকে পীড়িত করেনি। সমাজতন্ত্রের প্রারম্ভপ্রতিজ্ঞা হিশেবে বহুবার বহু কথা বলেছেন, কিন্তু এক উক্তি থেকে আরেক উক্তির মধ্যে কোনো কীর্তির সেতু থাকেনি। সমস্তই ভাসা-ভাসা কবিতা থেকে গেছে, তাই রুপুলি রূপকথার বেশি কোথাও এগোয়নি। সমাজতন্ত্র আনতে হ'লে ধনী-স্বার্থে টান পড়বে, তারা বাধা দেবে, জোট বাঁধবে, একটা হামলা হবে, প্রতিনিয়ত এরকম হামলা হ'তে থাকবে, কিন্তু তাতে পিছ-পা হ'লে চলবে না, আত্মসমর্পণ মানে সমাজতন্ত্রের জলাঞ্জলি : মনে হয় না জবাহরলাল এ-সব বিষয় নিয়ে কোনো চিন্তাকর্ম-পরম্পরাসূত্রবদ্ধ প্রকরণ-প্রয়োগের কথা ভেবেছেন, এবং সেজন্যই, কার্যক্ষেত্রে যখনই সামান্য বাধা পেয়েছেন, প্রতিহত হয়ে ফিরেছেন, হয়তো তাঁর ভদ্রতায় বেধেছে, হয়তো তাঁর মনে হয়েছে সংঘাত অশালীন। ভূমিসংস্কারের নামে দেশ জুড়ে যে-বিরাট ভাঁওতা বছরেব-পর-বছর ধ'রে চ'লে এসেছে, কৃষির অগ্রগতিকে যা রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, বিশ্বাস করা শক্ত যে, পণ্ডিত নেহরু তার স্বরূপ চিনতে পারেননি। অথচ তদ্‌সত্ত্বেও এই ভাঁওতাকেই তিনি স্বীকার ক'রে গেছেন, কারণ অন্যথা দলগত অশান্তি, হামলা, মামলা, এ-প্রদেশে ও-প্রদেশে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিসংবাদে নবকল্লোল-সংযোজন, অনেক ধরনের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা। মনে-মনে হয়তো হিশেব কষেছেন, তার চেয়ে নিশ্চলতা ভালো, স্থবিরতা ভালো।

নিজে সমাজের যে-স্তর থেকে এসেছেন, তাঁর পাশে অবস্থিত রাজকর্মচারীরাও সেই স্তরেরই মানুষ। তাঁদের উপর অতএব প্রচুর আস্থা অর্পণ ক'রে গেছেন, ভেবে নিয়েছেন যে, তাঁর নিজের সমাজ-বোধ ও জীবনদর্শন এই রাজপুরুষদের উদ্‌বুদ্ধ করবে। কিন্তু আসলে তা হয়নি, হ'তে পারে না ব'লেই হয়নি। সব-কিছু ছাপিয়ে শ্রেণী-স্বার্থ, পণ্ডিত নেহরু সমাজতন্ত্রের উজ্জ্বল সৌধ-গড়ার দায়িত্বভার যাঁদের দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছেন, তাঁরা তার ছায়াশ্রয়ে সমাজতন্ত্রের অছিলায় চমৎকার-চমৎকার নিভৃত সুবেদারি স্থাপন ক'রে গেছেন, অথচ পণ্ডিত নেহরু নির্বাক থেকেছেন। ল্যাটিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশেই রাষ্ট্রক্ষমতা কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে বিগত কুড়ি বছরে হু-হু বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সমাজতন্ত্র তাতে পরাহত, কারণ রাষ্ট্র নিরালম্ব-বায়ুভূত-নিরাশ্রয় ব্যাপার, রাষ্ট্রকে উপলক্ষ ক'রে যে-তর্পণ, তা নিখুঁত বিভঙ্গে প্রতিনিয়ত কয়েকটি জঙ্গি ভদ্রলোক লুটে-পুটে খান। দেখে-শুনে মনে হয়, আমাদের সে-অবস্থায় পৌঁছুতে খুব বেশি বাকি নেই: সংবিধানে যা-ই লেখা থাক, রাজপুরুষদের শ্রেণীস্বার্থপ্রসারিত প্রসাদে শিল্পপতিব্যবসায়ীকুল নিজেদের সুখসম্পদ-ঐশ্বর্য গত দেড় শতকে বহুগুণ বাড়াতে পেরেছেন। প্রধান রাজপুরুষদের সঙ্গে প্রধান শিল্পপতিদের নিবিড়-হয়ে-আসা সখ্যের কথা পণ্ডিতজির অজানা ছিল না, এ-বিষয়ে অনেক ফিরিস্তি, অনেক তথ্য থেকে-থেকে পরিবেশিত হয়েছে, কিন্তু প্রতিবাদ জানাতে তাঁর হয়তো নম্রতায় বেধেছে, বিবেক মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও হয়তো জন্মগত সৌজন্যবোধ তাঁকে নীরব ক'রে দিয়েছে।

আর্থিক প্রগতির প্রাকরণিক দিক দিয়েও পণ্ডিত নেহরু ঠিক অনুরূপ দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। ভারতবর্ষ শিল্পায়িত হবে, শস্যশ্যামলা হবে, দেশের অগণিত জনসাধারণ বিদ্যায়-বুদ্ধিতে-প্রতি-ভার দীপ্তিতে পৃথিবীর অন্য-সবাইকে অতিক্রম করবে, বিজ্ঞানের জাদু আমাদের জীবনধারাকে সোনায় মুড়ে দেবে: তাঁর এবংবিধ স্বপ্ন-কামনায় সামান্যতম ফাঁক ছিল না—ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের স্বপ্ন বোনবার

মুহূর্তে অনেক সময়ই তাঁর ভাষণ সংগীতমূর্ছিত কবিতার রূপ নিয়েছে। কিন্তু, অকরুণ শোনালেও বলতেই হয়, আর্থিক প্রগতি সংসাধনে তাঁর দায়িত্বজ্ঞান তার বেশি বিশেষ এগোয়নি। আমৃত্যু জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদের সভাপতি থেকেও প্রায়ই তিনি পরিষদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তির্যক ব্যঙ্গ করতেন : যেন তাঁর নিজেব কোনো দায়িত্ব নেই, যেন তাঁর নিছক মুক্তপক্ষ উদাসীন পাখির ভূমিকা। এই উন্মার্গযাত্রার ফলাফল আপাতত ভোগ করছি আমরা, দেশবাসীরা। অধ্যাপক মহলানবিশ এবং অন্যান্য কয়েকজন বহু বছর ধ'রে চেষ্টা করেছেন প্রগতির প্রাকরণিক দিক নিয়ে চিন্তায়-আলোচনায় জবাহরলালজিকে আকৃষ্ট করবার জন্য, কিন্তু পাখি ধরা পড়েনি। সন্দেহ না হয়েই পারে না যে, পণ্ডিত নেহরু আর্থিক প্রগতির দুই মূল্যবান সূত্রের একটি শিখেছিলেন. অন্যটি শেষ পর্যন্ত তাঁর উপলব্ধির বাইরে ছিল। ইস্পাত-ভারি শিল্প-কলকব্জা তৈরি বাদ দিয়ে আমাদের মতো দরিদ্র. রপ্তানিরহিত দেশের দ্রুত প্রগতি সম্ভব নয়, এটা তিনি বেশ ভালো ক'রেই বুঝেছিলেন, এবং বিনিয়োগের বৃহদংশ যে ও-রকম কয়েকটি বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত করা প্রয়োজন তা মেনে নিতে তাঁর অস্বাচ্ছন্দ্য-বোধ হয়নি। কিন্তু বিনিয়োগের বিন্যাসে শিল্পাদির প্রাধান্য ঘটলে ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব নির্দেশ দেবে জাতীয় সঞ্চয়ের হার বাড়িয়ে-বাড়িয়ে যাওয়ার, অন্যথা ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে এক দিকে যেমন অসাম্যের সৃষ্টি হবে, অন্য দিকে তেমনি বিনিয়োগানুগ সঞ্চয়ের অভাব ঘটবে, সব-মিলিয়ে জাতীয় প্রগতির হার ব্যাহত হবে। এই দ্বিতীয় সূত্রটি হয় পণ্ডিত নেহরু আদৌ বুঝতে পারেননি, কিংবা পারলেও অবহেলাভরে পাশে সরিয়ে রেখেছেন।

কারণ স্পষ্ট। জাতীয় সঞ্চয়ের হার বাড়ানো মানেই তিতিক্ষা, কৃচ্ছ্রসাধনা, ভোগবিলাসের মাত্রা কমিয়ে সারল্যে ফেরা, নিরা-ভরণতায় পুনশ্চারণ। কে করবে এই কৃচ্ছ্রসাধনা? দেশের চাষী, মজুর, নিম্নবিত্তদের জীবনযাত্রার মান নামিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া নিরর্থক, কারণ তারা অধিকাংশই অনাহারের উপান্তে, তা ছাড়া

সমাজের উপরের ধাপ থেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন না-করলে সে-রকম নির্দেশদান অক্ষমার্হ ধৃষ্টতা। সুতরাং জাতীয় সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়াতে হ'লে অনুরোধ জানাতে হয় শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের কাছে, ধনী জমিদারের কাছে. অন্যান্য নানা উচ্চবিত্তদেব কাছে। কিন্তু এখানে হয়তো শ্রেণীচেতনার ছায়া পড়েছে, পণ্ডিত নেহরুর মন সরেনি ; নয়তো, অভিজাত পুরুষ জবাহরলাল, পূর্ব ইওরোপে সমাজতন্ত্র গঠনের অন্তর্লীন সময়ে, এবং চীন দেশে সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধিহেতু যে-ক্লিন্নতা-মলিনতা দেখেছেন, ভারতবর্ষে উপস্থিত মুহূর্তে তার প্রতিচ্ছায়া দেখতে চাননি, সুতরাং বিরত হয়েছেন।

কিন্তু যেহেতু ধনবিজ্ঞানের সূত্র মিথ্যে হবার নয়, জাতীয় সঞ্চয়ের ঢিমেতালে এগোনোর প্রতিফলে এখন অভিজ্ঞ হ'তে হচ্ছে সর্বস্তরের ভারতবাসীদের। বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ সঞ্চয়ের হার স্থাণু থেকেছে, এবং মধ্যবর্তী শূন্যতা পূরণ করার জন্য বিদেশী কুমিরকে খাল কেটে নিমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। পরিণামে সম্প্রতি আমাদের আত্মচলৎশক্তি প্রায় বিলুপ্ত ; বিদেশী প্রসাদে যাদের জীবননির্বাহ, তাদের বিবেক বিসর্জন দিতেই হয়, আজ না হোক আগামী কাল। পণ্ডিত নেহরুর কৃচ্ছ্রসাধনায় বীতরাগ, স্বীকার ক'রে নেওয়া ভালো, আমাদের দুর্বিষহতর অপর-এক গ্লানিতায় পৌঁছিয়েছে।

পণ্ডিতজির মৃত্যুর পর মাত্র কয়েকমাস গত হয়েছে। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এমন আমরা অনেকেই তাঁর কাছ থেকে প্রেরণার উৎস পেয়েছি, দিগ্‌নির্দেশ পেয়েছি। সুতরাং কারো-কারো কাছে উপরের বিশ্লেষণ একটু একপেশে এবং রুচিহীন ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু জাতির এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে উদ্যতখড়্গ সংকটমুহূর্তে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মোহমুক্তির। পণ্ডিত নেহরুর কাছ থেকে অনেক পেয়েছি, অনেক জেনেছি, কিন্তু যদি বাঁচতে চাই, এগোতে চাই, সাম্যসমৃদ্ধিঘেরা উজ্জ্বলকজ্জল কোনো সমাজব্যবস্থাকে ভারতবর্ষের মাটিতে সংস্থাপিত করতে চাই, তাহলে এই উপলব্ধি থেকে আমাদের শুরু করতে হবে যে, আজ আমরা প্রতিক্রিয়াজর্জর যে-নৈরাশ্যে কোণঠাসা, তার জন্য

ইতিহাসের বিচার অনেকাংশেই তাঁকে দায়ী করবে। দীর্ঘ সতেরো বছরের পরিসরে শুভ সুযোগ নষ্ট হয়েছে অনেক. কিন্তু তার চেয়েও যা বড়ো কথা, প্রগতিপক্ষের নিষ্ক্রিয়তার সুবিধা নিয়ে রাহুর দল নিজেদের পথ পরিষ্কার করেছে। পণ্ডিত নেহরু, সখেদেই বলছি, রাহুদের বাধা দিতে চাননি, বা পারেননি।

জবাহরলাল গত হয়েছেন, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে অবশ্যই শ্রদ্ধা নিবেদন করবো, তা আমাদের কর্তব্য, কিন্তু সেই সঙ্গে এই আপ্ত-বাক্যগুলি মনে রাখাও আমাদের কর্তব্য ; এগুলি ভুললে সর্বনাশ : কৃচ্ছ্রসাধনা ছাড়া আর্থিক প্রগতি অসম্ভব, দর্শনআদর্শরহিত আমলা-বাহিনীর উপর নির্ভর ক'রে সমাজতন্ত্রে পৌঁছনোর প্রস্তাব বাতুলের প্রলাপ, এবং, সব শেষে, ব্যক্তি যতই মহৎ হোন না কেন, শ্রেণীস্বার্থ অতিক্রম ক'রে যেতে কোথাও না কোথাও তাঁর অক্ষমতা প্রকট হবেই, কারণ জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়।

১৯৬৪

মনে হয় রূঢ় সালতামামির সময় এসেছে ; দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা পেরিয়ে, স্পষ্ট ক'রে প্রতিবাদ জানানোর সময়।

দ্বন্দ্ববোধ অবশ্য স্বাভাবিক। আমরা যারা সাম্যবাদে বিশ্বাস করি, আর্থিক পরিকল্পনায় প্রত্যয়শীল, বিশ্বাস করি শত শ্লথতা-দুর্বলতা সত্ত্বেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপূরণে প্রগতির জয়টীকা, অসাফল্যে প্রতিক্রিয়ার বিস্তার, বাধ্য হয়ে একটু সাবধানে আমাদের সন্দেহগুলি জানাতে হয়। শত্রুপক্ষের যুক্তির সহায়তা করবে এমন ইন্ধন জুগিয়ে কী লাভ, অতএব বরঞ্চ চুপ ক'রে থাকা যাক, চুলচেরা বিশ্লেষণের কী প্রয়োজন। মোটামুটি হিশেবে যদি দেখি এখানে-ওখানে এলোমেলো পদক্ষেপ হ'লেও, আর্থিক অগ্রগতি সংসাধিত হচ্ছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা যাক।

এই যুক্তিবোধের ফলে গত দশ বছরে পরিকল্পনার কাঠামো-প্রকরণ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তেমন-কোনো তন্নিষ্ঠ বিশ্লেষণ বামপন্থীমহলে হ'তে দেখিনি। মাঝে মাঝে, যেন পুরোনো অভ্যাসের তাগিদেই, মার্কিনিদের কাছে হাত পাতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে ; ব্যাংক এবং ফাটকাবাজারে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রসারের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে; চা-কফি-রবার কর্ষণে বিদেশী মূলধনের স্থিতির উপর শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে, করভারবৃদ্ধির জন্য সরকারকে গাল পাড়া হয়েছে ; কিন্তু এখানেই ইতি। কর্তব্য সংসাধিত হবার প্রচণ্ড তৃপ্তি নিয়ে সাম্যবাদীরা বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে থেকেছেন।

আমরা জটিলতায় প্রবেশ করিনি, শিশুসুলভ সারল্যে আস্থা রেখেছি। ফলে এ-পর্যন্ত খতিয়ে দেখিনি আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয়, সত্যি-সত্যিই দেশে তা ঘটেছে কিনা। কোথায় কতটা বিনিয়োগ উচিত তা নিয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করিনি।

করভারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি। কিন্তু পরিকল্পনার সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য ন্যূনতম কত রাজস্বের প্রয়োজন, নানা শ্রেণীর উপর এই অতিরিক্ত রাজস্বের ভার কী ভাবে বিকিরিত হ'লে ন্যায়মীমাংসা হয়, তা নিয়ে নীরব থেকেছি। সরকারি নিয়ন্ত্রণনীতিকে অন্ধ অনুভূতি দিয়ে সমর্থন ক'রে এসেছি, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশে আর্থিক অসাম্য বাড়ছে কি কমছে তা নিয়ে চিন্তা আদৌ করা হয়নি। শ্রীযুক্ত মহলানবিশ আজ যখন বলছেন গেলো দশ বছরে সরকারি নীতির ফলে ধনীদের পোয়াবারো হয়েছে, আমাদের পাটিগণিত তাই চট ক'রে মিলতে চাইছে না। কোথায় যে গোলমাল হলো তা নিয়ে আপাতত আমরা ভাবিত। বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো কর্তব্য। কিন্তু কোন্ খাতে কত বিনিয়োগ হ'লে জাতীয় প্রগতি মহত্তম-দ্রুততম হবে, বামপন্থী মহলে সে-বিষয়ে বিশেষ আলোচনা লক্ষ্য করা যায়নি। বুলিতে, প্রবচনে, ধুয়োতে বিশ্বাস ক'রে এতগুলি বছর কাটানো গেছে। দেশের প্রায় অন্য সকলের মতোই, আমরাও প্রায় ধ'রেই নিয়েছি যে নিছক বুলি আওড়ালেই লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব।

আর্থিক প্রগতির জন্য ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন, প্রয়োজন তিতিক্ষার, অধ্যবসায়ের, একনিষ্ঠ পরিশ্রমের। এ-ধরনের প্রাথমিক কাণ্ডজ্ঞান এখনো দেশের অধিকাংশ লোকের অভিজ্ঞতার বাইরে। সুতরাং সরকারপক্ষ যেমন ধ'রে নিয়েছেন যে, আর্থিক উন্নতি তৈরি জিনিশ, পাঁচ বছর বাদে-বাদে ছ'সাতশো পৃষ্ঠাব্যাপী ঘোষণা লিখলেই হলো, এবং যে-ই অসুবিধাজনিত চীৎকার করবে তাকেই সঙ্গে-সঙ্গে খুশি করতে হবে, তা হ'লেই হলো; সাম্যবাদীরা তেমনি ভেবেছেন পণ্ডিত নেহরুর আর-সবই ঠিক আছে, শুধু পাজি-পাজি মন্ত্রীগুলিকে দূর করতে পারলেই মোক্ষ হাতের মুঠোয়। তা ছাড়া তাঁরা অতি সহজেই গমকে ভুলেছেন। যেহেতু মোরারজি দেশাই এক কর বসিয়েছেন যা, অন্তত তিনি বলছেন, অতিরিক্ত লাভের উপর কামড় বসাবে, অতএব সেটা ভালো অন্য পক্ষে, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের প্রস্তাবটি আগা-পাশতলা অসাধু, কারণ দরিদ্রশ্রেণীর উপর আপাতবিচারে গুরুভার

পড়বে। এ-রকম ভাসা-ভাসা যুক্তির ভেলায় ভর দিয়ে আমরা শরৎকালের সকালে ধ'রে নিয়েছি পৌঁছে গেছি। মুশকিল হলো বর্ষার ক্লেদকর্দম-জড়ানো ঘনঘটার মধ্য দিয়ে না-গেলে শরতে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়, আমরা যেটাকে শরৎ ভাবছি আসলে তা তাই অলীক স্বপ্নবিলাস।

এখন আস্তে-আস্তে মোহভঙ্গ হচ্ছে কৃষিকর্ম এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে আছে, পনোরো বছরের আ—ালন সত্ত্বেও এখনো মার্কিনি শস্যে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হচ্ছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার বেড়েছে, জাতীয় সঞ্চয়ের হার বাড়ছে না। শিল্পনিয়োগে কয়েক বছর আগে যা-একটু আলোড়ন দেখা গিয়েছিল, তাও থিতিয়ে আসছে। বৈদেশিক মুদ্রার ডালি শূন্য, পরগলগ্রহ হয়ে আমাদের কলকব্জা-কাঁচামাল ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এবং সমস্ত-কিছু শ্লথ হয়ে আসছে : সেচের জলের জন্য খাল কাটানোই হোক কি নতুন বাঁধ তৈরিই হোক, কিংবা নতুন রেললাইন পাতা, অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ, অথবা চলাচলের সাঁকো-বাঁধা, কি নতুন সড়ক বানানো, সমস্ত-কিছু ঢিমেতেতালায়। ভূমিসংস্কারের নামে যে-সমস্ত আইন নানা প্রদেশে ফাঁদা হয়েছিল, সেগুলির আপাতত নামমাত্র ভূমিকা, জমিদারদের পোয়াবারো অবস্থা, গ্রামোন্নয়নের নামে সরকারি সাহায্যের নানা ফন্দিফিকিরে তাঁরা নিজেদের আরো ফাঁপিয়ে তুলেছেন। শহরেও তেমনি : দিল্লির কর্তাদের সঙ্গে যোগসাজসের ফলে, লাইসেন্সের গোলকধাঁধাকে কায়দা ক'রে নিয়ে এক সংকীর্ণ শ্রেণীর দালাল-মহাজন-ব্যবসায়ীরা ফুলে উঠেছেন। মন্ত্রীরা এদের করতলপদ্মগত, উঁচু ধাপের সরকারি চাকুরেরাও তাই। সুতরাং বারো-তেরো বছরের আর্থিক পরিকল্পনার সুযোগ নিয়ে যা গ'ড়ে তোলা হয়েছে তা প্রায়-নিখুঁত এক প্লেটোর রিপাবলিক।

দেশে অনাচার বেড়েছে, অসাম্য বেড়েছে, এক দল লোক হঠাৎ ফেঁপে কলাগাছ হয়েছে, অথচ সরকারের মুখে এখনো সাম্যের গান : এ-সমস্ত দেখে-শুনে দেশবাসীর মনে আর্থিক পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি

তথা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। অথচ যে-সব প্রতীপ জিনিশ ঘটছে, তা-যে পরিকল্পনার জন্য হচ্ছে না, পরিকল্পনার প্রয়োগ ব্যাহত হয়েছে ব'লেই হচ্ছে, তা স্পষ্ট বিশ্লেষণ ক'রে কোথাও বলা হচ্ছে না। অবস্থার সুযোগ নিয়ে দক্ষিণপন্থীরা যত দোষ নন্দ ঘোষের ঘাড়ে ফেলবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এবং সেজন্য বিশেষ ক'রে বামপন্থীদের কর্তব্য হওয়া উচিত পূর্ণিমানিশীথিনীসম নীরবতা পিছনে ফেলে রেখে সোচ্চার হবার।

প্রথমেই যা স্বীকার করা দরকার সেটা এই যে, রাষ্ট্রীয়করণ এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। রাষ্ট্রীয়করণের ফলে কোনো শিল্পের দায়িত্ব যে-উচ্চস্থিত রাজপুরুষের হাতে তুলে দেওয়া হলো, তিনি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, পুঁজিবাদীদের ঘনিষ্ঠ মাসতুতো ভাই। যত বেশি রাষ্ট্রীয়করণ, রাজপুরুষদের তত বেশি ক্ষমতাপ্রাপ্তি, পরোক্ষে পুঁজিবাদীদের তত বেশি সুবিধা। শিল্পপতিদের এইজন্য সুবিধা যে, যেহেতু শেষ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রচালিত শিল্পের ক্রয়-বিক্রয় তাঁদের সঙ্গে, বিনিময়ঘটিত লাভের বহরে কম পড়ার আশঙ্কা নেই, কারণ রাজপুরুষরা তাঁদের পক্ষে, মাসতুতো ভাই না-হ'লেও নিদেনপক্ষে বৈবাহিক।

সমাজচেতনার উদ্‌বোধন ছাড়া সমাজসংস্কার সম্ভব নয়, সাম্যবাদে যাঁদের বিশ্বাস নেই তাঁদের দিয়ে রাষ্ট্রীয় শিল্পকর্ম সংসাধনও তাই অসম্ভব ব্যাপার। এ-ধরনের লোকেরা রাষ্ট্রশিল্পের দায়িত্ব হাতে পেলে ভাবেন মালিকানা লাভ করেছেন। উদ্‌বৃত্তবৃদ্ধির দিকে তাঁদের লক্ষ্য থাকে না, উদ্‌বৃত্ত বাড়িয়ে আর্থিক প্রগতি ক্ষিপ্রতর করার প্রস্তাব তাঁদের কাছে অবাস্তব, হস্তগত ক্ষমতার সাহায্যে আত্মীয়-বন্ধু-পরিবারবর্গের কী-কী সুবিধা করা যায় তাই তাঁদের কর্তব্যের পরম অভিপ্রায় হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পভূমির আশ্রয়ে এবংবিধ সামন্ততন্ত্র অবশ্য ভারতবর্ষে প্রথম নয়: ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশেই, যথা মেক্সিকো, কিংবা চিলিতে, ঠিক এই ব্যাপার ঘটছে; সমাজতন্ত্রের নাম ক'রে রাষ্ট্রশক্তিকর্তৃক নতুন শিল্পব্যবস্থার পত্তন হয়েছে। সাধারণের

কাছ থেকে সমাজতন্ত্র সম্প্রসারণের অজুহাতে এক কাঁড়ি কর আদায় করা হচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেঁচে গণ্ডুষ। রাষ্ট্রশক্তি এ-অবস্থায় শিল্পপতিদের করতলগত হয়ে প্রজাশোষণের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমান্তরাল তামাশাও হামেশাই হচ্ছে: বামপন্থী সদস্যরা পার্লামেণ্টে সজোরে দাবি জানান, বিদেশী কোম্পানীগুলি যথাশীঘ্র দায়িত্বশীল বিভিন্ন কাজে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগ করুক, শতকরা নব্বুই না হ'লেও নিদেনপক্ষে আশি, শতকরা আশি না-হ'লে নিদেন-পক্ষে পঁচাত্তর। যেহেতু ভারতীয়করণ ও জাতীয়করণ এক জিনিশ নয়, শ্রেণীবৈষম্য এর ফলে কিন্তু একবিন্দুও হ্রাস পায় না, জাতীয় প্রগতি এক পা-ও এগোয় না। হয়তো, দার্শনিক-ঐতিহাসিক তত্ত্বের তর্কের দিক থেকে কারো-কারো ঈষৎ সুবিধা হয়, কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের কাঠামোতে সামান্য প্রকম্পনও দেখা দেয় না।

প্রশংসা করতে হয়, উদার কণ্ঠে, উন্মুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীযুক্ত কেশবদেব মালব্যকে। সমস্যার উৎকীর্ণ রূপটি তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন, তাই মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পেয়ে তিনি প্রথম থেকেই প্রয়াস করেছিলেন সমাজতত্ত্বে নিষ্ঠাশীল, অথচ কর্মপটু, এক কর্মচারীগোষ্ঠী গ'ড়ে তোলার দিকে। তৈল-ও-খনি দপ্তরে শ্রীযুক্ত মালব্যের অপসারণ সত্ত্বেও যে-তন্নিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ ও তদগতচিন্তা এখনো চোখে পড়ে, তা থেকে আশার উদ্রেক হয়: প্রকল্প খাঁটি হ'লে সিদ্ধান্তেও ঋজুতা আসতে বাধ্য।

অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় দপ্তরে ঢিমে তেতালায় কাজ চলে, যে-কর্তব্য দেড় বছরে সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল তার জন্য চার বছর লাগছে, নিম্নধাপের কর্মচারীদের মধ্যে প্রবল অনীহা: এ-সমস্তই অবশ্য ধ্রুব সত্য। এ-অবস্থায় রাষ্ট্রীয়করণের ফলে কোনো সংগঠন বা শিল্প-ব্যবস্থার সাফল্যসূচীর উন্নতির চেয়ে অবনতির আশঙ্কাই অধিক, ফলত সমাজতন্ত্রের অযথা অবমান কুড়োনো। আমরা কী করতে পারি তা হ'লে? নিম্নবেতনভোগী রাজপুরুষদের ঔদাসীন্য স্বাভাবিক:

তাঁরা পনেরো বছর আগে যে-সংকীর্ণ ভূমিতে কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করেছিলেন, এখনো সেখানেই অবস্থান করছেন। নাগরিক অসুবিধা-অস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, মুদ্রাস্ফীতিহেতু জীবনযাত্রার মান ক্রমশই নামছে, কারণ তুলনায় পারিশ্রমিকের হার উপরে উঠছে না। বাস-ব্যবস্থার দৈন্যদশা, করভার বেড়েই চলেছে ; অন্যদিকে কিছু অল্পসংখ্যক লোকের সরকারি ভেলায় চেপে উজ্জ্বল শস্যের স্বর্গে পৌঁছনো, এ-সমস্ত দেখে-শুনে কর্তব্যসম্পাদনে সাধারণ লোকের বীতরাগ আসা স্বাভাবিক।

এ-অবস্থায় এক ধরনের দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হ'তে হয় : ঘুণ ধরুক, এমনকি রাষ্ট্র-পরিচালিত সংগঠন-প্রতিষ্ঠানাদিতেও ধরুক, লোকে তিক্তবিরক্ত হোক, সব-মিলিয়ে আরো অসন্তোষ বাড়ুক : এবংবিধ ব্যবস্থা কিছুদিন ধ'রে চললে আমরা ক্রান্তির প্রান্তে উত্তীর্ণ হতে পারবো। বিপ্লবের পরে নতুন আয়োজন, নতুন সমারোহ ; নব-সজ্জায় নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্‌বোধন হবে এবং সবাই পরম পরিতুষ্টির সঙ্গে রাষ্ট্রের উৎকর্ষব্যাপ্তিতে নিজেদের ব্যাপৃত করবে, কারণ সে-নতুন সমাজে শোষণ থাকবে না, সুবিধাবাদীদের কোনো জায়গা থাকবে না।

অন্য পক্ষে, আরেক দল আদর্শবাদী বলবেন, প্রতিক্রিয়ার মুখ বন্ধ করতে হ'লে ক্রান্তিমুহূর্তের পূর্বেই আমাদের দেখতে হবে যাতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিচালনায় সুষ্ঠুতা আসে, রাষ্ট্রীয়করণের পর শিল্প সংগঠন-গুলিতে কর্মতৎপরতা আসে, আর্থিক পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপালনে সামান্য ব্যত্যয় যাতে না হয়, পরিকল্পনার সমস্ত খুঁটিনাটির সঙ্গে হয়তো বামপন্থী চিন্তার সাযুজ্য ঘটবে না, কিন্তু তা হ'লেও হাত গুটিয়ে থাকা চলবে না ; দক্ষিণপন্থী প্রচারের মুখ বন্ধ করতে হ'লে ছোটো-খাটো প্রশ্নগুলিকে চেপে গিয়ে কাজে নামতে হবে।

কোন্ যুক্তি ঠিক ? এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট না দেওয়ার চেষ্টা ক'রেও আপাতত বলা চলে যে, আমরা যদি পরিকল্পনার পক্ষে এই উপস্থিত মুহূর্তেই নিজেদের সক্রিয় সহযোগিতা ঘোষণা করতে চাই,

তা হ'লে বাড়তি করের প্রতিবাদ করা হয়তো আমাদের মুখে শোভা পাবে না, শ্রমমজুরি বৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত আন্দোলনও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অযৌক্তিক ঠেকবে।

এখানেই সমস্যা : বামপন্থী চিন্তায় এখনো গভীর অন্তর্বিরোধ, দুধ এবং তামাক দুইয়েতেই এখনো সমান আগ্রহ। অথচ একটু সাহস নিয়ে বিশ্লেষণে এগোলে কতগুলি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে আসে। করবৃদ্ধি সব ক্ষেত্রেই ক্ষতিজনক নয়, কিন্তু খতিয়ে দেখতে হবে যে-পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ প্রয়োজন, তার ন্যায়ানুগ বিকিরণের ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা : কত পরিমাণ কর শিল্পপতিদের উপর পড়েছে, কত পরিমাণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের উপর, কতটা মজুরদের উপর এবং গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের বরাদ্দে কত, গরীব চাষীর উপরেই বা কত। অন্য পক্ষে, সংগৃহীত রাজস্ব দিয়ে কী করা হচ্ছে তা-ও সমান ওজনের প্রশ্ন : যে-টাকা রাষ্ট্রের হাতে তার একটি বৃহদংশ যদি এমন খাতে ব্যয়িত হয় যার ফলে শ্রেণীগত বৈষম্য বাড়বার আশঙ্কা, ধনীদের পৌষ মাস, মজুরচাষীর সর্বনাশ, তাহ'লে প্রতিবাদ না জানানো নিশ্চয়ই মস্ত পাপ।

কারা কর দেবে, এবং করবৃদ্ধিহেতু নবসঞ্জাত রাজস্ব কী ভাবে বিভিন্ন খাতে নিয়োগ করলে মহত্তম প্রগতি সম্ভব, তা নিয়ে আজ পর্যন্ত বামপন্থী মহলে তেমন-কোনো গভীর আলোচনা লক্ষ্য করা যায়নি। কারা কর দেবে না তা নিয়ে উচ্চারণ শোনা গেছে, কিন্তু কেউই যদি কর না দেয় তা হ'লে পরিকল্পনার কী উপায় হবে সে-বিষয়ে মন্তব্য আজ পর্যন্ত অনুপস্থিত। আরো চরমতর দুর্ভাগ্যের, পরিকল্পনা পরিষদের নির্ধারিত ব্যয়বরাদ্দের বিকল্প, এবং উন্নত, কোনো বরাদ্দব্যবস্থা আদৌ সম্ভব কিনা তা নিয়ে কোনো তর্কতরঙ্গ কম্পন তোলেনি।

মনে হয় এই অজ্ঞতাবিহার ক্ষান্ত করার সময় এসেছে।

১৯৬৩

পরিকল্পনা : তমিস্রা

এটা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছর। ইতিমধ্যেই চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য আঁক কষা শুরু হয়ে গেছে। পরিকল্পনা পরিষদ থেকে গত অক্টোবর মাসে চতুর্থ পরিকল্পনার কাঠামো, বিনিয়োগের পরিমাণ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অগ্রগতির হার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা-জড়ানো একটি নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়; পরের মাসে জাতীয় উন্নয়ন সংসদ নিবন্ধটির মূল বক্তব্য অনুমোদন করেন। সুতরাং সরকারি-বেসরকারি খাতে কত বিনিয়োগ হবে, শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বহর কত, পরিবহন কৃষি-বিদ্যুৎ প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রেই বা কত, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি কতদূর গড়াবে, এ-সমস্ত সম্বন্ধেই মোটামুটি একটা ছক তৈরি হয়ে আছে।

আপাতবিচারে কারো-কারো মনে হ'তে পারে, যেখানে তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ দশ হাজার কোটি টাকার মতো ধরা হয়েছিল, সেখানে চতুর্থ পরিকল্পনায় একুশ-বাইশ হাজার কোটি টাকার কথা বলা হচ্ছে, সুতরাং সরকারকে সাধুবাদ, আমাদের উন্নতি ক্ষিপ্রতর হবেই। নানা ঝড়ঝাপ্টার মধ্য দিয়ে আমরা বিগত কয়েক বছর কাটিয়েছি, কিন্তু তা হ'লেও পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত অন্বীক্ষাকে আমরা নষ্ট হ'তে দিইনি, এবং এখনো দিচ্ছি না। আমরা বিনিয়োগের মাত্রা, যেমনটি হওয়া উচিত, ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছি। ভারি শিল্পের পত্তন হয়েছে দেশে গত ছ'সাত বছরে। চতুর্থ পরিকল্পনায় এবার তা হ'লে নানা ছাঁদের, নানা ধাঁচের যন্ত্রপাতি তৈরি শুরু হবে, অচিরে বৈদেশিক সাহায্যের উপর আমাদের নির্ভরের মাত্রা ক'মে আসবে, সেই সঙ্গে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে, তা ছাড়া যে ক'রেই হোক ফসলের পরিমাণ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাড়াতে হবে। সব দিক বিবেচনা ক'রে, এমন অনেকে আছেন বলবেন,

আশা রাখা ভালো : আমরা গত আঠারো বছরে অনেক দূর এগিয়েছি, এবং পরিকল্পনার উপলবেগ যদি বজায় রাখা যায়, আরো অনেক দূর আগামী ভবিষ্যতে এগোবো। তা হ'লে বিদেশীদের কাছে আর হাত পাততে হবে না। সমাজতন্ত্রের বিকাশও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে দাঁড়াবে।

এ-ধরনের গীতিকবিতায় আমার নিজের আস্থা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। আসলে দেশে যা ঘটে, পরিকল্পনা পরিষদের প্রাগুক্তির সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্যই তার থাকে না। তৃতীয় পরিকল্পনায় দশ হাজার কোটি টাকার যে-বিনিয়োগের হিশেব ধরা হয়েছিল, গত দু'বছরের মূল্যবৃদ্ধি, চীন-ঘটিত হামলা, ১৯৬৪ সালের খাদ্যসংকট, সব-মিলিয়ে তা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে বোঝা মুশকিল। সুতরাং পরিষদ থেকে নির্ধারিত নানা খাতে বিনিয়োগের অঙ্কগুলিকে একটি মোটামুটি আনুপাতিক মূল্যায়নের নিরিখরূপে ধরা যেতে পারে, তার বেশি কিছু নয়।

কেন এমন হয়? প্রথম কারণ আমাদের জাতীয়চরিত্রগত শিথিলতা। বিশেষ ক'রে সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, অর্থ বরাদ্দ হ'তে সময় লাগে, লোক জড়ো করতে সময় লাগে, তারপর হয়তো দেখা গেল ইঞ্জিনীয়ারিং ছক ঠিক নেই, কয়েক মাস বাদে আবিষ্কৃত হলো বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের জন্য যে-কথাবার্তা চলছিল, সেটা এক জায়গায় ঠেকে আছে। ভারি শিল্প, তৈলশোধন কারখানা, সারোৎপাদনের উদ্যোগ, সেচ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ সব-কিছুই শেষ পর্যন্ত তাই পিছিয়ে যায়; যা ১৯৬০ সালে কর্তব্য ছিল তা ১৯৬৫ সালে কোনোক্রমে সারা হয়।

কৃষির ক্ষেত্রে আমাদের রুদ্ধগতির কারণ অবশ্য আরো মৌলিক। দিল্লি থেকে উপদেশ বিতরণ ক'রে কৃষিকর্মে বিপ্লব আনা সম্ভব নয়। সাত লক্ষ গ্রামে উৎপাদনবৃদ্ধির বাণী বিস্তার করতে হ'লে সব চেয়ে আগে প্রয়োজন রাজনৈতিক সততার, আবেগ-নিরপেক্ষতার। কিন্তু সেচের জল হোক, কি সার হোক, কি সমবায় সমিতির পয়সা-কড়ি

হোক, সব-কিছুই যদি দলগত স্বার্থে নিয়োজিত হয়, গ্রামাঞ্চলের অর্ধেকের উপর লোক সে-অবস্থায় নিরুৎসাহ থেকে যেতে বাধ্য। অহরহ আজকাল হচ্ছে, যে-জমিতে সেচের দরকার নেই, তা বাড়তি জল পাচ্ছে, অন্য জমি উষর প'ড়ে থাকছে। সার ঢালা হচ্ছে এমন জমিতে যা শত চেষ্টাতেও শস্যবতী হবার নয়; অনেক ক্ষেত্রে আবার সেচের-সারের পারস্পরিক অনুপাত ঠিক থাকছে না। যিনি মহাজন তিনিই যদি সমবায় সমিতির সভাপতি হন, তার উপর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরোধা হয়ে বসেন, তা হ'লে তাঁর নজর একপেশে হ'তে বাধ্য। এই একচোখোমিকে উপর থেকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করা সম্ভব নয়: ও-রকম সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু হ'তে আরো বহুদিন লাগবে। আপাতত যা প্রয়োজন তা বোঝাপড়ার, পরস্পরকে-মেনে-নেওয়ার, সরকার থেকে নানাভাবে যা-যা সাহায্য পাওয়া যায় ন্যায্য উপায়ে নিজেদের মধ্যে বণ্টন ক'রে নেওয়ার। কিন্তু এ-ধরনের অসম্ভব সম্ভব করতে হ'লে প্রয়োজন উদার-চরিত নেতৃত্বের, যে-নেতৃত্বের গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, সব স্তরের কৃষিজীবীদেব সঙ্গে হার্দ্য বিনিময়ের সম্পর্ক আছে। সমাজসংসারে থাকতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ত্যাগের, ভবিষ্যতে পেতে হ'লে আপাতত কিছু ছাড়তে হবে এই অভিজ্ঞানের। মনে হয় না এবংবিধ মানসিক বিপ্লবের কাছাকাছিও আমরা এসে পৌঁছেছি: আমরা সবাই নিজেদের-নিজেদেব চিড়েগুড় গুছোতে ব্যস্ত, দেশের কী দশা হবে তা নিয়ে আর বৃথা মাথা ঘামানো কেন।

গালে হাজার চুনকালি মাখানো সত্ত্বেও আমাদের বক্তৃতায় বিরতি নেই নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোকেরা, তাঁদের লেজে-খেলানো রাজ-পুরুষরা, তারস্বরে এখনো চেঁচাচ্ছেন, হ্যাঁ, অবশ্যই ত্যাগ প্রয়োজন, সঞ্চয়ের হার আরো অনেক বাড়িয়ে যেতে হবে, নইলে তমিস্রা। এক হিশেবে কথাটায় ভুল নেই, আমাদের সঞ্চয়ের মাত্রা জাতীয় আয়ের শতকরা ছয়েতে এসে ঠেকে আছে। আমাদের ঢিলেঢালা ব্যবস্থা, এবং জনসংখ্যার ক্ষিপ্রতর বৃদ্ধির হার, দুটো মিলিয়ে বিচার

করলে এটা মানতেই হয়, জাতীয় বিনিয়োগের আরো সম্প্রসারণ আশু কর্তব্য। জাতীয় আয়ের শতকরা চার ভাগের মতো আপাতত আমরা বিদেশী সাহায্য থেকে পাচ্ছি, কিন্তু পৃথিবীর ঘটনাবলী পরিক্রমা ক'রে সন্দেহ না হয়েই পারে না, বিদেশীরা যে-কোনোদিন ক্ষান্ত দিতে পারে, তা হ'লে আমাদের অকূল পাথারে পড়তে হবে। সুতরাং জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু সবাই যদি ভোগ্যপণ্যে বিভোর, বেশি ক'রে ত্যাগ স্বীকার করবেন তা হ'লে কারা? যাঁরা যত বেশি ত্যাগের বক্তৃতা দিচ্ছেন, তাঁদের সংসারে তত বেশি বিলাসদ্রব্যের ছড়াছড়ি। এ-ধরনের অসাধুতার ভিত্তিতে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়।

এই বেশি-কথা-বলিয়েরাই সমাজতন্ত্রের কথাও মাঝে-মাঝে ব'লে থাকেন, পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দেশে যে-সাম্যের ঢল শিগ্‌গিরই নামাচ্ছেন তা নিয়ে অনেকধারা বাগাড়ম্বর। সংখ্যাতত্ত্বে অবশ্য ধরা পড়েছে গ্রামাঞ্চলে আয়-এবং-ঐশ্বর্য বণ্টনের অসাম্য গত পনেরো বছরে কমেনি; শিল্পের ক্ষেত্রে উচ্চাবচতা আরও প্রখর হয়েছে। কর্তাব্যক্তিরা এবং তাঁদের বশংবদ রাজপুরুষরা সব সময়েই যে ভেবে-চিন্তে মন আর মুখে বিভেদ করেন, তা নয়। কংগ্রেসের নেতৃগোষ্ঠী, অন্তত ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত, স্পষ্টই অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রসারে বিশ্বাস করতেন, এবং ভাসা-ভাসা সমাজতন্ত্রও তাঁদের প্রিয়-ভাজন ছিল। কিন্তু নতুন-নতুন শিল্পোদ্যোগ রাষ্ট্রের হাতে চ'লে এলে তাদের নিয়ন্ত্রণের কাজটা ছেড়ে দিতে হয় রাজকর্মচারীদের হাতে। এই রাজপুরুষরা কলকারখানা-রেল-খনি ইত্যাদি চালাচ্ছেন নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধিবিবেচনা অনুযায়ী, এবং সেখানেই গোল বাধে। তাঁরা কোনো সমাজতন্ত্রে দীক্ষা নেননি, স্রেফ চাকরি করছেন মাত্র। সুতরাং ক্ষমতা হাতে পেয়ে কেউ-কেউ মোগল বাদশাহ ব'নে যান, কেউ কেউ এত হীনমন্যতা থেকে ভোগেন যে পুঁজিপতিদের পন্থা নকল করতে থাকেন, নয়তো কাজকর্মে একেবারে এলিয়ে দেন। এবংবিধ অবস্থায় রাষ্ট্রের মর্যাদা বাড়ে না, বরঞ্চ সমাজতন্ত্রের কুখ্যাতি

বাড়ে। কোনো-কোনো রাজপুরুষ, এরই মধ্যে, অজ্ঞতাহেতুই বোধ হয়, উচ্চকুলের ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে দেন।

পণ্ডিত নেহরুর নির্দেশ-অনুযায়ী বছর পনেরো আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সাম্য প্রবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার হিশেবে নতুন শিল্পোদ্যোগের জন্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন এই রীতি প্রবর্তন করতে হবে ; যাঁরা ইতিমধ্যে অনেক গুছিয়ে নিয়েছেন কোনো বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে, সেই শিল্পে তাঁদের আর সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হবে না ; অন্যপক্ষে যাঁরা নবোদ্যোগী, তাঁদের লাইসেন্স, চাই কি অর্থ সাহায্য, দিয়ে উৎসাহিত করা হবে। এই ভাবে বড়োদের খর্ব করা হবে, এবং ছোটোদের বর্ধিষ্ণু হবার সুযোগ জুটবে। মুশকিল হলো, অখ্যাত-অজ্ঞাত একজনকে লাইসেন্স অর্পণ করা চলে, কিন্তু এই ভদ্রলোক যে সত্যি-সত্যি নতুন উদ্যোগ চালু করবেন, কিংবা করলেও করিতকর্মা হবেন, তার কোনো ভরসা নেই। অনেক সময়েই তাই এমন হয়েছে যে, পরিকল্পনার সূত্র-অনুযায়ী কোনো শিল্পে এক খুদে কি মাঝারি উদ্যোগী পুরুষকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, অথচ তিনি তা ব্যবহার করেননি ফলে পরিকল্পনার পাঁচ বছরের শেষে উৎপাদনের অঙ্কে বিরাট ঘাটতি থেকে গেছে। অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাই রাজপুরুষরা চেনা বামুনদের যজমানি করতে ডেকেছেন : বিড়লামশাই নিজে ফুলবেন, কিন্তু অন্তত প্রয়োজনীয় জিনিশপত্র নির্ধারিত হিশেবমাফিক তৈরি ক'রে দেবেন। আমদানি-লাইসেন্সের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার হচ্ছে : পুরোনো পাপীরাই শেষ পর্যন্ত লাইসেন্স পাচ্ছেন, এবং মুনাফায় ফুলে কলাগাছ হচ্ছেন। সমাজতন্ত্রে অতএব আপাতত ইস্তফা।

কারখানাশিল্পে অবশ্যই দেশে প্রচুর অগ্রগতি হয়েছে, শিল্পপতিদের লাভের হার বর্ধমান, উচ্চমধ্যবিত্ত এক শ্রেণী এই লাভের ছিটেফোঁটা সংগ্রহ ক'রে প্রফুল্লতার মধ্যে বিরাজ করছেন। যেহেতু আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা নেই এবং যেহেতু আমরা সবাই দেশী শিল্পের সম্প্রসারণে আগ্রহবান, সরকার বিনা অনুমোদনে যে-কোনো বৈদেশিক পণ্যের

আমদানি বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। শিল্পপতিদের সুতরাং পোয়াবারো; চাহিদা প্রবল, যে-কোনো জিনিশ যে-কোনো দামে বিকিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় সুষ্ঠুতার জন্য কোনো তাগিদ নেই, উৎপাদনের খরচে পরিমিতি আনারও প্রয়োজনবোধ নেই। সবাই জানেন সরকারের সাহস নেই যে, রাতারাতি লাইসেন্স প্রথা তুলে দেবেন, তা হ'লে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ। দেশে অবাধ আমদানি শুরু হ'লে আমাদের শিল্পোদ্যোগীরা মারা পড়বেন সেটা ঠিক, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি এবং আনুষঙ্গিক নানা ব্যাপার জড়িয়ে যে-নানা সমস্যা দেখা দেবে, সরকার তার টাল সামলাতে পারবেন না। অতএব সবাই নিশ্চিন্ত আছেন।

দশ বছর আগে পর্যন্ত আমরা স্বপ্ন দেখেছি, দেশে শিল্পের প্রসার হ'লে একদিকে আমাদের আমদানির বহর হ্রাস পাবে, অন্যদিকে কিছু-কিছু শিল্পপণ্য আমরা রপ্তানিও শুরু করতে পারবো, অতএব বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা ঘুচবে। কিন্তু আপাতত বহু বছর এই আশা স্থগিত রাখতে হবে। চট ক'রে কোনো পণ্যের কথাই মনে আনা যায় না, যা আমরা অনায়াসে বাইরে পাঠিয়ে লাভ করতে পারি: ভারি শিল্পের ক্ষেত্রেও যা, ভোগ্যপণ্যের বেলাতেও তা-ই। অতএব বিদেশী দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর ক'রেই আপাতত আমাদের দিনাতিপাত করতে হবে। নেতৃবৃন্দ এটা ভাল ক'রেই বোঝেন, এবং সেজন্যই আমাদের পররাষ্ট্র নীতিতে সম্প্রতি এত আশঙ্কার ছোঁওয়া।

কৃষিকে বাদ দিয়ে প্রগতি অসম্ভব, তা এক জায়গায় থমকে দাঁড়ানো। সমাজতন্ত্রের প্রস্তাব শিকেয় তোলা। রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়ার ফলে কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে মাখামাখি আছে এমন শিল্পপতিদেরই ঘোরতর সুবিধা। শিল্পের সর্বস্তরে এমন কি সাধারণ দক্ষতার পর্যন্ত অভাব। বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি অব্যাহত। প্রায়-সর্বস্তরের লোকের পরমুখাপেক্ষী আচরণ, সঞ্চয়ে অনীহা। ঠিক এই অবস্থায় গত দু'তিন বছর ধ'রে আমাদের প্রায় পাঁচশো কোটি টাকার মত অতিরিক্ত প্রতিরক্ষাভার বহন করতে হচ্ছে। যেখানে সম্বল সামান্য এবং তা

বাড়ানোর তাৎক্ষণিক কোনো পন্থা নেই, খরচের বহর বাড়লে অন্যত্র কোথাও টান পড়বেই। বর্তমানের মুহ্যমান বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আমরা খুব বেশিদিন যে এভাবে চালিয়ে যেতে পারবো মনে হয় না। যাঁরা প্রগতিবিরোধী, তাঁরা ইতিমধ্যেই চেঁচামেচি শুরু করেছেন যে শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার এখন থেকে নিজেকে সংকুচিত ক'রে নিয়ে আসুন; পরিকল্পনায় রাষ্ট্রের খাতে বিনিয়োগ কমানো হোক, বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের মাত্রা সম্প্রসারিত হোক। হয়তো এই চোখ-রাঙানিতে ভয় পেয়েই পরিকল্পনা পরিষদ চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়াতে ভোগপণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বেসরকারি খাতে সাড়ে ছ'শো কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছেন।

দেবতাদের তৃপ্তি সাধন হবে কি হবে না প্রত্যয় ক'রে বলা কঠিন: যাঁরা যত বেশি লাভ করেন, তাঁদের লাভের পিপসা তত বেশি বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রায়ই চোখে পড়ে। এই অবস্থায়, স্বীকার করছি, আমার মন ঘন তমিস্রাচ্ছন্ন থেকে যাচ্ছে। পরিকল্পনা আসবে, যাবে, আমাদের অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হবে ব'লে মনে হয় না। ধনবিজ্ঞানের বেসাতি ক'রে ব্যক্তিগতভাবে বর্তমানের নৈরাজ্য থেকে আমি নিজে কম লাভ করিনি, ভবিষ্যতে, মনে হয়, আরো করবো, তা হ'লেও এখন মনে হয় সমাজবিপ্লব বাদ দিয়ে এই দেশে প্রগতি অসম্ভব।

১৯৬৫

অপব্যবহারে এবং বহুব্যবহারে পুরোনো পরিচিত কথার অর্থ ক্রমশ ক্ষ'য়ে আসে। নেতৃস্থানীয়দের কল্যাণে জাতীয় সংকট কথাটিরও এই হাল হবার উপক্রম। ১৯৪৭ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত, প্রায় অহরহ, আমরা সংকটের শঙ্কাকাহিনী শুনে আসছি। পরিকল্পনার সংকট, প্রতিরক্ষার সংকট, খাদ্যসংকট, রাজ্যপুনর্গঠন-সংকট, কাশ্মীর-সমস্যাসংলগ্ন-সংকট, সংকটের আবর্তে আমাদের উথাল-পাথাল অবস্থা বেলায়-অবেলায় সংকটের উল্লেখ করা হয় দেশবাসীদের সুসংবদ্ধ ক'রে দৃঢ়চিত্তে কোনো সমাধানের দিকে এগোবার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু, এটা হয়তো জাতীয় চরিত্রগত স্খলন, না নেতাদের, না সাধারণ লোকের, উৎসাহ বা অধ্যবসায় খুব বেশিদিন টিঁকে থাকে। গোড়ার দিকে বাগবিভূতির অভাব হয় না, কিন্তু কয়েকটা দিন গড়িয়ে গেলেই, কথার সঙ্গে কাজের, বলনের সঙ্গে চলনের আদৌ সম্বন্ধ থাকে না। আমাদের সবাইকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে, সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে, দেশে যা খাদ্য আছে তা সমস্ত প্রদেশের মধ্যে সমভাবে বণ্টন ক'রে নিতে হবে, ইত্যাদি সব ভালো-ভালো কথা বছর ভ'রেই শোনা যায়। কিন্তু নেতারা যা বলেন, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তার কোনো স্বাক্ষর থাকে না। স্বভাবতই সাধারণ লোকের উৎসাহ উদ্দীপনাও ছু'দিনেই মিলিয়ে যায়। প্রারম্ভোক্তিতে আমাদের জীবনী-শক্তি ব্যয়িত; একমাত্র কথার নিষ্কাশনেই যেন কর্তব্যের কৈবল্যপ্রাপ্তি; তারপর যেন আর-কিছু করবার-ভাববার নেই, শুধুই স্থবিরতা। কয়েক বছর বাদে হয়তো নতুন এক 'সংকট' মাথা চাড়া দেবে, তখন ফের উত্তেজনা, পুরোনো বিভঙ্গে নতুন ক'রে আবার শব্দকল্পদ্রুমে আড়াল হওয়া।

এ-ধরনের শূন্যকুম্ভবৃত্তি সত্ত্বেও দেশ এতদিন অবিকল আছে কারণ দেশের সাধারণ লোক অসম্ভব ধৈর্যশীল। তা ছাড়া, পণ্ডিত নেহরুর ব্যক্তিত্বের জন্যই হোক, অথবা আমরা চল্লিশ-পঞ্চাশ কোটি লোক-ঠাসা একটি মস্ত শক্তিশালী জাতি, এই কিংবদন্তীর জন্যই হোক, বিদেশীরাও আমাদের সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখেছে, আমাদের নানা উপায়ে সাহায্য ক'রে কৃতকৃতার্থ বোধ ক'রে এসেছে। দেশের সর্বত্র ভ্রমণ ক'রে পণ্ডিত নেহরু জনসাধারণকে আশার বাণী শুনিয়েছেন, পরি-কল্পনার ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের আর্থিক অবস্থা কী রকম আশ্চর্য মোড় নেবে তা নিয়ে কাব্যরচনা করেছেন, দেহাতি লোকেরা চোখ গোল ক'রে তা শুনেছে, মেনে নিয়েছে। ব্যক্তিত্বে মস্ত জাদুর ছোঁয়া ছিল পণ্ডিত নেহরুর, যখন যা বলতেন, তন্মুহূর্তে লোকের মনে গভীর বিশ্বাস উদ্রেক করতো। আর্থিক উন্নতির হার তেমন-একটা উপলগতি নয়, কিন্তু আপাতত না-ই বা তা হলো; পণ্ডিতজি তো ব'লে দিয়েছেন, কয়েক বছর বাদে সম্পদ-স্বাচ্ছন্দ্য অসম্ভব বাড়বে, আপাতত অতএব, এসো, আমরা ধৈর্য ধ'রে থাকি। পণ্ডিতজিতে আস্থা রাখো, সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখছো না, ইতিমধ্যেই আমাদের রাজনৈতিক হাল কেমন বদলে গিয়েছে। কয়েক বছর আগেও ছিলাম নিচের দিকে মুখ-ফেরানো, পরাধীন জাতি, আর আজ চারদিকে আমাদের সম্মানঘোষণা, পররাষ্ট্রনীতির সৌকর্যে কোথায় উঠে গিয়েছি আমরা, ইংরেজ-মার্কিন-রুশ সবাই আমাদের ভয়ে থরহরিকম্প, সবাই আমাদের সাহায্য করতে উৎসুক, আমাদের জন্য এরা সর্বদা সব-কিছু প্রস্তুত ক'রে রাখছে।

নিজেদের সম্বন্ধে অবশ্যই আমরা মস্ত ধারণা পোষণ ক'রে আসছিলাম। এবং এটাও ঠিক, বিদেশীদের মধ্যে অনেকেরই আমাদের সম্বন্ধে ভয়ভীতিসন্ত্রাসের ভাব ছিল। তাই, যদিও আর্থিক অবস্থার তেমন দ্রুত উন্নতি ঘটছিল না, নানা ধরনের দৈনন্দিন কলহ জাতীয় জীবনে ছায়া ফেলছিল, এখানে ওখানে প্রায় প্রত্যহ ছোটোখাটো নতুন সমস্যা মাথা চাড়া দিচ্ছিল, অতি অবলীলাক্রমে আমরা সব-কিছু

তুচ্ছ ক'রে এতগুলি বছর কাটিয়েছি। নেতারা মাঝে-মাঝে সংকটের উপর বক্তৃতা দিয়েছেন, বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিজেরাই ক'দিন বাদে ভুলে গিয়েছেন। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি ব্যাহত থেকেছে, তা হ'লেও তেমন-একটা অসুবিধা হয়নি, কারণ বিদেশী সাহায্য প্রতিনিয়ত আভ্যন্তরীণ ঘাটতি পূরণ করেছে।

এই নির্ঝঞ্ঝাট অস্তিত্বে প্রথম চিড় ধরলো ১৯৬২ সালে। বিদেশীরা যে এতদিন আমাদের সম্ভ্রম দেখিয়ে আসছিল, স্বীকার ক'রে নেওয়া ভালো, সেটা, পণ্ডিত নেহরুর ভাবাদর্শের জন্য ততটা নয়, আমরা অতীব প্রতাপশালী জাতি, আমরা বিরক্ত হ'লে ওদের নিজেদেরই ক্ষতি হবার আশঙ্কা, এ-ধরনের ধারণা ছিল ব'লেই। চীনেদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আমরা মোটেই সুবিধে করতে পারিনি, আমাদের যতটা ক্ষমতাবান ভাবা গিয়েছিল আসলে মোটেই ততটা নই, এই খবর ছড়িয়ে পড়ার ফলে আমাদের সম্বন্ধে বিদেশে ভীতি-শ্রদ্ধার ভাব ভীষণ হ্রাস পেলো। আরো-একটা কথা। বিদেশের নানা সংবাদপত্র ঘাঁটলে বেশ বোঝা যায়, যে-কারণে চীনেদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ বাধলো, সেই সীমান্ত-বিরোধের ব্যাপারে বাইরের অনেকেই মানতে রাজি নয় যে, আমাদের যুক্তিতে শতকরা একশো ভাগ ন্যায়, চীনে-দের যুক্তিতে একশো ভাগ শূন্য। মোহমুক্তির এটাও একটা কারণ।

বাইরে আমাদের সম্মানহানির সঙ্গে-সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরেও ঋতুবদলের পালা। হঠাৎ প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয়ের বহর বছরে পাঁচশো কোটি টাকার মতো বেড়ে গেলো। কিন্তু, শত উদ্‌বোধন আহ্বান সত্ত্বেও, জাতীয় সঞ্চয়ের মাত্রা রাতারাতি ঊর্ধ্বগতি হবার নয়। তাই গত কয়েক বছর ধ'রে দেশের লোকের হাঁসফাঁস অবস্থা, সরকারি খাতে খরচ বেড়ে-বেড়েই চলেছে, আয় বা উৎপাদন তুলনায় বাড়েনি, জিনিশপত্রের দাম অতএব যে হু-হু হারে চড়বে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো হ'লেও তা সব খরচ মেটাবার পক্ষে প্রতুল নয়, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে বিদেশী উপকরণ-সরঞ্জামের চাহিদাও বিস্তৃত হয়েছে, সুতরাং ১৯৬৩ সাল থেকে আমাদের

পরমুখাপেক্ষা ভীষণ বেড়ে গিয়েছে। অদূর অতীতে আমরা যে বৈদেশিক সাহায্য পেতাম তা গ্রহণে গ্লানির ভাব মোটেই ছিল না, যাঁরা সাহায্য দিতেন তাঁরাও সমীহ ক'রেই দিতেন, অন্য পক্ষে, ইদানীং, যে-সাহায্য আসছে, তার সূত্রে কেমন এক অসম সম্পর্ক— দাতারা যেন দয়াপরবশ হয়ে দিচ্ছেন. এবং ভিখিরীর মন্যতা নিয়ে আমরা তা গ্রহণ করছি।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু তা হ'লেও আমরা কোনোক্রমে টিঁকে ছিলাম। অপরের সাহায্য যাচ্ঞা ক'রে দিনযাপন চলছিল, কিন্তু অন্তত আশা ছিল দেশের উৎপাদন ও সঞ্চয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেই এ-অবস্থার নিরসন ঘটবে ১৯৬৫ সালের ঘটনাবলী সমস্ত হিশেব তছনছ ক'রে দিয়েছে। তিন বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে লিপ্ত হলাম আমরা। পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষে যে-ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে তার সম্পূর্ণ সালতামামি সম্ভব নয়; কেউ বলেন ঐ এক মাসে তিন-চারশো কোটি টাকার মতো অস্ত্রসরঞ্জাম-ঘরবাড়ি-ফসল নষ্ট হয়েছে, কেউ বলেন আরো বেশি। তার চেয়েও যা মস্ত সমস্যা হয়ে দেখা দিল, পাকিস্তানের প্রতি আমাদের বিরূপভাব পশ্চিমের দেশগুলি মোটেই পছন্দ করে না, সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধবার সঙ্গে-সঙ্গে তারা সবাই আমাদের সাহায্য দান থেকে বিরত হলো। যা একবার বন্ধ হয়ে যায়, তাকে ফের চালু করতে বহু কাঠখড় প্রয়োজন। যুদ্ধ থামলো, তাসখন্দে সন্ধি স্থাপিত হলো, কিন্তু পশ্চিমের দেশগুলির অর্থভাণ্ডার আপাতত অনুন্মুক্তই রইলো।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এখন আর কোনো মোহ নেই, ইদানীং যে-সাহায্য আসছে তাতে সূক্ষ্ম হিশেবের অনুপাত তাই ক্রমশ বর্ধমান। যে-যুক্তির নির্ভরে গত দশ-বারো বছর ধ'রে পশ্চিমের দেশগুলি আমাদের ঋণ দিয়ে এসেছে তার মূল সূত্র হলো: ঋণদানের ফলে ভারতবর্ষে বিনিয়োগ বাড়বে. জাতীয় আয়ের প্রগতি ক্ষিপ্রতর হবে, সুতরাং অচিরে একদিন সঞ্চয়ক্ষমতাও বাড়বে, তখন বৈদেশিক সাহায্যেরও প্রয়োজন ফুরোবে। কিন্তু, বছরের পর বছর গড়িয়ে

গেছে, জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার এখনো সামান্য, এবং সঞ্চয়ের বহরও প্রায় পুরোনো বিন্দুতে স্থিত। মার্কিন সরকার এবং পশ্চিমের অন্যান্য দেশের কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, তাঁরা নিজেদের দেশের লোকদের উপর কর চাপিয়ে সেই সংগৃহীত অর্থ ভারতবর্ষে সাহায্য হিশেবে পাঠাচ্ছেন, কিন্তু এ তো কুবেরের ধন নয়, অনির্দিষ্ট কাল ধ'রে সাহায্য পাঠানো সম্ভব নয়। এত সাহায্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষ দ্রুত এগোতে পারছে না। তার মানে বিদেশ-থেকে-পাওয়া অর্থের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। মার্কিনিরা ভিয়েৎনাম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, যুদ্ধের গহ্বরে তাদের সামর্থ্যের একটা বিরাট অংশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের অন্যত্র অর্থনৈতিক সাহায্যের বহর এমনিতেই হ্রাস পাওয়ার দিকে। অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলি প্রধানত সাহায্যদান ক'রে থাকে মার্কিনি চাপে: দলপতির দাক্ষিণ্যে ভাঁটা পড়লে পশ্চিম জার্মানি বৃটেন ইত্যাদি দেশও হাত গুটিয়ে আনবে। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ যতই অবনতির দিকে যাচ্ছে, মার্কিনিদের পরমত-অসহিষ্ণুতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করবো, তারা অথচ আমাদের কথা শুনবে না, আমাদের পরামর্শ নেবে না, এটা কিছুতেই হ'তে দেওয়া চলে না: এরকম একটা জঙ্গি মনোভাব মার্কিন সরকার এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের আচারব্যবহারে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির গতিক্রম সম্বন্ধে পশ্চিমে একটা প্রচ্ছন্ন উষ্মার ভাব বহুদিন থেকেই জমা হচ্ছিল। আমাদের সংবিধানের সূত্র ধ'রে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মারফত কতগুলি বিশেষ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত রূপায়নের চেষ্টা চলেছে দেশে গত পনেরো বছরে। শুধু জাতীয় আয়ের সামগ্রিক উন্নতিই উদ্দেশ্য নয়, পরিকল্পনার সাহায্যে ধনবণ্টনের বৈষম্য কমাতে হবে, বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থার উচ্চাবচতা ঘোচাতে হবে, ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে আমাদের এগোতে হবে: এই সমস্ত শর্তই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গীকারভুক্ত ছিল। লক্ষ্যপূরণের জন্য আমরা তাই মৌলিক শিল্পের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর রাষ্ট্রীয়করণের সংকল্প গ্রহণ করেছি, কিছু-কিছু শিল্পে সরকারি খাতে

নতুন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করেছি। শিল্পের অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য বেঁধে দেওয়ার, এবং উৎপন্ন সামগ্রীর বণ্টন তত্ত্বাবধানের, ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মৌলিক জিনিশ বেচাকেনা থেকে কেউ অযৌক্তিক লাভ যাতে না করতে পারে, এবং ন্যায্য মূল্যে শিল্পজাত জিনিশ যাতে সকলের কাছে পৌঁছুতে পারে, তার জন্য এই ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের পূর্বসম্মতি ছাড়া কোথাও কোনো বৃহৎ শিল্প-উদ্যোগ করা যাবে না, এই অনুশাসনেরও একই উদ্দেশ্য।

সংবিধাননির্দিষ্ট নীতিপালনে অনেক স্খলন-বিচ্যুতি দেখা দিচ্ছে, বণ্টনের অসাম্য ঘুচছে না, সমাজতন্ত্র পরাহত থাকছে, আমাদের অনেকেরই মনে এরকম সংশয় পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। কিন্তু বিদেশীদের আপত্তি সম্পূর্ণ আলাদা। পশ্চিমের বন্ধুদের বক্তব্য, নিয়মের নিগড়ে আমাদের দেশের ধনব্যবস্থা বাঁধা পড়েছে, চাহিদার ইশারায় সাড়া দিয়ে যে-ধরনের সচ্ছল উন্নতি অন্যত্র সম্ভব হয়েছে তা ভারতবর্ষে অসম্ভব, যে-যে জিনিশের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে—সিমেণ্ট, কয়লা, কাগজ বা অন্য-কিছু—লাভের সম্ভাবনা সেখানে কম, সুতরাং নতুন বিনিয়োগ হয়নি, উৎপাদনে ভাঁটা পড়েছে, দাম চড়া থেকেছে, প্রাথমিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। যাদের বিনিয়োগ করার মতো টাকা আছে, তাঁরা সেই টাকা অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় শিল্পে খাটিয়েছেন, প্রচুর লাভ করেছেন, সুতরাং বড়োলোকদের বেশি বড়োলোক হ'তে না-দেওয়ার সংকল্পও ব্যাহত হয়েছে। সীমিত চাহিদার সঙ্গে সূত্রগত উৎপাদনক্ষমতা চার কি আরো বেশি সংস্থার মধ্যে বণ্টন ক'রে দেওয়ার ফলে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনে সুষ্ঠুতা আসেনি, দাম বেশি থেকেছে। অনির্দিষ্ট দামে সার বিক্রি করবার অনুমতি না পাওয়ায় তেমন-কেউ উৎপাদন বাড়াবার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেননি, তাই কৃষির উন্নতিও এক জায়গায় থমকে থেমেছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন সরকারের সুদৃঢ় মত, দ্রুত আর্থিক প্রগতি ও সমাজতন্ত্র দুটো এক সঙ্গে সম্ভব নয়, একটা না-ছাড়লে অপর লক্ষ্যও আয়ত্তের বাইরে থাকবে। তাছাড়া, উৎপাদন না-

বাড়লে উৎপাদনের গড় ব্যয় কমবে না, সুতরাং দেশজ জিনিশ রপ্তানি করতে ভীষণ বেগ পেতে হবে, এবং বিদেশজাত জিনিশের আপেক্ষিক মূল্যহ্রস্বতার জন্য আমদানির চাপও অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রবল থেকে যাবে। এই অবস্থায় জাতীয় আয় ছাপিয়ে ব্যয় উপচে উঠবে, কোনোক্রমেই দেশ পরনির্ভরতা কাটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে না।

মৃদুমন্দস্বরে অনেক দিন ধ'রেই ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষ আমাদের সরকারকে অনুযোগ জানিয়ে আসছিলেন, নানাভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছিল আমূল অর্থনৈতিক সংস্কার সাধিত না হ'লে সাহায্যের পরিমাণ অটুট রাখা মুশকিল হয়ে পড়বে। কিন্তু প্রত্যক্ষ হুমকি দেওয়াটা নম্রতা-শিষ্টতায় বাধছিল। পাকিস্তানি যুদ্ধের সুযোগে যা প্রত্যক্ষভাবে করা সম্ভব হতো না, তা হাসিল করার তির্যক সুযোগ ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন সরকার হাতের মুঠোয় পেলেন। সে-সুযোগের তাঁরা সদ্‌ব্যবহার করলেন। খরচ বেড়েছে, যুদ্ধে ক্ষয় হয়েছে, বিদেশী পণ্যের অভাবে অনেক শিল্পে ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা, মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বাড়তে শুরু করেছে, অর্থব্যবস্থা এলিয়ে পড়ার উপক্রম। নেতারা কিছুদিন অবশ্য চেঁচালেন বিদেশী সাহায্য বাদ দিয়েই আমরা চলবো, স্বয়ম্ভরতায় দীক্ষা নেবো, ব্যয় কমিয়ে আয়ের গণ্ডির মধ্যে এনে ফেলবো, নিজেরা না-খেয়ে না-প'রে রপ্তানির ব্যবস্থা করবো। কাজের বেলায় কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উৎসাহ কেমন মিইয়ে গেল। যে মুহূর্তে খবর বেরোলো যে, বোঝার উপর শাকের আঁটি, চলতি বছরে খাদ্যশস্য আগের বারের তুলনায় দেড় কোটি টনের মতো কম হবে, এবং মার্কিন দেশ থেকে খাদ্যভিক্ষা ছাড়া উপায়ান্তর নেই, যুক্তিতর্কের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল, স্বয়ম্ভরতায় যাঁরা ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা অনেকেই আপাতত ঘোর নাস্তিক ব'নে গেলেন। আসলে এঁরা কেউই ঝুঁকি নিতে রাজি নন। বিদেশী সাহায্য যথাসম্ভব কম গ্রহণ ক'রে নিজেদের সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করা সম্ভব,

এমনকি প্রতিরক্ষার দায় মেটানোও কষ্টকর নয়। কিন্তু এই দায়িত্ব পূর্ণ করতে হ'লে সমাজের কাঠামো, করনীতি, শিল্পব্যবস্থা, ভূমি-ব্যবস্থা অনেক-কিছুই বদলে নিতে হয়, জাতীয় আয়ের ভোগ্যাংশে কামড় বসাতে হয়, বিশেষ-এক সংগঠিত-সম্মিলিত জাতীয় আবেগ উদ্‌বোধন করতে হয়। মনে হয় সেই সাহস বা উৎসাহ মরুপথে হারিয়ে গেছে।

বাইরের চাপে তাই অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা প্রায় সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করেছি। পণ্ডিত নেহরু বেঁচে থাকলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্ভ্রমবশত বিদেশীরা হয়তো এতটা ছেঁকে ধরতেন না, কিংবা হয়তো আমাদের আত্মবিশ্বাসের ভাণ্ড এতটা শূন্যতায় গিয়ে ঠেকতো না, এবং, অন্তত আরো কিছুদিন হয়তো, চাপে প'ড়ে কাবু হ'তে আমরা অস্বীকার করতাম। কিন্তু ঋতুবদল হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ধৃতি অনেকটাই শিথিল হয়ে এসেছে গত এক বছর-দু-বছরে। রাজনীতির হাওয়া ঘুরে যাচ্ছে, কেন্দ্রের তুলনায় রাজ্য-সরকারগুলির ক্ষমতা এবং প্রতাপ বেড়ে চলেছে। অথচ দেশচালনার প্রধান দায়িত্বগুলি এখনো কেন্দ্রকেই নিতে হয়। উন্নয়ন-প্রকল্পের টাকা জোগাতে হয় কেন্দ্রকে, প্রতিরক্ষার রসদ সংগ্রহও কেন্দ্রের দায়িত্ব, প্রতি বছর রাজ্য সরকারগুলির গতানুগতিক অর্থাভাবও কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্ণ করতে হয়। যে-বস্তুর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, বৈদেশিক মুদ্রা, কেন্দ্রীয় সরকারকেই উদ্যোগী হয়ে তার ব্যবস্থা করতে হয়, অন্যথা সব-কিছু নিশ্চল হবার আশঙ্কা। খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, এবং লোকে না-খেয়ে মারা গেলে, প্রতিক্রিয়ার আগুনে পুড়ে ছারখার হবার আশঙ্কা সবচেয়ে আগে কেন্দ্রীয় সরকারের।

এতগুলি দায়িত্ব যেখানে, পর্যাপ্ত সংগতি না থাকলে বিপদের সম্ভাবনা। অন্ধ্র কিংবা মাদ্রাজের উদ্‌বৃত্ত চাল যদি রাজ্যসরকারদ্বয় কেরল বা বাংলা দেশের জন্য ছাড়তে রাজি না-হন, কেন্দ্রীয় সরকারকেই তা হ'লে উদ্যোগী হয়ে বাইরে থেকে আমদানির ব্যবস্থা করতে হয়। রাজ্য সরকারগুলি যদি পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ

করতে অস্বীকার করেন, তা হ'লে অঙ্ক পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বিদেশে যেতে হয়। খাদ্যশস্য-সংগ্রহ এবং রাজস্ব-সংগ্রহ, এই উভয়ান্বেষণে কেন্দ্রীয় সরকার গত কয়েক বছর প্রতি পদে রাজ্য সরকারের দ্বারা ব্যাহত হয়েছেন। দেশের ভিতর থেকে খাদ্য কিংবা কর সংগ্রহে অনেক রকম বাধাবিপত্তি, রাজনৈতিক কলহ-কলরোল ; কী দরকার তা হ'লে এই ঝামেলার মধ্যে গিয়ে ; তার চেয়ে বরঞ্চ বিদেশে এক মন্ত্রী ও দুই আমলাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক ; তাঁরা তিন সপ্তাহের মধ্যেই পর্যাপ্ত খাদ্য ও পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা ক'রে ফিরতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের চটাবার সাহস নতুন দিল্লিতে উপস্থিত কারো নেই ; ক্রীড়নকমন্যতার বশীভূত হয়ে পাথেয়-অন্বেষণের তাগিদে বিদেশী দাক্ষিণ্যের জন্য হেলে পড়া তাই প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যেতে চায়।

এই অবস্থার চক্রেই গত জুন মাসের মুদ্রামূল্যহ্রাস। প্রশাসনিক কাঠামোয় নানা খুঁত, জিনিশপত্রের দাম বেড়ে চলেছে, জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাবার মতো দুর্জয় সাহস সরকারের নেই। প্রতিরক্ষার ভার কমানো রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণে সম্ভব নয়। রাজ্য সরকারগুলির কাছে সাহায্যভিক্ষা করা বৃথা, তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক সমস্যাদিতে ডুবে আছেন। খাদ্যের বণ্টনব্যবস্থা সুষ্ঠু নয়, বিদেশী খাদ্যশস্য বন্ধ হয়ে গেলে যে-কোনোদিন এখানে-ওখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। কাঁচামালের অভাবে কলকারখানা বন্ধ হবার আশঙ্কা, সুতরাং অচিরে কিছু বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিদেশীরা সাহায্য না করলে, কী জানি, হয়তো সারের উৎপাদনও সংপ্রসারিত হবে না, কৃষিকর্ম পর্যন্ত যে-তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবে।

ভয়, আতঙ্ক, সেই সূত্র ধ'রে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ উভয়বিধ : আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা আমাদের 'আদর্শগত গোঁড়ামি' বিদেশীদের নির্দেশে ক্রমশ ঝেড়ে ফেলেছি। শিল্পক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আস্তে-আস্তে সরকার শিথিল ক'রে দিচ্ছেন, মৌল দ্রব্যাদির মূল্য

নির্ধারণের সূত্রটি সম্প্রতি অবহেলা করছেন, সারোৎপাদন এবং বণ্টনে বিদেশী সংস্থাগুলির জন্য নানা সুযোগসুবিধা ক'রে দিচ্ছেন, এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রস্তাবিত অঙ্ক আনুপাতিকভাবে সঙ্কুচিত করার কথা ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী যা-ই বলুন, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আদর্শের নিগড় হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে।

কিন্তু অল্পে সুখ নেই, আমাদের বিদেশী বন্ধুদের অনুরোধ-উপরোধের তালিকা উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক সংস্কারের অঙ্ক হিশেবে টাকার বহির্মূল্য হ্রাসের দাবি তীব্রতর ক'রে আনছিলেন। মুদ্রামূল্যহ্রাসের স্বপক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিগুলি গত তিন-চার বছর ধ'রে প্রকাশ্যে ও নেপথ্যে বহুবার বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং ভারত সরকারের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য বিদেশী সরকারের যুক্তি: ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে গত কয়েক বছরে অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, ফলে রপ্তানি ব্যাহত হয়েছে, এবং আমদানির চাহিদা বেড়েছে। আমদানির প্রয়োজন মেটাবার জন্য বৈদেশিক সাহায্য অবশ্যই আসছে, কিন্তু তাতেও সমস্যা ঘুচছে না, সরকার আমদানি-নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রচলন করতে বাধ্য হয়েছেন। এই প্রথায় গলদ অনেক: অকারণ দেরি ঘটছে, আমলাদের সিদ্ধান্ত-বিচারে অদ্ভুত-কিম্ভুত ভুল দেখা দিচ্ছে, নানা দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমদানি জোর ক'রে চেপে রাখার ফলে অবশ্য বহু নতুন শিল্পের উদ্গম হচ্ছে; যেহেতু দেশে চাহিদা অঢেল, যে-কোনো নতুন তৈরি জিনিশ প্রায় যে-কোনো দামে বিক্রি হচ্ছে, উৎপাদকের লাভও হচ্ছে প্রচুর। কিন্তু এভাবে বিনিয়োগশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ায় কোনো ক্ষেত্রেই উৎপাদনশৈলীতে সুষ্ঠুতা আসছে না, এরকম চলতে থাকলে তাই রপ্তানি বৃদ্ধির আশা পরাহত। বরাবরই বিশ্ব ব্যাঙ্কের মত, মুদ্রামূল্যহ্রাস পেলে আমদানির চাহিদা স্বতই কমে যাবে, সেদিকে সাশ্রয় হবে; অন্যদিকে রপ্তানি থেকে যেহেতু লাভের বহর সম্প্রসারিত হবে, পাট, চা, লোহা, কয়লা, কার্পাসবস্ত্র, তৈলশস্য কিংবা দেশে-হালে-তৈরি-শুরু-হওয়া যন্ত্রপাতি বা বৈদ্যুতিক অথবা রাসায়নিক সরঞ্জাম ইত্যাদি অনেক বেশি পরিমাণে

বিদেশে চালান হবে। যদিও শুরুতে বিদেশী পণ্যনির্ভর উৎপাদনজাত জিনিশপত্রের দাম বাড়বে, এই মূল্যবৃদ্ধি তেমন দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে না। রপ্তানি সম্প্রসারণের সঙ্গে-সঙ্গে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা একটু আল্‌গা ক'রে দিলেই জাতীয় উৎপাদনে প্রাচুর্যের জোয়ার আসবে, সুষ্ঠুতা আসবে, সেই সুষ্ঠুতা থেকে আরো বেশি রপ্তানি, যে-রপ্তানি থেকে আরো বেশি উৎপাদন। এমন ধাপে-ধাপে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই মূল্যমান স্থিতিশীল হবে।

যুক্তিগুলি পুরোনো, এবং ভারত সরকার এ-বছরের মে মাস পর্যন্ত এককাঁড়ি প্রতিযুক্তি নিয়ে লোকসমক্ষে হাজির হচ্ছিলেন। যেমন, মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে আমদানি কমবে এ-আশা অমূলক, কারণ আমরা ইতিমধ্যেই বৈদেশিক পণ্যের চাহিদা ন্যূনতম করে এনেছি, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে কোনো অদরকারি বিদেশী জিনিশই আসতে দেওয়া হয় না, সুতরাং আমদানি আরো কমাবার প্রশ্নই ওঠে না, সেটা চেষ্টা করলে ভীষণ দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেবে। রপ্তানি-বৃদ্ধির আশাপোষণও তেমন সমর্থনযোগ্য নয়, অন্তত ন'মাস-ছ'মাসের মধ্যে রপ্তানি বাড়বার কোনো সম্ভাবনাই নেই। যে-যে পণ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বের বাজারে তাঁদের কোনোটার উপরেই একচেটিয়া বাণিজ্যের আধিপত্য আমাদের নেই, সুতরাং মুদ্রামূল্যহ্রাস হ'লেও বৈদেশিক মুদ্রায় চটের কি চায়ের কি কার্পাসবস্ত্রের দাম পড়বে না; বড়ো জোর যা হ'তে পারে এসমস্ত জিনিশপত্র বিদেশের বাজারে বিক্রি করলে স্বদেশী মুদ্রায় আমাদের ব্যবসাদারদের লাভের পরিমাণ বাড়বে, সুতরাং তাঁরা বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহী হবেন। কিন্তু এখানেও সমস্যা থেকে যায়: আমরা বাড়তি উৎপাদনে সক্ষম হ'লেই বাড়তি রপ্তানি করতে পারবো। পাটের জন্য আমরা অনেকটাই নির্ভর করি পাকিস্তান ও শ্যামদেশের উপর; মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে বিদেশ-থেকে-আনা পাটের দাম বাড়বে, চটের উৎপাদন তাতে বরঞ্চ ব্যাহতই হবে। এমনকি কার্পাসবস্ত্র উৎপাদনের জন্য পর্যন্ত আমরা মিশর কি মার্কিনমুলুক থেকে উৎকৃষ্ট তুলো আমদানি করি, তারও তো দাম

বাড়বে। চায়ের ফলন এক নিমেষে বাড়নো সম্ভব নয় : প্রকৃতির করুণা থাকলেও, আজ যদি উৎপাদনবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, তা হ'লে চায়ের ফসল বাড়বে হয়তো তিন বছর বাদে। উৎপাদন, পরিবহন এবং পোতব্যবস্থার উন্নতি না ঘটলে লোহার রপ্তানি বাড়ানো অসম্ভব। তা ছাড়া, যতদিন কৃষির উন্নতি হচ্ছে না, দেশের তৈলবীজ বেশি ক'রে বিদেশে পাঠানোর যৌক্তিকতা নিয়ে মস্ত তর্ক বাধবে। আমাদের নতুন-তৈরি-করতে-শেখা যন্ত্রপাতি-বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক সরঞ্জামের দাম মুদ্রামূল্যহ্রাসে হয়তো বিদেশী মুদ্রায় কমবে, কিন্তু দাম যে-পরিমাণ কমালে বিদেশের বাজারে বিক্রি সম্ভব, তার জন্য হয়তো একটা বিষম হারে মুদ্রামূল্যহ্রাস প্রয়োজন, কিন্তু তা করতে গেলে আমাদের অন্য অযুত অসুবিধা।

এই ক'বছর তাই ভারত সরকার প্রাণপণে প্রতিবাদ ক'রে বলেছিলেন, মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে আমদানিও কমানো যাবে না, রপ্তানিও তেমন বাড়বে না, সুতরাং কেন। বিশেষ ক'রে, মুদ্রামূল্যহ্রাস ঘোষণার অব্যবহিত পরে একদফা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি অবধারিত। যদি উৎপাদন চট ক'রে না বাড়ে, তা হ'লে জিনিশপত্রের দাম পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আরো ঊর্ধ্বগতি হবে, এবং সাধারণ লোকের কষ্টের সীমা থাকবে না। আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অনেক দুর্বলতা, একবার দাম বাড়া শুরু হ'লে তা ঠেকিয়ে রাখতে সরকারের নাভিশ্বাস উঠবে। আরো-একটা সমস্যা আছে। মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে প্রতি বছর পূর্বকৃত বৈদেশিক ঋণের ফেরত কিস্তি ও সুদের হিশেব টাকার অঙ্কে অনেকটা বেড়ে যাবে ; আরো যা বাড়বে তা সরকারি খরচের বহর—কারণ সরকারি বিনিয়োগে বিদেশী পণ্যাদি দরকার, প্রতিরক্ষার জন্যও বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র প্লেন ইত্যাদি প্রয়োজন, নানা ইতস্তত ব্যয়ের ব্যাপার তো আছেই। অতএব সরকারি খরচ বাড়বে, এবং আয় ব্যয়ের হিশেব মেলাতে সরকারকে অতিরিক্ত রাজস্বের কথা ভাবতে হবে। যেখানে এমনিতেই জিনিশপত্রের দাম বেড়ে চলেছে, এবং দৈনন্দিন নানা অভাব-অভিযোগ, করবৃদ্ধির প্রস্তাবে লোকে মারমুখো হয়ে আসবে।

মুদ্রামূল্যহ্রাস প্রস্তাবের স্বপক্ষে-বিপক্ষে উত্থাপন করা এই যুক্তিগুলির সারসত্তা বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষের চাপ উদগ্র হবার আগেও যা ছিল, পরেও ঠিক তাই। এ-বছরের মে মাস পর্যন্ত ভারত সরকার যে-যুক্তিগুলি খণ্ডন করতেন, জুন মাস থেকে ঠিক সেগুলিই বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছেন, মেনে নিয়ে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরছেন। মুশকিল হলো মুদ্রামূল্যহ্রাসের মতো একটা ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা সম্ভব নয়। এমন বলা চলে না যে একদিন-দু'দিনের জন্য যাচাই ক'রে দেখবো টাকার বৈদেশিক মূল্য কমিয়ে দিলে দেশের লাভ হয় কি ক্ষতি হয়; লাভ হ'লে সিদ্ধান্ত অব্যাহত থাকবে, ক্ষতি হ'লে পুরোনো মূল্যমানে প্রত্যাবর্তন করবো। জুন মাসের ঘোষণার পর প্রায় তিন মাস হলো। দেখে শুনে মনে হয়, ভারত সরকারের প্রাক্তন আশঙ্কাই ঠিক, রপ্তানি তেমন বাড়বে না, এবং জিনিশপত্রের দাম ক্রমশই বেড়ে চলবে। সামান্য পরিমাণ রপ্তানি বাড়লে কাজ হবে না। যে-হারে টাকার বিদেশী মূল্য হ্রাস করা হয়েছে, তার আনুপাতিক হিশেবেও বেশি রপ্তানি না-হ'লে কোনো লাভ নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পুরোনো রপ্তানি অব্যাহত রাখার জন্যই এখন কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সরকার সাহায্য বিলোচ্ছেন। বিদেশজাত খাদ্যশস্য, কেরোসিন ইত্যাদি জিনিশের দাম বাড়লে সাধারণ লোকের অসম্ভব কষ্ট হবে, সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পুরোনো দামে এ-সমস্ত জিনিশ বণ্টন ক'রে ক্ষতির ভার বহন করবেন। কিন্তু সরকারি খাতে এই ক্ষতিপূরণের জন্য অতিরিক্ত রাজস্বের দরকার হবে। আর যা মস্ত ক্ষতি, চতুর্থ পরিকল্পনার পরিসর বাধ্য হয়েই এবার সংকুচিত ক'রে আনতে হয়েছে। দেখে-শুনে মনে হয় না সরকার মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারবেন, ফলে দ্রব্যমূল্য আরো বাড়বে। সব মিলিয়ে চারদিকে এক আর্তির অবস্থা।

এক হিশেবে অবশ্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের লোকেরা ঠিক কথা বলেছিলেন, এখন থেকে হয়তো আমাদের আমদানির বহর সত্যি-সত্যিই কমবে। কিন্তু তা কমবে যেহেতু বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পাবে,

মুদ্রামূল্যহ্রাসের সঙ্গে তার কোনো কার্যকারণ-সম্পর্ক নেই। এবং এখানেই ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের শোকান্তিক দিকটা প্রকাশ পাচ্ছে। সরকারের দুর্বল ভয়-খাওয়া অবস্থা। আতঙ্ক ছিল বিদেশীদের কথা মেনে টাকার মূল্য কমিয়ে না-দিলে হয়তো সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে, চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ অনারব্ধ থাকবে, কলকারখানা বন্ধ রাখতে হবে, জিনিশপত্রের দাম ভীষণ চড়বে। সুতরাং মূল্যহ্রাস ঘোষণা করা হলো, আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে আমূল রদবদলের সূত্রপাত করা হলো, কিন্তু আখেরে লাভ হলো না কিছুই। যদিও বিদেশীরা কৃপা ক'রে কিছু-কিছু পয়সাকড়ি ফের দিতে শুরু করেছেন, ১৯৬০-৬৪ সালের তুলনায় সাহায্যের অঙ্ক ভীষণ কম। এখন থেকে যা সাহায্য আসবে, আশঙ্কা হয় নির্দেশ দেওয়া থাকবে তার একটা বড়ো অংশ যেন ভোগ্যপণ্য-উৎপাদনের সম্প্রসারণে ব্যয় করা হয়। এই ব্যবস্থায় না-বাড়বে জাতীয় সঞ্চয়, না-বাড়বে আমাদের স্বয়ম্ভর-শীলতা, না-প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র।

স্বীকার ক'রে নেওয়া ভালো, আপাতত ঘোর অন্ধকার। মুদ্রামূল্যহ্রাস-সম্পর্কিত ঘটনাবলী থেকে একটা শিক্ষা স্পষ্ট হয়ে এসেছে, যদিও আমাদের নেতৃস্থানীয়রা তা মেনে না-ও নিতে পারেন। জাতির নিহিত সমস্যাগুলির কোনো ছুটকো-ছাটকা সমাধান সম্ভব নয়; সঞ্চয় বাড়াতে হ'লে দেশের লোককে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে যেতেই হবে, উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়াতে হ'লে আমাদের ক্রিয়াকর্মে সুষ্ঠুতা আনতেই হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকাদির কথা ভেবে যদি অপ্রিয় কর্তব্যপালনে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হই, যদি বিদেশীদের কাছে নীতিসমর্পণ ক'রে সস্তায় মুক্তির উপায় খুঁজি তা হ'লে জাতীয় উন্নতি পরাহত। আমাদের দায়ের ভার বাইরে থেকে কেউ বইতে আসবে না, যদিই বা আসে প্রতিদানে আমাদের আত্মাকে, চিন্তাকে, স্বাধীন সত্তাকে বিকিয়ে দিতে হবে।

२

কৌতুক করছি না, এটা সত্যি আমার আন্তরিক বিশ্বাস : আমাদের দুর্ভাগ্য, পৃথিবীর দুর্ভাগ্য যে *Das Kapital* জর্মন ভাষায় মার্কস্‌কে লিখতে হয়েছিল। জর্মন সংগীত এবং জর্মন ভাষার মধ্যে এক আশ্চর্য বৈষম্য। জর্মন সংগীতে যে-উত্থান-অবরোহণ-আলোড়ন-ব্যাপ্তি-গাম্ভীর্য-লালিত্য, তার তুলনা নেই : সংগীত অবলীলায় চপল হচ্ছে, গভীরে প্রবেশ করছে, ফিরে আসছে, কখনো উদাসীনতা, কখনো শান্তি, কখনো ঝড়, কখনো উদ্‌বেগ, কখনো কান্না, কখনো হিংসা, পরক্ষণেই হয়তো প্রেম-আনন্দ-উচ্ছলতার উপচে-ওঠা ঝলকানি। একসঙ্গে এতগুলি বিভঙ্গ : অথচ জট পাকিয়ে যায় না, এক অনুভাব থেকে অপর অনুভাবে প্রস্থানের পরিসরে কোনো আয়াসের চিহ্ন নেই, মনে হয় না যেন জোর ক'রে চলাচলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মীড়ের ব্যঞ্জনায় কোনো ফাঁকি নেই, কৃত্রিমতাও নেই।

জর্মন ভাষা অথচ আদপেই তা নয়। অলঙ্কারবহুল এই ভাষা, ব্যাকরণের অনুশাসনে সর্বদিকে বাঁধা, একমাত্র দুরূহতার দৌত্যই যেন এই ভাষাকে সাজে। তারল্যের কথা ছেড়েই দিলাম, এমন কি সারল্যও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জর্মনের মধ্যবর্তিতায় পরাহত। ভাষার এমনই জটিলতা, যে-কোনো চিন্তাভাবনাই তত্ত্ব-কথার কঠিন বর্ম প'রে তবে সভাস্থলে উপস্থিত হ'তে সফল হয়, তা আপাত-বিচারে যত সামান্য চিন্তাই হোক না কেন। আমার এই বক্তব্য গর্হিত ব'লে মনে হ'তে পারে, গ্যোয়টে-হেগেল-কাণ্টের সৃষ্টিকে নস্যাৎ করবার স্পর্ধা অক্ষমার্হ এমনতরো কথাবার্তাও অবশ্যই শুনতে হ'তে পারে। এই কবিমনীষীদের আমি অবহেলা করছি না : শুধু বলতে চাইছি, তাঁদেরও দুর্ভাগ্য, জর্মন ভাষার নিগড়ে তাঁদের প্রতিভার প্রকাশকে আবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। কারণ যা মহৎ, তা-ও জর্মন ভাষার

রুদ্ধশ্বাস গুহায় একটু হাঁপিয়ে ওঠে, অন্য-কোনো ভাষার—ফরাশি বা ইংরেজির—ঋজু, মুক্ত পরিবেশে তা সম্ভবত আরো বহুগুণ উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হ'তে পারতো। প্যাঁচানো, ঘোরানো, ঠোঁট-জিভ-ক্লান্ত-করা শব্দ-অক্ষর চক্রমণে জর্মন ভাষা বোধকে নিস্তেজ ক'রে আনে, খানিক দূর এগিয়ে প্রায়ই এটা মনে হয়, থাক, এবার থামি।

মার্কস্‌কে আজীবন এই ভাষার বোঝা বইতে হয়েছে। মাতৃভাষার পরিধি পেরিয়ে অন্য বৃত্তে আশ্রয় নেওয়ার মতো ঘটনা কদাচিৎই ঘটে, তা ছাড়া মার্কসের ক্ষেত্রে তার কোনো প্রশ্নই ছিল না। অবশ্যই তিনি বহুভাষী ছিলেন, কিন্তু শৈশব থেকে অধ্যয়ন-চিন্তা-অনুশীলনের একমাত্র না হ'লেও প্রধান বাহন ছিল জর্মন কান্ট-হেগেলে পাঠ নিয়েছেন এই ভাষায়, ইওরোপের নানা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিন্যাস বিবর্তনের বিবরণ জেনেছেন এই ভাষার সূত্রে, যুক্তি-তর্ক-মীমাংসার প্রকরণের উৎক্ষেপ কেমন হওয়া উচিত, তা-ও শিখেছেন জর্মন ভাষাশ্রয়ী আদর্শে। এবং, নিজের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা-দর্শন-ইতিহাসবিচার-সামাজিক-অভিজ্ঞান-ধনবিজ্ঞানসূত্র প্রকাশ করেছেন জর্মন ভাষায়। *Das Kapital*-এর মহীরুহ কীর্তি, গোথা কার্যক্রমের আলোচনা, এঙ্গেলস্‌ এবং আরো নানা অমুক-তমুককে লেখা চিঠিপত্র, কমিউনিস্ট ঘোষণাপত্র, সাংবাদিকতার এলোমেলো পাহাড়, সব-কিছুতেই জর্মন ভাষার হাঁসফাঁস বন্ধন।

মহৎ চিন্তা অবশ্য আধারের বাধার অপেক্ষা রাখে না, তা ফুঁড়ে বেরোয়, জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়, চারদিক উদ্ভাসিত করে। তা হ'লেও আমার আক্ষেপ থেকেই যায়। *Das Kapital*-কে উপলক্ষ ক'রেই বলি, বড়ো কষ্টকর এই বই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিটোল স্থৈর্য এবং অভিনিবেশ নিয়ে প'ড়ে ওঠা, থেকে-থেকে জিরোতে হয়, ভাষার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়, কী বলা হচ্ছে একপাতা-দেড়পাতা অন্তর-অন্তর ভালো ক'রে ভেবে সাজিয়ে নিতে হয়। কোনো-কোনো জায়গায় মনে হয়, একটু আগে যা বলা হয়েছে তার

সঙ্গে বুঝি সমানুকম্পা নেই ; যে-বিরাট কাঠামো মনে-মনে দাঁড় করিয়ে নিয়ে মার্কস্ ভাষ্য লিখতে বসেছিলেন, ভাষার কর্কশ ভূখণ্ডে দীর্ণ-লাঞ্ছিত হ'তে হ'তে তা গুলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। *Das Kapital* দুরূহ গ্রন্থ আসলে নয়, দুরূহ ক'রে লেখাও নয়, কিন্তু দুরূহ ভাষায় লেখা। অন্যথা আমাদের এত প্রতিহত হয়ে ফিরতে হতো না, মার্কস্ যা বলতে চেয়েছিলেন তা বোঝবার জন্য, এই একশো বছর বাদেও, টীকা থেকে টীকান্তরে প্রব্রজ্যার কোনো প্রয়োজনই থাকতো না, বরং এই গ্রন্থের প্রভাব আরো বহুগুণ উজ্জ্বলতা নিয়ে ব্যাপ্তি পেতো।

অনুবাদেও তেমন-কিছু সুরাহা হয় না। তথ্যকে আর এক ভাষায় স্বচ্ছন্দে হৃদয়ঙ্গম ক'রে নেওয়া চলে, কিন্তু, যেমন কবিতা আসে না, কল্পনার সূক্ষ্মতর কারুকর্মগুলি ধরা দেয় না, তত্ত্বও তেমনি প্রকাশের অপূর্ণতায় স্থিত থাকে। প্রত্যেক দর্শনেই একটা আন্বীক্ষিক অবয়ব থাকে, ভাষাসূত্রের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। আমরা বড়ো জোর তত্ত্বের সারাংশটুকু ছেকে নিয়ে অন্য ভাষায় পরিবেশন করতে পারি, কিন্তু মৌলিক ভাষ্যের সেই নিখাদ ভাস্কর্য ভাষান্তরে অধিকাংশ সময়েই অনুপস্থিত। কট্টর মার্কস্‌বাদীরা আমার এই অনার্য উক্তিতে কুপিত হবেন, কিন্তু অবয়বের আকর মানতেই হয়, এবং মানতে হয় সবচেয়ে বেশি মার্কসের নিজের রচনাবলীর প্রসঙ্গে।

এবংবিধ বাগাড়ম্বর *Das Kapital*-কে সম্মান জানাবার উপলক্ষ ব্যবহার ক'রে আমি করছি, কারণ, আমার সন্দেহ, অনুবাদে এবং অনুবাদের অনুবাদে, বইটির নিহিত ঐশ্বর্য ক্ষুণ্ণ থেকে ক্ষুণ্ণতর হয়েছে, অথচ আদিপাঠে সে-ঐশ্বর্য আহরণ করতে এগোলেও পদস্খলনের সম্ভাবনা প্রায় অপ্রতিরোধ্য। এখানেই অবাক হবার পালা। কারণ তা সত্ত্বেও, দেশ থেকে দেশান্তরে, মহাদেশ ছাপিয়ে অন্য মহাদেশে, দশকের পর দশক ধ'রে, অহরহ, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে, পণ্ডিত-শ্রমিক-নেতা-অধ্যাপক-কর্মী-শিল্পী-রাজনীতিজ্ঞ-ধনবিজ্ঞানী-সমাজতাত্ত্বিক-নৃতত্ত্ববিদ্-সাধারণ গৃহস্থ-কবি-শিল্পী-কৃষক-সংখ্যাতত্ত্ববিশারদ-

ঐতিহাসিক-ধর্মনায়ক কাতারে-কাতারে জড়ো হয়েছেন, এই বইয়ের ব্যাখ্যায়-বিশ্লেষণে-উপলব্ধিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন, নিজেদের ভাবনাব-কল্পনার অনুলেপে বইটি থেকে আপাত-জ্ঞানাহরণ ক'রে তৃপ্ত-কৃতার্থ বোধ করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এ-বই অনন্য।

না, ধর্মগ্রন্থের প্রসঙ্গও প্রক্ষিপ্ত, তুলনা চলে না। *Das Kapital*-এর পূর্ণতা-অখণ্ডতা-ব্যাপ্তি কোনো ধর্মগ্রন্থেই নেই। বেদ-উপনিষদে কবিতার গীতলতা আছে, সমাজসংস্থা নিয়ে চিন্তাও আছে, কোন্ উপলক্ষে গোমাংস ভক্ষণ শ্রেয়, সে-সম্বন্ধেও হয়তো নির্দেশ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন জ্ঞানের নির্ভরে কতদূর আর এগোনো যায়, অনেক-কিছু তো নেই, ধনবিজ্ঞানের এমন-কোনো নির্দেশ নেই যা আমরা, ঈষৎ পরিশীলন ক'রে নিয়েও, হালের পৃথিবীর সঙ্গে পারম্পর্য-সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি, এমন-কোনো আন্বীক্ষিক প্রজ্ঞাও নেই যাকে স্থান-কাল থেকে বিমূর্ত ক'রে নিয়ে সমকালীন প্রসঙ্গের বিশ্লেষণে নিযুক্ত করতে পারি। বাইবেল পর্যন্ত, তার বিরাট বিস্তার সত্ত্বেও, তুলনায় সংকীর্ণ; লোকগাথা প্রচুর, নানা অধ্যায়ে বিচ্ছুরিত দর্শনকণার অভাব নেই, কিন্তু ইতিহাস কীভাবে এগোয় তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। মানুষের সমাজব্যবস্থার বিবর্তনে যে নানা ধরনের সমস্যা প্রতিনিয়ত দেখা দেবে—অর্থনীতির সমস্যা, রাজনীতির জটাজট, গোষ্ঠী-ও-ব্যক্তির সম্পর্কের অয়নযন্ত্রণা—তাদের মুখোমুখি হ'তে হ'লে কোনো স্বয়ম্ভর চিন্তার আশ্রয় প্রয়োজন, একটি অখণ্ড কাঠামোর প্রয়োজন। প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি একটা-পর-আরেকটা নেড়ে-চেড়ে দেখা যেতে পারে, পরিশ্রম পণ্ডশ্রম, এরকম সম্পূর্ণ যুক্তির পৃথিবী কোনোটিতেই নেই; সহস্র ভাষাগত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও *Das Kapital* এ অথচ আছে।

এমন বলাও অগ্রাহ্য যে ধর্মগ্রন্থগুলি লেখা হয়েছিল দু'হাজার বছর কিংবা আরো বহু আগে, তা ছাড়া তারা ধর্মগ্রন্থই, তাদের ভাষ্যে সমাজতত্ত্ব-ধনবিজ্ঞান-ইতিহাসবিচারের প্রকরণ খুঁজতে যাওয়া মূর্খতা। ধ্রুপদী সংজ্ঞায় যে-যে কীর্তি আমরা চিহ্নিত করি, কিছু-কিছু

লক্ষণ মেনে নিয়েই করি, কতিপয় কালাতীত গুণের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে করি। *Das Kapital* মাত্র একশো বছর আগে লেখা হয়েছিল ব'লেই তাতে এই কালজয়ী লক্ষণ আছে, তা আদৌ নয়; আরো এক হাজার-দেড় হাজার বছর গেলে সেই লক্ষণ মিলিয়ে যাবে, তা-ও নয়। ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণের একটি বিশেষ প্রকরণ গ্রন্থটিতে দৃষ্টান্তিত, প্রকরণটি অব্যয়; এক হাজার অথবা চার হাজার বছর পিছনে চ'লে গিয়েও প্রকরণটি সমাজবিশ্লেষণের কাজে প্রয়োগ করা চলে, আবার ভবিষ্যতের অন্য প্রান্তরে এগিয়ে এসেও প্রকরণটির হুবহু একই প্রয়োগ সম্ভব। তা ছাড়া, প্রকরণটিতে এমনই অন্তর্লীন জাদু, সময়ের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে প্রবেশ-প্রস্থানের ব্যাখ্যানও তাতে বিধৃত। কোনো-এক বিশেষ সময়ের সংস্থানে দাঁড়িয়ে অবশ্যই ভবিষ্যৎ মানবসমাজের সহস্রমুখী সমস্যার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, ধর্মগ্রন্থ-গুলিকে এ-কারণে দুয়ো দিতে যাওয়াও তাই অহেতুক নির্দয়তা, কিন্তু *Das Kapital*-এ অন্তত আগে থেকে একটা ছক কাটা আছে। কোনো সমস্যাই তাই লজ্জা দেবে না, দর্শন-এবং প্রকরণ-মেশানো বিশ্লেষণের সূত্র প্রস্তুত, মার্কসীয় প্রজ্ঞায় একটি সুনির্দিষ্ট উত্তর বিকশিত হবেই।

অবশ্য নাক-সিঁটকোবার মতো লোকের অভাব নেই। বলা হবে, *Das Kapital*-এ ব্যাপ্তি আছে, গভীরতার মূলে ঢুকে যাওয়া আছে, উদারতম ইতিহাসবোধ আছে, কিন্তু সব-কিছুই বড়ো বেশি সরল, বড়ো বেশি ছেলে-ভোলানো। বচন-প্রতিবচন-সংশ্লেষণের নিকষ বিন্যাসে কারো-কারো ভক্তি নেই, আবার অন্য কারো-কারো আপত্তি ভূতচৈতন্যবাদের দর্শনবৃত্তান্তে। কিন্তু বাণী না-মেনেও ভক্তি সম্ভব; আমার নিজের আদর্শ-বিশ্বাসের সঙ্গে অন্বয় না ঘটলে নিশ্চয়ই পৃথগীকৃত বিবৃতি পেশ করবো, অথচ সেই সঙ্গে যদি বুঝতে পারি যে-তত্ত্বের সঙ্গে আমার মিল হচ্ছে না, যে-যুক্তিতে আমার বুদ্ধি সায় দিচ্ছে না, তাতে তথাপি মহত্ত্বের ছাপ আছে, তা হ'লে সন্নত নমস্কার জানানো আমার কর্তব্য। আসলে হেগেলীয় ঐতিহ্যধারক বিশ্লেষণ-শৈলী *Das Kapital*-এর প্রধান কথা নয়; এ-শৈলী হাতের কাছে না থাকলে

অন্য-কোনো প্রকরণের সাহায্যে হয়তো মার্কস্ তাঁর ইতিহাস-সমাজ-ধনবিজ্ঞানচিন্তার কাঠামো রচনা করতেন, সৃষ্টির কাজ ঠেকে থাকতো না। তা ছাড়া, সারল্যে আপত্তি তোলাটা অতি দুর্বল যুক্তি। এত কথা বলার পর নতুন ক'রে আরেক দফা স্পষ্ট ক'রে বলা প্রায় হাস্যকর: *Das Kapital* আর যা-ই হোক সরল গ্রন্থ নয়, দর্শনের মূল সূত্রটি শুধু সরল। অভিজ্ঞান একপেশে নয়, অভিজ্ঞানকে বছরের-পর-বছর ধ'রে পরিচর্যা ক'রে নিয়ে যে-মর্মপাঠ হলো, তা একপেশে। ধর্মের ঘোষণা, বিশ্বাসের ঘোষণা একপেশে হ'তে বাধ্য। কিন্তু *Das Kapital*-এর ক্ষেত্রে, অন্তত দরাজ গলায় এটা বলা চলে, বিশ্বাসের প্রকাশ বিজ্ঞানের সূত্র ধ'রে ঘটেছে। বিজ্ঞান ও বিশ্বাস, আবেগ ও বুদ্ধি, চিন্তা ও অনুকম্পা, পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় হয়ে মিশে গেছে। মানবসমাজের সম্পূর্ণ বিবর্তনের ইতিহাস এভাবে এক নিটোল-নিবিড় যুক্তি-শৃঙ্খলার নিগড়ে বন্দী ক'রে আনা ব্রহ্মপ্রতিম কারুকীর্তি।

তা ছাড়া, এপিকের ক্ষেত্রে যেমন, *Das Kapital*-এ চিন্তার অজস্র শাখা-উপশাখা ছড়ানো, তারা প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, অথচ সেই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নিছক প্রতিভার ঝিকিমিকি দিয়েই যদি পরিচয় ঝালিয়ে নিতে হয়, তা হ'লে প্রত্যেকটি উত্তীর্ণ; অন্য দিকে যদি এতগুলি চিন্তাকে একটি বৃহৎ সংগতির মধ্যে যুক্ত করাই মহৎ সৃষ্টির পরিচায়ক হয়, তা হ'লেও কোনো স্খলন নেই। এক সঙ্গে ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান; কিন্তু পাশাপাশি সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি আলাদা তত্ত্বের গহনে অণুতত্ত্বের উন্মোচন-বিশ্লেষণ-প্রসাধন। এবং এরকম না হ'লে *Das Kapital* মহৎ গ্রন্থ হতে পারতো না, কারণ কীর্তির এই উভমুখিতা আসলে মানবসমাজের সংস্থান-বিবর্তনের প্রতিবিম্ব। সমাজ কোনো মুহূর্তেই এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে নেই: দুটো আলাদা অর্থেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। ইতিহাসের নিয়ম মেনে নিয়ে সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে, দ্বান্দ্বিকতায় দীর্ণ হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে, ফের সংঘাতে পিষ্ট হচ্ছে, পরক্ষণে নতুন সত্তার নির্ভরে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সমান্তরাল পরিবর্তন ঘটছে সমাজের একেবারে

মূলে, যে-মানুষের সমষ্টি নিয়ে আমাদের সমাজ, সেই সমষ্টির গভীরে। সামাজিক মানুষের পারস্পরিক বিনিময়-সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে, কারণ এখানেও সংঘাত ঘটছে, সংঘাত ঘটছে কারণ সম্পত্তি-ও-ধনগত চেতনা শ্রেণী-বিভাজনের দায়ভাগভুক্ত, কোনো মানুষই এই শ্রেণীচেতনার আশ্রয়ের বাইরে নিরালম্ব থাকতে পারে না।

দুটো তত্ত্ব পাশাপাশি পা ফেলে: সামাজিক গতির তত্ত্ব, পুরুষগতি, প্রকৃতিগতি। এবং এই দুই গতির গহনে আরো অনেক অণুপ্রতিম গতির প্রবাহ, যে-প্রবাহের শেষে কিন্তু সেই বিশাল মোহানা: সমাজ, সমাজের ইতিহাসের ছক-কাটা ঢল বেয়ে ভবিষ্যতের সমুদ্রস্রোতের দিকে এগিয়ে চলা। ভূতচৈতন্যবাদে যাঁরা আস্থা রাখেন না, দ্বান্দ্বিক অন্বীক্ষায় যাঁদের অনীহা, ইতিহাস-চেতনা যাঁদের কাছে জুজুবুড়ি, তাঁদেরও কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় এসে জব্দ হ'তে হয়, *Das Kapital*-কে প্রত্যক্ষ হোক, পরোক্ষ হোক, কুর্নিশ করতে হয়। অন্য সব-কিছু যদি পাশে সরিয়ে রাখা যায়, মার্কস্ ভবিষ্যদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন —মহান দার্শনিক ছিলেন—ঐতিহাসিক চেতনাসম্পৃক্ত ন্যায়রত্ন ছিলেন, এ-সমস্তই যদি ভুলে যাওয়া যায়, তা হ'লেও যা অবহেলা করা চলে না তা চিন্তার খণ্ডিত জগতেও তাঁর অপরূপ-আশ্চর্য কর্মকুশলতা।

একটু বিশদ ক'রে বলি, আমি ক্ষুন্নিবৃত্তি করি জ্ঞানের যে-শাখার বেসাতিতে, সেই ধনবিজ্ঞান থেকে একটা উদাহরণ দিয়ে। *Das Kapital*-এর তাত্ত্বিক কচকচি বাদ দিয়ে দেওয়া হলো, সামাজিক বিবর্তনের প্রসঙ্গ নির্বাসনে পাঠানো হলো, কোনো সমাজব্যবস্থার আর্থিক কাঠামোতে কী ক'রে চিড় ধরে, কী ক'রে নিহিত বৈপরীত্যের চাপে তা গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ে, তা-ও খুব ভালো ক'রে উপলব্ধির শরীর থেকে লেপে-মুছে দেওয়া হলো, কিন্তু তা হ'লেও মার্কস্ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনবিজ্ঞানী থেকেই যাবেন। কারণ অখণ্ড স্থপতি গড়ার প্রয়োজনে অর্থনীতির যে-ক'টি ছোটোখাটো তত্ত্ব তাঁকে উত্থাপন করতে হয়েছিল, তাদের উৎকর্ষের তুলনা নেই। প্রকরণের শাখানদী-উপনদী যে-ক'টি তাঁকে স্রোতস্বিনী করতে

হয়েছিল, ধনবিজ্ঞানে তাদের উচ্ছলতা চোখ-বুদ্ধি-মেধা ধাঁধিয়ে দেয়। ধনবিজ্ঞানের স্রেফ ব্যাকরণিক দিক নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় মার্কসের ছিল না, স্থাপত্যের যে-আদর্শ তাঁর ধ্যানবস্তু, তার প্রয়োজন মেটাতে নেহাৎ যেটুকু অভিনিবেশ না করলেই নয়, তার বেশি নিজেকে তিনি ধনবিজ্ঞানের প্রাকরণিক অরণ্যে জড়াননি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গণিতের চর্চা তিনি করেননি, একেবারে হালে ধনবিজ্ঞানে গাণিতিক সূত্র বেছে-বেছে নিয়ে সিদ্ধান্তের অনুলিপি অহরহ বদলে দিয়ে, যে-ধরনের কালোয়াতি দেখানো হচ্ছে, তা তাঁর কাছে অসহ্য না ঠেকে যেতো না। অথচ আধুনিক ধনবিজ্ঞানের মূল্যবান যে-ক'টি আবিষ্কার ও প্রাকরণিক ঝোঁক, *Das Kapital*-এ সেই একশো বছর আগে তাদের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি। শ্রীযুক্ত শুম্পেটারের উৎসাহের প্রেরণায়, এবং শ্রীযুক্ত লিওন্টিয়েফের অধ্যবসায়ের কল্যাণে, অর্থব্যবস্থা বিশ্লেষণের যে-শৈলী বিগত কুড়ি-পঁচিশ বছরে সর্বখ্যাত হয়েছে, *Das Kapital*-এর দুই শাখামণ্ডিত উৎপাদনসংস্থার বিবরণে তার অঙ্কুর। কোনো স্থিত অর্থব্যবস্থার গতিপথে কেন বন্ধুরতা দেখা দেয়, চক্রায়ত পরিক্রমণ কেন অপ্রতিরোধ্য, একশো বছরের পুরোনো এই বইতে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা। এমন কি মুদ্রাব্যবস্থার উদ্‌ভ্রান্ত হেঁয়ালি, মুদ্রার সংকোচন-সম্প্রসারণের সামাজিক প্রতিফল, ইত্যাদি নিয়ে *Das Kapital*-এ যে-আলোচনা লিপিবদ্ধ, তার সঙ্গে মতভেদ সম্ভব, কিন্তু বিশ্লেষণের আঁটো পদক্ষেপ চমকিত না ক'রে পারে না।

সব শেষে এক চূড়ান্ত সওয়ালের মুখোমুখি হতে হয়। যুক্তি থাক, প্রাকরণিক চমৎকারিত্ব থাক, বিশ্বাস থাক, দর্শন থাক, গভীর মানবিকতাবোধ থাক, *Das Kapital* তা হ'লেও, অনেকে বলবেন, তাচ্ছিল্যের বস্তু, কারণ ঐ গ্রন্থে মার্কস্ যুক্তি, সাক্ষ্য এবং অন্বীক্ষার সাহায্যে যে-যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, তাদের অধিকাংশই ফলেনি, যেখানে যে-বিপ্লব হিশেব ক'ষে ব'লে দিয়েছেন তা কেঁচে গণ্ডুষ। তা হ'লে এই বই নিয়ে এত মাতামাতি-লাফালাফি কেন, সমস্ত দর্শনই যদি অলীক প্রতিপন্ন হয়, তা হ'লে কী লাভ ইতিহাসবোধে

বিস্তৃত-প্রসারিত হয়ে, কী লাভ ভবিষ্যতের রূপকথা রচনায়? কিন্তু এই জিজ্ঞাসারও উত্তর সোজা। মার্কসের বিয়োগ ঘটে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে; পৃথিবীর চেহারা তার পর এই পঁচাশি-নব্বুই বছরে অনেকটাই বদলে গেছে। অনেক তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে পৃথিবীর অনেকগুলি দেশ জুড়ে, ঝাঁকে-ঝাঁকে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, নিছক জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়েছে। লেনিন রুশ দেশে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক জাদু ঘটিয়ে দিলেন, তার পরের বাকি পঞ্চাশ বছরে ইতিহাস ক্ষিপ্রবেগে এগিয়েছে, মাও-ৎসে-তুংয়ের নেতৃত্বে চীনে যা ঘটেছে ও ঘটছে তা ইতিহাসকে আরো-জোরে সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এরই মধ্যে শোষণ যাঁদের রক্তঅস্থিমজ্জাগত, দুটো গোটা মহাযুদ্ধে নিজেদের মধ্যে তাঁরা খাওয়াখাওয়ি করেছেন, মাঝে-মাঝে ঈষৎ থেমে কিছুটা সামলে নিয়েছেন, কিন্তু ইতিহাস এই দ্বন্দ্বসন্ধি-কাহিনীর চোরাগলিতে ঢুকে প'ড়ে স্বীয় সিদ্ধি আরো একটু এগিয়ে নিয়েছে। অন্য পক্ষে, মার্কস্ যা-যা ঘটবে মনে করেছিলেন, তার বেশ-কিছু সংঘটিত হয়নি, এই এতগুলি দশক বাদেও পশ্চিম ইওরোপে বিপ্লব পরাহত, উত্তর আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলন নির্জীব-নির্বীর্য, এবং বহু দেশের অভ্যন্তরে তথা বাইরে শোষণের ধারা অব্যাহত।

এ-সমস্ত কিছুর জন্যই তো, আমার বিবেচনায়, *Das Kapital*-এর বিমুখ হওয়ার পরিবর্তে, আমাদের অভিভূত সকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত গত আট-ন'দশকে এই পৃথিবীর চেহারা যদি এমন বিস্ময়-জনকভাবে বদলে গিয়ে থাকে, তার কারণ ঐ একটি গ্রন্থ। *Das Kapital* লিখিত হয়েছিল ব'লেই মার্কসের ভবিষ্যদ্‌বাণী অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে গেছে: *Das Kapital*-এর মর্মকথায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে শ্রমিক আন্দোলন ইওরোপ-আমেরিকায় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ালো ব'লেই মার্কসের একটি সূত্রের গ্রন্থি ছিঁড়ে পড়লো, মজুরির হার নিচে ঝুঁকলো না, বরঞ্চ বেড়েই চললো, ফলে যে-সংকট উপান্তে ছিল, তা অপ-ম্রিয়মাণ হয়ে-হয়ে অবশেষে মিলিয়ে গেল। কিন্তু এই সংঘটনাকে

Das Kapital-এর ব্যর্থতা ব'লে দাবি করার নিহিতার্থ ভাষার উপরে খামখেয়ালি।

সব কথার শেষ কথা, ঐ বইটি লেখা না-হ'লে এশিয়া-আফ্রিকা-লাটিন আমেরিকায় জাতীয় আন্দোলন অন্য রাস্তায় মোড় নিতো, আরো অনেক হতাশ্বাস অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবীর শোষিত মানুষের দিনযাপন চলতো। যদি দ্বান্দ্বিকতায় আস্থা রাখি, তা হ'লে এটাও আমাকে মানতে হয়, একশো বছর আগে যে-বই লেখা হয়েছিল, তার বশ্লেষণ-ব্যাখ্যা-অনুশীলনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না. আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে এই ব্যাখ্যারও প্রব্রজ্যা, বদলে যাওয়া আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে অহরহ নতুন ক'রে বিশ্লেষণ। আসলে *Das Kapital* গ্রন্থটিও সমগ্রভাবে দেখলে একটি আদর্শের ভাস্বর প্রতীক, যে-আদর্শ অব্যয়, যে-আদর্শ ঘোষণা ক'রে বহুতর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়ে মানুষ একদিন শ্রেণীহীন সংঘাতহীন অমরাবতীতে পৌঁছবে, যেখানে সে, পরিণতির উপান্তে, মহত্তম, বৃহত্তম, উদারতম। এই একশো বছরেও এই আদর্শে সামান্যতম ফাটল ধরেনি, তাই *Das Kapital* যেমন উত্তুঙ্গ বিজ্ঞান, তেমনি নিখাদ মহাকাব্যও।

সালতারিখ নিয়ে সামান্য-একটি গবেষণার উল্লেখ ক'রে এই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। কার্ল মার্কস্‌-এর মৃত্যু ঘটে ১৮৮৩ সালে, ঠিক এই বছরেই বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ তুই ধনবিজ্ঞানীর জন্ম—কেইন্‌স্‌ এবং শুম্পেটার। তথ্য হিশেবে মন্তব্যটি তুচ্ছ, তবু চকিত মুহূর্তে বিস্ময়-উদ্রেককারী।

অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদের কলুষসম্মোহন। ধনবিজ্ঞানে, গত দেড়শো বছর ধ'রে অন্তত, এ্যাংলো-স্যাকসনদের অখণ্ড আধিপত্য। অ্যাডাম স্মিথ, এবং রিকার্ডোর, উত্তরাধিকারের গর্ব, পুরো উনবিংশ শতক এবং এ-শতকের প্রথম পঁচিশ-তিরিশ বছর ধ'রে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, তার উপর ইংরেজি ভাষার সর্বব্যাপী প্রসার—সব-মিলিয়ে একটি লোক প্রবাদের সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, ধনবিজ্ঞানে যা-কিছু নতুন চিন্তা, ধ্যান, বিপ্লব সংগঠিত হচ্ছে, তার সমস্ত কৃতিত্ব ইংরেজ পণ্ডিতদের।

এ-কিংবদন্তী তুর্মর। তাই গত কুড়ি-পঁচিশ বছর ধ'রে যদিও সব ঘাটে-পথে কেইন্‌স-এর বিজয়নির্ঘোষ, সাধারণের আলোচনায়-বিন্যাসে শুম্পেটারের নামগন্ধ নেই, এমন কি বিদগ্ধজনের মহলে পর্যন্ত যেখানে কেইন্‌স হচ্ছেন মনু, শুম্পেটার সম্মানিত ভাষ্যকার মাত্র। উপরে সাধারণভাবে যে-কথা বলা হয়েছে, সেটা বাদ দিয়েও শুম্পেটারের আপেক্ষিক খ্যাতি-ম্লানতার অন্যান্য কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। শুম্পেটারের প্রথম জীবনের অধিকাংশ বিদ্যাচর্চাই জর্মন ভাষার মধ্যবর্তিতায়, ইংরেজি জানা মহলের আওতার বাইরে। তাই তাঁর মনীষার খ্যাতি ইওরোপের ভূ-খণ্ডেই দীর্ঘদিন সীমিত থেকে গেছে, দ্বৈপায়নিক ইংরেজদের জ্ঞানচর্চার বাইরে। এবং যদিও শুম্পেটার ১৯৩২ সাল থেকে মার্কিন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস

করেছেন, তাঁর আদি-রচনা ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে অত্যন্ত ঢিমে-তালে এবং আজ পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ নয়। ইতস্ততবিক্ষিপ্ত তাঁর নানা প্রবন্ধ অজস্র জর্মন পত্রিকায় এখনো অবহেলিত অবস্থায় প'ড়ে আছে। এটা ভেবে অবাক হ'তে হয় যে, ইংরেজনবিশ মহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রধানত *Business Cycles* (১৯৩৯) এবং *Capitalism, Socialism and Democracy* (১৯৪৩)-র মারফত, অথচ এর কোনোটিই তাঁর প্রধান কীর্তির অঙ্গ নয়। অত্যন্ত সম্প্রতি তাঁর *Theory of Economic Development*-এর মহৎ চিন্তাবিন্যাস লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, অথচ এ-বইয়ের মূল জর্মন সংস্করণ প্রকাশিত হয় প্রথম মহাসমর শুরু হবারও আগে, সুদূর ১৯১২ সালে।

তা ছাড়া, শুম্পেটারের বৈশিষ্ট্যই হলো তিনি কোনোদিন তাৎক্ষণিকের নেশায় মাতেননি। সমকালীন কোনো অর্থনৈতিক সমস্যার যখনই সম্মুখীন হয়েছেন, কলম হাতে নিয়ে তখনই কোনো সমাধান বাতলাতে লেগে যাননি, দীর্ঘকাল ধ'রে ভেবেছেন, তাঁর মনীষার উদার ক্যানভাসে ভাবনাকে সংযম-ও-সুষমাভূষিত করেছেন, তারপর কোনো গ্রন্থের আয়তনে যখন সে-চিন্তাকে বিধৃত করতে চেয়েছেন, তা বিরাটের ব্যাপ্তি পেয়েছে, সে-ব্যাপ্তিকে লোকে দূর থেকে সম্ভ্রম জানিয়েছে। যেহেতু তাদের ধৈর্য নেই, এবং সময় অস্থির, সে-বইয়ের ভিতরে প্রবেশ ক'রে জ্ঞানচয়নের প্রবণতা তাদের আসেনি। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ *Business Cycles*-এর এই দশাপ্রাপ্তি ঘটেছে। অন্য পক্ষে *General Theory* লিখে কেইন্‌স্ যে-খ্যাতিশীর্ষে বিদ্যুৎদ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে গেলেন, তার কারণই হলো তাঁর সাময়িকতা-চেতনা। রচনা হিশেবে বলতেই হয় *General Theory* অত্যন্ত নিকৃষ্ট, অসমান, জায়গায়-জায়গায় পঠন-অযোগ্য। কিন্তু তা নিয়ে কেইন্‌সের কোনো মাথা-ব্যথা ঘটেনি। সমসাময়িক অর্থনৈতিক ব্যাধির এমন-এক চমৎকার দাওয়াই বাতলে দিলেন, স্পষ্ট, প্রায়-সাংবাদিক ভাষায়, এবং সে-ওষুধ এতটা সাধারণ এবং মোক্ষম ফ'লে গেল, যে ধনবিজ্ঞানের

ইতিহাসে, অ্যাডাম স্মিথের *Wealth of Nations*-এর পরে, *General Theory*-র অভিভাবক্রিয়তার জুড়ি নেই।

সব শেষে অবশ্য শুম্পেটারের তুলনাহীন স্বভাব-বিনয়ের উল্লেখ করতে হয়। কন্টিনেণ্টাল পাণ্ডিত্যের সমস্ত মহৎ উত্তরাধিকার নিয়ে তিনি মার্কিন দেশে এসেছিলেন। কেইন্‌স যেখানে আত্মপ্রচারের অহমিকায় আচ্ছন্ন, শুম্পেটার সেখানে তৃণাদপি সুনীচেন, আত্ম-গোপনের আপ্রাণ-প্রয়াসে অস্থির। নিজের ঢাকপেটোনোর মতো কদর্য রুচি তাঁর ছিল না, তাঁর অন্তরঙ্গ অনুরাগীদেরও তিনি এ-বিষয়ে বরাবর যথাসম্ভব নিবৃত্ত ক'রে এসেছেন।

শুম্পেটারের মৃত্যুর পর থেকে পণ্ডিতমহলের অনেকেই অবশ্য বিবেকদংশন থেকে ভুগছেন। এই বিবেকদংশনের সঙ্গে সহস্রতর সম্ভ্রমের অভিভূতি এক হয়ে মিশে যাবে তাঁর *History of Economic Analysis* পাঠান্তে, যা শুম্পেটারের মৃত্যুর পুরো চার বছর পরে প্রকাশ করা সম্ভব হলো। গ্রন্থটিকে অন্য-কোনো নামে অভিহিত করতে যাওয়া আত্মবঞ্চনা মাত্র, স্বল্পতম স্পষ্ট ভাষণে পরম সত্যকে স্বীকার ক'রে নিতে হয় : যে-সংজ্ঞাই ব্যবহার করা হোক না কেন, সব বিচারেই এই গ্রন্থ এপিক ব'লে পরিগণিত হবার যোগ্য।

১৯২৪ সালে শুম্পেটার *Epochen der dogmen-und-Methodengeschichte* নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, ধন-বিজ্ঞানের কয়েকটি চিন্তার সূত্র ধ'রে কিছুটা বিবৃতিধর্মী, কিন্তু প্রধানত বৈশ্লেষণিক আলোচনা। সে-বই অনেকদিন ছাপা ছিল না। ১৯৪১ সালের গোড়ায় শুম্পেটার ভাবলেন আমূল সংশোধন ক'রে *Epochen*-এর একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করবেন। *Capitalism, Socialism and Democracy* লেখা সদ্য শেষ করেছেন, হাল্কা কোনো কাজ খুঁজছিলেন, যার ভার কম, আনন্দ পর্যাপ্ত। লেখা শুরু করলেন যখন, ভেবেছিলেন মাত্র কয়েক মাসের বরাদ্দ কাজ। অথচ একটু-একটু ক'রে রচনা যতই এগোতে লাগলো, ততই উদ্দাম হয়ে উঠলেন শুম্পেটার, সমস্ত ভাবনাচিন্তা আচ্ছন্ন ক'রে তাঁর নতুন গ্রন্থের

ব্যাপ্তির কল্পনা তাঁকে পেয়ে বসলো, হারভার্ডের পড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে, সরকারী নানা কাজের অবসরে, নিয়মানুগ গবেষণা-পরিচালনার মধ্যে, এখানে-ওখানে বক্তৃতা দেবার ভিড়ে, কখনো দ্রুত, কখনো মন্থর গতিতে গ্রন্থটির অধ্যায়ের-পর-অধ্যায় আকার পেতে লাগলো। যা প্রথমে ভেবেছিলেন হবে *History of Economic Thought*, কয়েক বছরের মধ্যে তা পরিকল্পনা বদলে হয়ে গেলো *History of Economic Analysis*, অর্থাৎ কিনা শুম্পেটার নিজের কাছেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে রইলেন, গহনে তাঁকে প্রবেশ করতেই হবে, ধনবিজ্ঞানের বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তির ইতিহাসক্রম অনুসরণ ক'রে সব-ক'টি শাখা-প্রশাখার অন্তরঙ্গ আলোচনায় গ্রন্থটিকে ভ'রে তুলতে হবে। এবং সে-আলোচনা নিছক নিরপেক্ষ-নির্জীব আলোচনা নয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার। এক সঙ্গে তিনি হবেন কাহিনীকার এবং টীকাকার দুই-ই। ইতিহাসের আদি সিঁড়িতে ফিরে গিয়ে ধনবিজ্ঞানের প্রথম চিহ্নটিকে সযত্নে কুড়িয়ে তুলবেন, তারপর ধাপে-ধাপে এগোবেন, নিজের চিন্তাবুদ্ধি-মনীষা-বিচারের কষ্টিপাথরে যা-কিছু কুড়োলেন সমস্ত-কিছুর মূল্যায়ন করবেন, বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলোকে একত্র গাঁথবেন, যা তুচ্ছ মনে হবে— লোক-পরিবাদ যা-ই হোক না কেন—দৃঢ়চিত্তে পাশে সরিয়ে রাখবেন, এমনি ক'রে পৌঁছুবেন ইতিহাসের বর্তমান সোপানে। বলা বাহুল্য, ধনবিজ্ঞানে ঐতিহ্য বর্ণনা ক'বে এতদিন পর্যন্ত যে-অজস্র বই লেখা হয়ে এসেছে, এই মহৎ কাঠামোর সঙ্গে তাদের কোনো তুলনা চলতে পারে না। কারণ শুম্পেটারের প্রতিভার স্পর্শে ইতিহাস-বর্ণনা সৃষ্টিতে রূপান্তর পেলো, ধনবিজ্ঞানকেই তিনি যেন নতুন ধাতু দিয়ে গড়তে লেগে গেলেন।

দীর্ঘ দশ বছর ধ'রে শুম্পেটার এই কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন, এবং ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে যখন তাঁর মৃত্যু ঘটলো, গ্রন্থ তখনো অসমাপ্ত; হয়তো যে-দুরূহ ব্রত নিয়েছিলেন, তা প্রায় উদ্‌যাপিত হয়ে আসছিল, শেষের দিকের অধ্যায়গুলোর খসড়া একবার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে শুম্পেটার আমূল সংশোধন,

সংযোজন ও সম্পাদনার কাজে নিজেকে নিয়োগ করতে পারতেন। তার আগেই তাঁর ডাক এলো : প'ড়ে রইলো এখানে-ওখানে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত শত-শত পাণ্ডুলিপির টুকরো, কিছু বাড়ির দেরাজে, কিছু কলেজে কোনো ফাইলিং ক্যাবিনেটে, কোনো-কোনো অংশ টাইপিস্টদের কাছে। হয়তো শর্ট-হ্যাণ্ডে কোনো পাদটীকার টুকরো, হয়তো জর্মন ভাষায় কোনো-একটি পরিচ্ছেদের কল্পনার অনুভাষ, কোথাও হয়তো একটি মন্তব্য আরম্ভ হয়ে অর্ধপথে থেমে গেছে।

সৌভাগ্যত. পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই এমন অবস্থায় পাওয়া যায়, যা থেকে সম্পাদনার কাজ অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব'লে মনে হয়নি। মহিয়সী নারী এলিজাবেথ শুম্পেটার, স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘ আড়াই-তিন বছর ধ'রে অপরূপ তিতিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন, অধ্যায় এবং অনুচ্ছেদগুলো এমন পরম্পরায় সাজিয়েছেন যা তাঁর কাছে মনে হয়েছে শুম্পেটারেব ইচ্ছার অন্তরঙ্গতম প্রতিফলন ব'লে, যেখানে একই বিষয় বা অধ্যায় বা অনুচ্ছেদের একাধিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে তা থেকে বেছেছেন, যে-সমস্ত অংশগুলোকে মনে হয়েছে শুম্পেটার পরে হয়তো বা বর্জন কিংবা পরিমার্জনা করতে চাইতেন, ছোটো হরফে সেগুলো ছাপিয়েছেন, পাদটীকা এবং মন্তব্যগুলো যথাসম্ভব ঠিক জায়গায় বসাবার প্রয়াসে এতটুকু ব্যত্যয় দেখাননি। শ্রীমতী শুম্পেটারের ভূমিকা এবং পরিশিষ্টটি সবাইকে প'ড়ে দেখতে অনুরোধ জানাই। সম্পাদনার এই কঠিন অধ্যায়টিকে একটি মহৎ রোমাঞ্চ উপন্যাস ব'লে মনে হবে, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার এমন উদাহরণ বিরল। অথচ এমনই নিয়তি-লিখন, *History of Economic Analysis* ছাপা শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই এলিজাবেথ শুম্পেটার গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়েন, মৃত্যুর পূর্বে তিনিও গ্রন্থটি দেখে যেতে পারেননি।

বারোশো পৃষ্ঠারও বেশী সুদীর্ঘ গ্রন্থ, পাঁচটি সুষ্ঠু খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড Introduction : Scope and Method , গ্রন্থটির

বিস্তার ও রচনাশৈলী নিয়ে স্পষ্ট আলোচনা, ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ প্রথার ব্যাখ্যা, অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের প্রগতিধারার সঙ্গে প্রতি-তুলনামূলক অধ্যায়, সব শেষে "ধনবিজ্ঞানের সমাজতত্ত্ব" বিষয়ে একটি দার্শনিক নিবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ডকে শুম্পেটার নাম দিয়েছেন From the Beginnings of the First Classical Situation ; গ্রীক-রোমান সময় থেকে শুরু ক'রে, প্লেটো-অ্যারিস্টটলের ধনতাত্ত্বিক রচনাদির টীকা কেটে, খ্রীষ্টোত্তর প্রথম কয়েকটি শতকের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ ক'রে, ফিউডল, স্কলাসটিক ও law of nature-প্রত্যয়ী মনীষীদের চিন্তা পর্যালোচনা ক'রে, mercantilist ও physiocrat-দের শাস্ত্রাদির পরীক্ষান্তে অ্যাডাম স্মিথ পর্যন্ত খণ্ডটিকে প্রলম্বিত ক'রে এনেছেন। ১৭৯০ সাল পর্যন্ত এ-আলোচনার সময়-পরিমিতি তৃতীয় খণ্ড ১৭৯০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যবর্তী চিন্তাধারার বিশ্লেষণ: ম্যালথাস, রিকার্ডো. মিল, মার্কস এবং ইওরোপের সমকালীন ধন-বিজ্ঞানীদের নিয়ে বিস্তৃত ভাষ্য। চতুর্থ খণ্ড, From 1870 to 1914 (and later), আটটি অধ্যায়ের সমষ্টি, যাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ক'টিকে প্রধান ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে: (৩) Some Developments in Neighbouring Fields (ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান), (৪) Socialpolitik and the Historical Methods, (৫ ও ৬) The General Economics of the Period, (৭) Equilibrium Analysis, এবং (৮) Money, Credit, and Cycles। সর্বশেষ খণ্ডকে শুম্পেটার বলেছেন A Sketch of Modern Developments। মনে হয় শুম্পেটারের ইচ্ছা ছিল এই অংশটিকে আরও বিস্তৃত ক'রে লেখবার, তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে যে-খসড়া পাওয়া গেছে, তা, গ্রন্থটির বিরাট ক্যানভাসের পরিষঙ্গে, খুবই সংক্ষিপ্ত। শেষ খণ্ডের প্রধান পরিচ্ছেদগুলোর বিষয়: (2) Development Stemming from the Marshall-Wicksell Apparatus, (3) Economics in the 'Totalitarian' Countries, (4) Dynamics and

Business Cycle Research, (5) Keynes and Modern Macro-Economics.

এমন বিরাট প্রসারতায় ইতিপূর্বে ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস রচনা করবার কথা কেউ ভাবতে পারেননি ; আগেই বলেছি গ্রন্থটি এপিক লক্ষণযুক্ত। সেই উক্তিতেই আর-একবার ফিরে যেতে হচ্ছে—গ্রন্থটির ব্যাপ্তি মহাকাহিনীপ্রতিম, একটি সূত্রের সঙ্গে আর-একটি সূত্র এসে মিশেছে, একটি ধারা পৌঁছিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আরেকটি ধারার সূচনায়, যেন পুঞ্জ-পুঞ্জ সৌন্দর্য কোনো মহান স্থপতি পাশাপাশি সাজিয়ে যাচ্ছেন। অথচ সেই সঙ্গে গভীরতার দীপ্তিও ; কোনো বিষয়েই শুম্পেটার আলগোছে মন্তব্য সেরে নিচ্ছেন না. তাঁর মনীষার ফলকে প্রত্যেকটি নিভৃত সত্য দীপ্ত হয়ে উঠছে, যা মেকি তা ম্লানতায় প্রকাশ পাচ্ছে, একই সঙ্গে নিবিড়তা এবং বিস্তার। এই গ্রন্থপাঠে যে-অখণ্ড তৃপ্তি তা সম্ভবত তুলনাহীন।

অবাক হয়ে যেতে হয় শুম্পেটারের ভাষাসৌকর্যে। জীবনের শেষ কুড়ি বছর মাত্র ইংরেজি ভাষার চর্চা করেছেন, অথচ তজ্জনিত সামান্যতম গ্লানি পর্যন্ত নেই। তা ছাড়া, জর্মন ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় যে-স্বভাবগত দুরূহ রচনাশৈলী, তার ছায়া পর্যন্ত তাঁর ইংরেজি রচনাভঙ্গিকে স্পর্শ করতে পারেনি। কী স্বচ্ছন্দ, নিশ্চিত, সীমিত ভাষাব্যবহার। কখনো ধ্রুপদী সুর, কখনো ঘরোয়া সহজতা, কখনো এমনকি হালকা চটুলতা। ভাষাব্যবহারে এমন জাদু, মনে হয় যেন কথকতা শুনছি। কোনো পণ্ডিতকে শুম্পেটার উদাত্ত কণ্ঠে সম্মান জানাচ্ছেন, ভাষা সেখানে আরাধনার মন্ত্র হয়ে গেছে, কোথাও কোনো তথ্যকে প্রাঞ্জল ক'রে বোঝাতে চাইছেন, ভাষা সেখানে পরিচ্ছন্ন অতিস্বচ্ছ জলের মত ; কোনো ধনবিজ্ঞানীকে নিয়ে সুমধুর একটু ঠাট্টা করছেন, ভাষা সেখানে কিঙ্কিণীমূর্ছনা। অথচ কোনো জায়গাতেই ভাষা পরিমিতিবোধ হারায়নি, বিষয়কে ছাপিয়ে কলকণ্ঠ হয়ে ওঠেনি, বক্তব্যের মেজাজের সঙ্গে ধাপ মিলিয়ে-মিলিয়ে এগিয়েছে।

বলা বাহুল্য, *History of Economic Analysis*-এর সব-ক'টি

খণ্ডের বিস্তৃত বিশ্লেষণ এই আলোচনার পরিসরে সম্ভব নয়। শুম্পেটারের প্রভাব ফলে ধনবিজ্ঞানের চিরাচরিত বিচার এবং মূল্যায়নে অনেক ক্ষেত্রেই বিপ্লব ঘ'টে যেতে বাধ্য। অনেক মূর্তি ধ্ব'সে যাবে, অবহেলার কুয়াশা দীর্ণ ক'রে অনেক প্রতিভা আলোতে বেরিয়ে আসবেন। বার-বার ক'রে পঠিত হবে এই গ্রন্থ, শুম্পেটারের মন্তব্য-বিচার ইত্যাদি তর্কের ঝড় তুলবে, অনেক মতদ্বৈধতা, সহস্র দ্বিধাদ্বন্দ্ব। তার পর, হয়তো আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে, বিচার-ঐতিহ্য নতুন-কোনো তুলাদণ্ডে পৌঁছতে সক্ষম হবে। শুম্পেটারের কয়েকটি আস্থা নিয়ে নিচে সামান্য-একটু আলোচনা করবো মাত্র।

প্রধান ঝড় উঠবে এ্যাংলো-স্যাক্সন মহলে, কেমব্রিজ-লণ্ডন স্কুলে। গেলো দেড়শো বছর ধ'রে ইংরেজ বিদগ্ধলোকের পক্ষ থেকে প্রচার ক'রে আসা হয়েছে এ্যাডাম স্মিথ ধনবিজ্ঞানের পরম পিতা, *Wealth of Nations*-গ্রন্থ ধনবিজ্ঞানের প্রথম উপনিষদ। ফরাশি মহল থেকে মাঝে-মাঝে এর প্রতিবাদ শোনা গেছে, কিন্তু সে-প্রতিবাদের পিছনে তেমন পৌরুষ ছিল না। আসলে ধর্মপ্রচার, জ্ঞানপ্রচার কিংবা মহিমা-প্রচার, সমস্ত-কিছুর সাফল্য নির্ভর করে প্রচারকের প্রতিষ্ঠার উপর। ইংরেজ পণ্ডিতদের সঙ্গে গলাযোগ ঘটাতে পারেন এমন শৌর্য অথবা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা এই দীর্ঘদিন ধ'রে অন্যত্র কোথাও লক্ষিত হয়নি, তাই নিশ্চিত কূপমণ্ডুকতার সঙ্গে ধনবিজ্ঞানের সিংহপুরুষদের উত্তরাধিকার নিরূপণ ক'রে নিয়ে এ্যাংলো-স্যাকসন সম্প্রদায় পরিতৃপ্ত থেকেছিলেন: এ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, ম্যালথাস, জন স্টুয়ার্ট মিল, মার্শাল, কেইনস্।

এই গর্বিত সাম্রাজ্যে এবার ফাটল ধরলো। শুম্পেটারের ভাষ্যে এ্যাডাম স্মিথ রাজসিংহাসন থেকে স্খলিত, সম্ভ্রান্ত সেনাপতিদের একজন মাত্র। *Wealth of Nations*, শুম্পেটারের বিবেচনায়, ইংরেজি ভাষায় ধনবিজ্ঞানের প্রথম প্রাঞ্জল রচনা। সরলীকরণের, সংশ্লেষণের, ব্যাখ্যানের সমস্ত কৃতিত্ব-প্রশংসার অধিকার স্মিথে বর্তাবে, কিন্তু তদসত্ত্বেও তিনি পথত্রাতা নন, মৌলিকত্বের দীপ্তি থেকে তাঁর

রচনা বঞ্চিত। শুম্পেটার বলতে চাইছেন, স্মিথেরধ নবিজ্ঞান কোনো অভিনব ধারার সূত্রপাত নয়, বরঞ্চ একদিকে natural law দার্শনিকদের চিন্তার, অন্যদিকে physiocrat ভাবধারার, অন্যতম সঙ্গমফল মাত্র। শুম্পেটারের বরণডালার আলো তাই ঈষৎ পাশে স'রে গিয়ে বিকিরিত হয়েছে, তার পুষ্পমাল্য political arithmetic-এর সূত্র যাঁরা প্রথম গেঁথে দিলেন অষ্টাদশ শতকের সেই প্রথম econometrician-দের জন্য : কাঁতিলঁ, কুর্নো, তুর্গো, এমন কি mercantilist পেটি। এঁদের হাতেই tableau economique-এর শুরু, এবং শুম্পেটারের বিবেচনায় আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের শ্রেষ্ঠ ধনবিজ্ঞান এই tableau-র সন্নিহিত চিন্তার ব্যাপ্তি ও বৃদ্ধি।

এখানেই ক্ষান্তি নয়, ডেভিড রিকার্ডোর অভ্রংলিহ খ্যাতি পর্যন্ত শুম্পেটারের সু-সূক্ষ্ম বিচারের সামনে ঢ'লে পড়েছে। এক হিশেবে এতদিন পর্যন্ত রিকার্ডোর আসন স্মিথের-ও উপরে স্থাপন করা হয়েছিল, কারণ, যে-deductive বিশ্লেষণশৈলী সম্প্রতি ধনবিজ্ঞানের প্রধান উপকরণ, তার ব্যবহার রিকার্ডোই শিখিয়ে যান, এবং ধ্রুপদী ধনবিজ্ঞান বলতে এতকাল তাঁর আদর্শ-উদ্‌বুদ্ধ জ্ঞানবস্তুকেই বোঝা যেতো। শুম্পেটারের বিবেচনায় সাময়িকতা-চেতনা রিকার্ডোকে অপকৃষ্টের সন্ধান দিয়ে থাকে। যেহেতু সমসাময়িক নানা সমস্যার সমাধানকল্পে রিকার্ডো নিজেকে সব সময় নিয়োজিত রাখতেন, তাঁর উন্মুখ প্রবণতা ছিল ক্ষীণতম যুক্তির সূত্র ধ'রে অন্যায়রকম বেশিসংখ্যক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে। এই Ricardian vice—যার শুম্পেটার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন 'the habit of piling a heavy load of practical conclusions upon a tenuous ground-work, which was unequal to it yet seemed in its simplicity not only attractive but also convincing'—রিকার্ডোকে সাহায্য করেছে সমকালীনদের বাহবা কুড়োতে, কিন্তু পরিণাম শুভ হয়নি। উত্তরকালে ইংল্যাণ্ডে রিকার্ডোর এই প্রধান দোষ অন্ধ উৎসাহের সঙ্গে

অনুকৃত হয়ে এসেছে, এমন কি, শুম্পেটার দৃঢ়চিত্তে বলছেন, কেইনসের অধিকাংশ রচনা এই ত্রুটি দ্বারা কণ্টকিত।

সব শেষে এ্যালফ্রেড মার্শাল। শুম্পেটার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার সঙ্গে মার্শালের বিরাট পৌরুষ স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, *Principles of Economics*-এর স্থপতিকীর্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছে, কেম্‌ব্রিজগোষ্ঠীর প্রাণদাতা হিশেবে মার্শালের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অন্ত নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে অবিচলিত কণ্ঠে মার্শালের কূপমণ্ডুক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানিয়েছেন। *Principles*-এর যে-সমস্ত সূত্র জড়ো ক'রে, যাদের সৃষ্টিসম্মান ইংরেজি-জানা মহল একমাত্র মার্শালকেই পৌঁছে দিয়েছে, তাদের অধিকাংশই কাছাকাছি সময়ে ইওরোপের অন্যান্য দেশে নানা পণ্ডিত সর্বপ্রথম নির্ণয় ক'রে থাকেন। তাঁদের প্রথম চিন্তা মার্শাল হয়তো আরও শাণিত ক'রে প্রকাশ করতে সক্ষম হন: কিন্তু তা ব'লে যথাযোগ্য স্বীকৃতি যথাস্থানে না-পৌঁছে দেওয়ার অপরাধের ক্ষমা নেই। মার্শালের বিরুদ্ধে শুম্পেটারের অভিযোগের ফিরিস্তি: According to what I believe to be the ordinary standards of scientific historiography, such merit as there was in the rediscovery of the marginal utility principle is Jevons's; the system of general equilibrium (including the theory of barter) is Walras'; the principle of substitution and the marginal productivity theory are Thuren's; the demand and supply curves and the static theory of monopoly are Cournot's (as is the concept, though not the word, price elasticity): the consumers' rent is Dupuit's, the 'diagrammatic method' of presentation is also Dupuit's or Jevons's'। এই বিবৃতির ভাষা মৃদু; কিন্তু মার্শাল সম্বন্ধে অনেক কুসংস্কার ধ্বংস করবার পক্ষে যথেষ্ট।

তাঁর জীবিতকালে যে-ফরাশি ধনবিজ্ঞানী প্রায় অবজ্ঞাত থেকে গেছেন, লিয়েঁা ওয়াল্‌রাস্‌, ঐতিহ্যের ভ্রূকুটি উপেক্ষা ক'রে শুম্পেটার তাঁকেই এই গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করেছেন। শুম্পেটারের এই পক্ষপাতের কারণ অবশ্য স্পষ্ট। Tableau economique-এর আনুষঙ্গিক সমস্যার পরিশীলন-অনুশীলনেই তাঁর অভিমতে ধন-বিজ্ঞানের মহত্তম মুক্তি, কোনো আর্থিক কাঠামোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লীলাপ্রতিলীলার রহস্য-উন্মোচন সম্পূর্ণ সম্ভব এবংবিধ গবেষণায়, এবং বিজ্ঞানের সেখানেই পরম সার্থকতা। ওয়াল্‌রাসের গবেষণা এদিক দিয়ে বিচার করলে বিশ্লেষণী ঐশ্বর্যে আজ পর্যন্ত অপরাজিত। শুম্পেটারের ভাষায় :

'......economics is a big omnibus which contains many passengers of incommensurable interests and abilities. However, so far as pure theory is concerned, Walras is in my opinion the greatest of all economists. His system of economic equilibrium, uniting, as it does, the quality of 'revolutionary' creativeness with the quality of classic synthesis, is the only work by an economist that will stand comparison with the achievements of theoretical physics. Compared with it, most of the theoretical writings of that period—and beyond—, however valuable in themselves and however original subjectively, look like boats beside a liner, like inadequate attempts to catch some particular aspect of Walrasian truth. It is the outstanding landmark on the road that economics travels toward the status of a rigorous or exact science and, though outmoded by now, still stands at the back of much of the best theoretical work of our time.'

আরো যাঁদের নাম অনাদরে কুণ্ঠিত ছিল, শুম্পেটার সম্মানের সঙ্গে সুউচ্চ আসন নির্দেশ ক'রে দিচ্ছেন তাঁদের জন্য ; কুর্নো, মেঙ্গার, দুপুই, জেভন্স। কিছুটা মার্শালের একচোখোমির জন্য, কিছুটা যেহেতু ইংরেজরা ফরাশি ভাষায় মোপাসাঁ পাঠ ক'রেই ক্ষান্ত হয়েছে, জর্মন ভাষায় গোয়টে, ধনবিজ্ঞানে এই মনীষীদের প্রতুল দানের পর্যাপ্ত পরিমাপ কখনো হয়নি। শুম্পেটারের চেষ্টায় এতদিনে পালাবদলের ঋতু শুরু হলো।

দুর্ভাগ্যত, এ-আলোচনার এখানেই উপসংহার টানতে হচ্ছে ; জ্ঞানের এই মণিভাণ্ডার সম্বন্ধে খুব সামান্য আভাস দেওয়াই সম্ভব হলো। কারণ *History of Economic Analysis*-এর অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যের পুরোপুরি পরিচয়দানের চেষ্টামাত্র করতে গেলেও প্রহরের পর প্রহর কাটাতে হয়। এই বই তাই প'ড়ে দেখতে অনুরোধ জানাই সবাইকে ; নিঃসন্দেহে বলা চলে, বিংশ শতকে ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই *Analysis*। গ্রন্থটি ভবিষ্যৎকালে জ্ঞানান্বেষীর নিত্যসঙ্গী হয়ে রইবে। ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও গতিধারা হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য বার-বার ক'রে ফিরে আসতে হবে এই আশ্রয়ে।

১৯৫৫

History of Economic Analysis. By Joseph A. Schumpeter. Oxford University Press. New York, $ 17, 50.

চারটি বইয়ের প্রসঙ্গে

১

রক্ষণশীল দেশ ইংল্যাণ্ড, এবং সনাতন রীতিনীতির চরম শাসন সম্ভবত কেম্‌ব্রিজের মতো বিশ্ববিদ্যালয়াদিতে। অতএব প্রায় বাজি রেখেই বলা চলে, অবসর গ্রহণ না-করা পর্যন্ত শ্রীমতী রবিনসন রীডার হয়েই থাকবেন, মার্শাল অধ্যাপকের পদ দূরে থাক, সাধারণ-কোনো অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করবার জন্য পর্যন্ত তাঁকে আহ্বান জানানো হবে না। কিন্তু তাতে কী-ই বা এসে যায়, মনীষা নিজের নির্ঝর বেয়ে অব্যাহতই প্রবাহিত হবে। পঁচিশ বছর আগে marginal বিশ্লেষণের আলোড়নের তরঙ্গে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি, তার স্বাক্ষর তাঁর প্রথম বই *Economics of Imperfect Competition*। কেইন্‌সের নতুন বিশ্লেষণের সরলীকরণ ও প্রসারণের ব্যাপারেও শ্রীমতী রবিনসনের কীর্তি কম নয়। আর এখন, নতুন করে চারদিকে যখন growth economics নিয়ে আলাপ-আলোচনা-উদ্যম শুরু হয়েছে, এই নতুন বই লিখে তিনি আরো-একবার সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন।

এক হিশেবে বলা চলে, ধনবিজ্ঞানের ধ্রুপদী চিন্তার বিন্যাস প্রায় একশো বছর আগে মরুপথে ধারা হারিয়ে ফেলে; অ্যাডাম স্মিথের অন্বিষ্ট ছিল জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির মূলসূত্রাদির উদ্‌ঘাটন; রিকার্ডো জানতে চেয়েছিলেন জাতীয় প্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে মজুরি, মুনাফা ও জমি করের পারস্পরিক সম্পর্কের কেমনধারা পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু অব্যবহিত পরেই, বিশেষত ইংল্যাণ্ডের মাটিতে, ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের দিগন্ত হঠাৎ ছোটো হয়ে এলো; সামগ্রিক ও কালাপেক্ষী সমস্যাদি এক পাশে সরিয়ে রেখে আণবিক ও একদর্শী সংস্থার ভিত্তিতে

relative prices-এর রহস্যনির্ণয়ে পণ্ডিতদের প্রয়াস আটকে রইলো, ধনবিজ্ঞান ভুললো তার আদি অঙ্গীকার। কেইন্‌সের *General Theory* বহু যুগ বাদে সর্বপ্রথম প্রথাগত প্রাচীরে আঘাত হানবার চেষ্টা, কিন্তু তা-ও বিশেষ এক সমস্যার প্রসঙ্গে ব'লে, এবং বিশ্লেষণে তাৎক্ষণিকতার সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকাতে, তেমন বিপ্লবদ্যোতক হয়নি। আসলে নতুন চিন্তার জোয়ার এসেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে, গত দশ বছরের পরিসরে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিতে, সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রাক্তন উপনিবেশাদির প্রসঙ্গে, কিছুটা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা বজায় রাখবার তাগিদে, দ্রুত আর্থিক প্রগতির প্রণালী, প্রকরণ ও পরিষঙ্গ আবিষ্কারের জন্য তদ্গত অনুসন্ধান শুরু হলো, বৈশ্লেষণিক ধনবিজ্ঞানে নতুন হাওয়া খেলে গেলো, সেই সঙ্গে ধ্রুপদী চিন্তাবিন্যাস নিয়ে নতুন ক'রে গবেষণা।

সাম্প্রতিক এই আপ্রাণ তাগিদ থেকে *Accumulation of Capital*-এর রচনা। যে-কেন্দ্রিক সমস্যা এ-বইয়ের প্রধান উপজীব্য, তা নিয়ে কিছুদিন ধ'রে প্রভূত আলোচনাই পণ্ডিতমহলে চ'লে আসছে, খণ্ড-খণ্ড অনেক মহৎ চিন্তার সূত্র প্রস্তাব করেছেন, শ্রীমতী রবিনসনকে বাদ দিয়েও, কাল্‌ডর, হ্যারড, হিক্‌স, কাহ্‌ন্ প্রমুখ (শুধু ইংরেজ ধনবিজ্ঞানীদেরই উল্লেখ করা হলো) মনীষীরা, তাই আলোচ্য গ্রন্থটির অন্তর্গত ঠিক কোনো চিন্তাকেই সুতীক্ষ্ণ অভিনব ব'লে মনে হবে না এখন ; *Economics of Imperfect Competition*-এর মতোই এ-বইতে শ্রীমতী রবিনসনের কৃতিত্ব প্রস্তাবনার চাতুর্যে, বিন্যাসের চমৎকারিত্বে, প্রাঞ্জলীকরণের প্রায়-জাদুধর্মী ক্ষমতায়। যেন রূপকথা বলা হচ্ছে, ধীর-মন্থর অথচ নিরুদ্‌বেগ গতিতে, সরল থেকে জটিল যাত্রা, ছোটো-ছোটো অধ্যায়ের সাহায্যে। সম্পদ কাকে বলে, আয় কাকে বলে, ক'রকমের আয় হ'তে পারে, পুঁজির রূপ কী, আয়ের সঙ্গে পুঁজির সম্পর্ক, বিনিয়োগের প্রকৃতি, বিনিয়োগের শুভংকরিতা, বিনিয়োগ ও প্রাকরণিক প্রগতি, প্রাকরণিক প্রগতির প্রকৃতিফের ও

ফলাফল, পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ক। তারপর ক্রমে-ক্রমে বিশ্লেষণ আরো গভীরতায় গিয়ে প্রবেশ করেছে: শ্রেণীসম্পর্ক ও প্রগতির পারস্পরিক অভিঘাত; বিদেশী বাণিজ্য; লগ্নি ও লগ্নির হার; জমি কর ও পুঁজির সম্পর্ক, ইত্যাদি অনেকবিধ আনুষঙ্গিক প্রশ্ন শ্রীমতী রবিনসন আলোচনা করেছেন। সব শেষে, প্রচলিত নানা মতবাদ ও তত্ত্বের গহনে ঢুকে দেখতে চেষ্টা করেছেন জাতীয় প্রগতির, তথা সঞ্চয়ের সমস্যার প্রসঙ্গে এদের কোনো সংস্থান আছে কিনা।

আবার বলতে হচ্ছে, গ্রন্থটির প্রধান গুণ পরিচ্ছন্নতা; প্রগতির সূত্রগুলো প্রথাগত ধনবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ ও পরিভাষার সাহায্যে খুলে মেলা হয়েছে, পুরোনো চিন্তায় যাঁরা চির-অভ্যস্ত, তাঁদেরও, অন্তত বোঝবার মুহূর্তে, হোঁচট খেতে হবে না। বিশেষ ক'রে ছাত্রদের পক্ষে তাই এ-বই পরম আদরণীয় হবে।

তা হ'লেও কয়েকটি আপত্তির কথা উল্লেখ করতেই হয়। ভূমিকাতে শ্রীমতী রবিনসন বলেছেন, তাঁর বিশ্লেষণের প্রস্থানভূমি কেইন্‌সের *General Theory*-র সূত্রগুলি থেকে। এমন উক্তি তিনি এর আগে *Theory of Interest and other Essays*-এও করেছেন, কিন্তু কোন্ অর্থে? মুগ্ধ ছাত্রছাত্রীবা যতই বলুন না কেন, কেইন্‌সের তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ-প্রকরণের দীর্ঘকালিক সম্প্রসারণ সম্ভব নয়, খোল-নল্‌চে বদলে ফেলতে হয় তা হ'লে। স্বীকার করতে না চাইলেও, শ্রীমতী রবিনসন অনেক বেশি উপকার পেয়েছেন ধ্রুপদী মনীষীদের রচনা পুনঃপঠনে, এমনকি মিকাল কালেস্‌কি প্রমুখ অনেক সমকালীন কন্টিনেণ্টাল ধনবিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুধাবন ক'রে। এমন অনেককিছু যা তাঁর কাছে অত্যন্ত অভিনব ব'লে মনে হয়েছে, গণিতের সাহায্যে তা অনেক আগেই জার্মানী অথবা হল্যাণ্ড কি ফ্রান্সের ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে গেছে।

আরেকটি কথা: সারা বইতে মার্কসের নামোল্লেখ নেই কোথাও, অথচ ধ্রুপদী ধনবিজ্ঞানের সারাৎসার উনবিংশ শতকে একমাত্র মার্কসের রচনাতেই অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ নিয়ে বেঁচে থেকেছে; আর্থিক

প্রগতির সামগ্রিক সমস্যার কোনো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ—সে বিশ্লেষণের প্রবণতা ও সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন—আজ পর্যন্ত একমাত্র *Das Kapital*-এই বিধৃত হয়ে আছে। এটা নিঃসংশয় যে, শ্রীমতী জোন রবিনসন তাঁর মার্কসের উপর পড়াশুনা থেকেও প্রভূত উপকার পেয়েছেন ; কিন্তু সে-ঋণের স্বীকৃতি এড়িয়ে যাওয়াকে স্নবারি ছাড়া কী বলবো।

তা ছাড়া, জোন রবিনসনের আগেও *Accumulation of Capital* হুবহু এই একই নামে আরেকজন মহিলা একটি মূল্যবান বই লিখেছিলেন : তিনি রোজা লুক্সেমবার্গ। সে-বইয়ের এক বিশেষ সংস্করণে শ্রীমতী রবিনসন একটি ভূমিকাও লিখেছিলেন। মাত্র কয়েক বছরের কথা তা। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে মাত্র একটি পাদটীকায় রোজা লুক্সেমবার্গের উল্লেখ সারা হয়েছে, যদিও, শ্রীমতী রবিনসন নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, বিশেষ ক'রে বহির্বিনিয়োগের প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তা শ্রদ্ধাশীলতার সঙ্গে অধ্যয়ন করা উচিত।

১৯৫৭

The Accumulation of Capital. By Joan Robinson. Macmillan & Co., London. 15s.

২

ডীন জনসনের মতো, অধ্যাপক পল বারানের সংস্থানও বিস্ময়দ্যোতক। গত দশ-বারো বছরের রাজনৈতিক ঝড়ঝাপ্টা তাঁকে আধ্যয়নিক তদ্গতি থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভবত তিনিই একমাত্র মনীষী মার্কসীয় পরিপন্থায় আস্থা সত্ত্বেও যাঁকে আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবহারিক ক্ষতি সইতে হয়নি। যেখানে পল সুইজী পর্যন্ত হার্ভার্ডের উদারচরিতমণ্ডলী থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছেন, সে-অবস্থায় অধ্যাপক বারান কোন্ মন্ত্রবলে একটি অভিজাত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থিতচিত্তহৃদয়ে বহাল হয়ে

আছেন তা নিশ্চয়ই একটি ছোটোখাটো গবেষণার বিষয় হ'তে পারে। তিনি শুধু যে স্বীয় জীবিকা কোনোক্রমে অটুট রেখে গেছেন তাই নয়, মার্কসীয় চিন্তার শাখা-প্রশাখায় উন্মুক্ত নিকুণ্ঠায় ভাবনা-অনুভাবনাদের বিস্তার করতে সফল হয়েছেন পর্যন্ত, তার প্রমাণ তাঁর সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ *The Political Economy of Growth*।

গ্রন্থের নামকরণ লক্ষণীয়। ধনবিজ্ঞান এক-দশকের পরিসরে নতুন অভিধা শিখেছে। ডোমার-হ্যারডের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত, ইতস্তত-চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলীতে সামগ্রিক সংস্থার প্রগতি নিয়ে যে আলোচনার শুরু, তা এখন প্লাবনের তীব্রতায় অন্ত-সমস্ত বিষয় ও সমস্যাদিকে পুরোপুরি ভাসিয়ে নেওয়ার উপক্রম করেছে। নানা খুচরো আলোচনা-বিতর্কের কথা ছেড়ে দিলেও, আর্থিক প্রগতির কাঠামো ব্যাখ্যা করা অন্তত দুটো উল্লেখযোগ্য বই গত তিন-চার বছরের মধ্যে পেয়েছি : আর্থার ল্যুইসের *Theory of Economic Growth* ও শ্রীমতী রবিনসনের *Accumulation of Capital*। এই বই-দুটোর অন্তর্বর্তী চরিত্রগত পার্থক্য অবশ্য যথেষ্ট : ল্যুইস অর্থনৈতিক প্রগতিকে ইতিহাস, ভূগোল, ধর্মচর্চা, আচারকলা, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি অনেক অনুভূমিকার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখেছেন ; নিছক ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বকথা সামান্য, তাঁর চিন্তার বিস্তারে পরিষঙ্গই প্রধান ; অন্য পক্ষে, শ্রীমতী রবিনসন প্রগতির প্রক্রিয়া-প্রণালী নিয়ে নিমগ্ন থেকেছেন এবং সেজন্যই বিনিয়োগের সর্বমুখী সমস্যাই তাঁর গ্রন্থে প্রধান ব্যাপ্তি পেয়েছে।

বারানের প্রব্রজ্যা আরেক অন্বিষ্টে, প্রগতির *political economy* বিশ্লেষণ তাঁর প্রায় একমাত্র লক্ষ্য। এ-ধরনের আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজনপূর্ণ। ল্যুইসের সর্বাচ্ছাদনী নামাবলী থেকে কী ক'রে যেন রাজনীতি বাদ পড়ে গেছে, আর্থিক প্রগতির বিবর্তনে রাজনীতির অঙ্গুলিহেলনের ঈষদাভাস পর্যন্ত অনুপস্থিত। শ্রীমতী রবিনসন শুধুমাত্র বিনিয়োগের ব্যাকরণ বিশ্লেষণেই আগ্রহ দেখিয়েছেন, সুতরাং তাঁর বইতেও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত। অথচ ভেবে

দেখলে ধ্রুপদী ধনবিজ্ঞানের প্রাথমিক সোপানে রাজনীতির অভিভাব এবং প্রত্যক্ষতা সম্বন্ধে আলোচনা মোটেই অবরুদ্ধ থাকেনি : এ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর অর্থনৈতিক সূত্রগঠনে রাজনীতির ফিসফাস কণ্ঠস্বর খুঁজে পাওয়া সম্ভব, মার্কসের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম।

অতএব বারানের বিষয়নির্বাচনে যুক্তির অভাব নেই। বলা বাহুল্য, তাঁর আলোচনার কাঠামো মার্কসীয় সংস্থানে দাঁড় করানো। ব্যক্তিগত প্রবণতার কথা ছেড়ে দিলেও, এই পছন্দের অন্য দিক থেকেও সমর্থন সম্ভব। আজ পর্যন্ত একমাত্র মার্কসীয় অভিধানেই আর্থিক বিবর্তনের রাজনীতিগত ব্যাখ্যা সম্ভব, অন্য-কোনো চিন্তার অনুশাসন গ'ড়ে তোলার চেষ্টা প্রায় অনারুদ্ধ। তাই মনে হয়, যদি কেউ ঠিক এদিক থেকে প্রগতির মর্ম-বিশ্লেষণে এগোন, তাঁকে মার্কস্ থেকে যাত্রা শুরু করতে হবে : হয় মার্কসকে খণ্ডন ক'রে এগোতে-এগোতে নতুন দিঙ নির্দেশ মিলবে নয় তো মার্কসীয় সত্তার চারপাশে নতুন স্থাপত্য যোগ করতে-করতে।

বারানের বিশ্লেষণ সম্বন্ধে নানা মহল থেকে যে আপত্তি হয়তো উঠবে তার কারণ এই যে, অনেকেরই মনে হবে নতুন তথ্য জড়ো করা হয়েছে যদিও প্রচুর, মার্কসকে ছাড়িয়ে তেমন-কোনো চিন্তার যোজনা নেই সারা বইতে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ই বড়ো-বেশি প্রথাগত, যেন বহুবার-পঠিত বস্তু আরেক বার পরিবেশন করা হচ্ছে, মাত্র অন্য বাসনে গরম ক'রে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পাম দত্ত যা লিখেছেন, বারান তাই কি আরো-একটু বিস্তৃত ক'রে সাধারণ তত্ত্বে দাঁড় করিয়ে বলছেন না ?

অথচ তাঁর বলবার ভঙ্গি, এবং আলোচনা-সাজানোর বিন্যাস, চিত্তগ্রাহী। প্রথমেই প্রগতির সমস্যার চমৎকার বিবরণ, তার পর surplus—যা প্রগতির কেন্দ্রশক্তি—তার আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে একটি মূল্যবান আলোচনা। এই অধ্যায়টি শ্রীমতী রবিনসনের বইয়ের মুখবন্ধ হিশেবে জুড়ে দিলে আমার বিবেচনায় নিখুঁত যোটক হয়, বারানের বিশ্লেষণ এতই প্রাসঙ্গিক এবং পরিপূরক। পরবর্তী

আলোচনা প্রায় ছক-কাটা। দুটো পরিচ্ছেদ Standstill and Movement under Monopoly under Capitalism-এর উপর ব্যয়িত হয়েছে; চর্বিতচর্বণের প্রাচুর্য এখানে একটু বেশি। পরের অধ্যায় On the Roots of Backwardness: শিল্পাগ্রসর দেশগুলির প্রসঙ্গ পেরিয়ে এখানে আলোচনা দরিদ্রতর ও দরিদ্রতম দেশগুলির সমস্যায় পৌঁছেছে। এ-সমস্ত দেশের—এশিয়া, আফ্রিকা, লাটিন আমেরিকা, এমন কি দক্ষিণ ইওরোপের 'অনুন্নত' রাজ্যগুলি পর্যন্ত বারানের দৃষ্টির বাইরে নয়—আর্থিক দৈন্যের পরিচিত কারণগুলি একসঙ্গে জড়ো করার চেষ্টা করা হয়েছে এ-অধ্যায়ে, এবং সেই সূত্রে পরের দুই পরিচ্ছেদে বারান একটি Morphology of Backwardness-এর খসড়া প্রস্তাব করেছেন। সব শেষে The Steep Ascent, এখানেও অবশ্য সমাধান হিশেবে সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষই ঘোষণা করা হয়েছে, এবং সে-ঘোষণায় প্রচলিত যুক্তিপ্রচয়ের বাইরে পরিভ্রমণ নেই।

তাই সব-মিলিয়ে গ্রন্থটি পাঠ ক'রে একটু হতাশার ভাব থেকেই যায়। মনে হয় *The Political Economoy of Growth*-এর প্রধান মূল্য নির্ণয় করবে অন্তর্ভুক্ত তথ্যাদি, তত্ত্ব নয়। বিশেষত ল্যাটিন আমেরিকার রাজ্যগুলিতে মার্কিন শোষণের যে-পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই বইতে জড়ো করা হয়েছে, তা অন্য-কোথাও পাওয়া ভার। এবং সে-কারণে প্রথম বিস্ময়েই ফিরে আসি: প্রতিক্রিয়ার শ্বাসরোধী আবহাওয়া সত্ত্বেও মার্কিন দেশে ব'সেই যে অধ্যাপক বারান এ-গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছেন, তজ্জন্য তাঁকে যেমন ধন্যবাদ, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়কেও সেই সঙ্গে। দুঃখের বিষয়, নামে যে-উত্তেজক আবিষ্কারের প্রতিশ্রুতি, গ্রন্থটির পঠনে তার ভগ্নাংশিক স্বাদও নেই। এই বিষয় নিয়ে উৎকৃষ্টতর বই লেখবার সুযোগ তাই এখনো অব্যাহত।

১৯৫৮

The Political Economy of Growth. **By Paul A. Baran. Monthly Review, New York. $ 5.00**

৬

মাইরন উঈনার কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলির কাঠামো বিশ্লেষণ ক'রে একটি বই লিখেছিলেন। মহৎ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বইখানা একদেশদর্শিতার দোষ থেকে মুক্ত হ'তে পারেনি: প্রধানত বাংলা দেশকে কেন্দ্র ক'রে গবেষণা করার জন্যই হয়তো, বামপন্থী টুকরো-টুকরো দলগুলি অনাবশ্যক বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল, অথচ তদ্‌সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে তেমন-কোনো অনুসন্ধানী মন্তব্য ছিল না।

উঈনার নতুন বই লিখেছেন এবার: প্রসঙ্গ গরিব দেশের রাজনীতি, মানে ভারতবর্ষের। এবার ঠিক রাজনৈতিক দলগুলির খতিয়ান লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, একটু তির্যক ক'রে আলোচনা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকরণের উপর প্রলম্বিত হয়েছে। বিষয়ী ছেড়ে এবার লক্ষ্য বিষয়. বিষয়ের বিন্যাস-বিভূষণ-বিমোচন। অভাবের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি কত রকম হ'তে পারে, অভিব্যক্তির প্রকাশ কত ভিন্ন রূপ নিতে পারে, সে-সব নিয়ে স-উদাহরণ জল্পনা দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে সংবিধানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার উজ্জ্বল স্বীকৃতি, সুতরাং, অন্য যতই অভাব থাক, অভাবের বিরুদ্ধে উচ্চগ্রামে প্রতিবাদ জানাবার সুবিধে-সুযোগের অভাব নেই। এই প্রতিবাদের পরিভাষা এবং পরিষঙ্গ নিয়ে আলোচনা করাই *The Politics of Scarcity*-র উদ্দেশ্য।

১৯৪৭ সালের পর থেকে সমুদ্রশান্তি আজ পর্যন্ত ভারতবাসীদের ছুঁয়ে যায়নি। অনেক রকম কলরোল, অভাব-অভিযোগ, মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, শরণার্থী সমস্যা, জনসংখ্যাবৃদ্ধিহেতু নানাবিধ নাগরিক উৎকণ্ঠা-অসুবিধা। অন্য পক্ষে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ছিটেফোঁটা প্রসাদ নিয়ে কাড়াকাড়ির সমস্যা: সেচের জল চাই, স্কুল-হাসপাতাল আমার গ্রামে বসবে, সিমেণ্ট চাই-লোহা চাই-কয়লা চাই। এবং

করবৃদ্ধি চাই না, ট্রাম-বাসের ভাড়া কেন বাড়বে, স্কুলের মাইনেই বা কেন। গ্রামাঞ্চলে জমিদার-ভাগচাষী-মজুরচাষীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব; কলকারখানায় শ্রমজীবীদের দাবিদাওয়ার সততনির্ঘোষ। তা ছাড়া, স্বাধীনতার যেহেতু কোনো আপাতগণ্ডিরেখা নেই, কিছু চুপিসারে, কিছু প্রকাশ্যে ব্যাবসায়ীমালিকপক্ষও স্বার্থ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির তাগিদে সরকারের উপর চাপ দেওয়ার চেষ্টা থেকে আদৌ বিরত নন।

সব-মিলিয়ে তাই, অন্তত গত বছর পর্যন্ত, দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক অশান্তি অব্যাহতই থেকেছে: কোনো প্রদেশে পরিমাত্রা কম, কোথাও হয়তো বেশি। ভাষাভিত্তিক প্রদেশগঠনের সমস্যা এই অশান্তির অনলে নতুন আহুতি জুগিয়েছে: মধ্যপঞ্চাশের বছরগুলিতে রাষ্ট্রশক্তির অনেকটাই অপব্যয়িত হয়েছে প্রদেশ পুনর্গঠনের যুক্তি-তর্ক-আবেগের গোলকধাঁধাঁর অন্ধকারে।

শ্রীযুক্ত উঈনারের মূল তত্ত্ব হলো যে ভারতবর্ষে যা হচ্ছে তার চরিত্রলক্ষণ যে-কোনো সদ্যস্বাধীনতালব্ধ দরিদ্র দেশে খুঁজে পাওয়া সম্ভব: যেহেতু সম্পূর্ণ ব্যক্তি-ও-গোষ্ঠী স্বাধীনতার আশ্রয়ে আমরা আছি, আমাদের সকলেরই চীৎকারের অধিকার, স্বার্থপ্রকাশের অখণ্ডতা। রাষ্ট্রশক্তিকে কান পেতে আমাদের দাবি শুনতেই হবে, কারণ একুশের ঊর্ধ্বে আমাদের সকলেরই ভোট আছে, এবং প্রতি পাঁচ বছরে আমরা সে-ভোট বজ্রস্বরূপ ব্যবহার করতে তৈরি। অভাব যেহেতু অজস্র, স্বার্থ যেহেতু বহুধা, সরকারকে তাই অহরহ টানাপোড়েনের মধ্যে থাকতে হয়। দেশ দরিদ্র, সর্বপ্রকারের দাবি এক সঙ্গে মেটানো সম্ভব নয়, এঁর স্বার্থকে একটু-বেশি জায়গা ছেড়ে দিলে ওঁর স্বার্থে টান পড়ে। এই অবস্থার পরিণাম গিয়ে দাঁড়ায় যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাই হোক, বা অন্য-কোনো সামান্যতর রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তই হোক, কোনো-কিছুর প্রয়োগেই প্রারম্ভিক অবৈকল্য অটুট থাকে না, সত্য-শিব-সুন্দর থেকে অবতরণ ক'রে অন্বিষ্ট হয়ে দাঁড়ায় কোন্ দলকে তোয়াজ আপাতত কোন্ রাজনৈতিক কারণে করা

প্রয়োজন, কোন্ প্রদেশের গলা কত ভারি, কাদের কতটা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সাহায্য করলে আশু বাড়তি ভোটের সম্ভাবনা, ইত্যাকার অনিত্য প্রশ্নের উত্তর। এই অবৈকল্যনাশ থেকে সর্বনাশের সূচনা, কারণ দেশের আর্থিক প্রগতির ক্ষিপ্র বেগ এ অবস্থায় ব্যাহত হ'তে বাধ্য, এবং জাতির নৈতিক মানেরও অপকৃষ্টতায় নেমে আসার আশঙ্কা।

সমস্যার এই ভাষণের সঙ্গে আমি নিজে মোটামুটি একমত। পুরোনো আদর্শ ধূসর হয়ে মিলিয়ে গেছে, নতুন-কোনো কুলকুণ্ডলিনী অন্তত সমগ্র জাতিকে নাড়া দিয়ে মাথা চাড়া দেয়নি, এখন আপাতত ক্ষুদ্র স্বার্থের সরীসৃপসঞ্চরণ, সেই সঙ্গে শ্রেণীবৈষম্যহেতু সংঘাতের বিস্তার। গেলো অক্টোবর থেকে যে-সামান্য নব-আলোড়ন এসেছিল, তা-ও এতদিনে প্রায় থিতিয়ে এসেছে: আমাদের সমস্যা মামুলি স্বার্থের বিন্যাস অতিক্রম ক'রে কোনো নীলিমাঅনুরাগঘন আকাশে ব্যাপ্তি পায়নি।

সমস্যার সমাধানের ইশারা শ্রীযুক্ত উইনারের গ্রন্থে নেই, থাকতেও পাবে না। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক দিনলিপি ইদানীং এতই অস্থির যে পূর্বপ্রত্যয় মূল্যহীন। *The Politics of Scarcity*-তে বিশেষ ক'রে যা বিবৃত হয়েছে তা জোট-এবং-ঘোঁট পাকানোর সাংগঠনিক ও প্রাকরণিক কলাকৌশলের উপর। উইনার ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক সংস্থা, ব্যবসায়ী সংস্থা, নাগরিক সভা, শ্রেণী ও ধর্ম সংস্থা ইত্যাদির কিছুটা ঐতিহাসিক, প্রধানত সাম্প্রতিক, কর্মধারার আলোচনা করেছেন। মুশকিল হলো লেখকের প্রথম বইতে যা প্রধান স্খলন ছিল, এই গ্রন্থেও তার পুনরাবৃত্তি: উইনার বাঙালিভক্ত মানুষ, ভূমিকাতে খুব সুন্দর ক'রে সেই ভক্তি নিবেদন করা হয়েছে। কিন্তু বাংলা দেশের রাজনীতি সারা ভারতের আবেগধারার নিখুঁত প্রতিবিম্ব নয়, লেখকের অনেক মন্তব্য-সিদ্ধান্তই তাই একটু একপেশে। বিশেষত যে-তিনটি অধ্যায়ে ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনের প্রকরণ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলিতে

বাংলা দেশের বাইরের ভারতবর্ষ প্রায় অনুপস্থিত। এমনকি শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের লীলাকলা বিশ্লেষণ পর্যন্ত কলকাতার সংস্থাগুলিকে কেন্দ্র ক'রে, অথচ কে না জানে গত দশ-পনেরো বছরে ব্যবসায়ীমহলে যে-সব উৎকীর্ণ সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাদের উৎস এবং অন্ত দুই-ই কলকাতাকে পাশে ফেলে রেখে।

তা ছাড়া, যতরকম জোটই আমাদের দেশে পাকানো হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় এসে তাদের চারিত্র্যসমন্বয় ঘটে: প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দল সর্বপ্রকার সংস্থাগঠনের সহায়তা ক'রে আসছে, এখনো করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। সাময়িক স্বার্থ, শ্রেণীগত স্বার্থ, ভাষাগত স্বার্থ সব-কিছুর দুই তীর জড়িয়ে উদ্‌বেলিত গোষ্ঠীমাত্রেই আসলে রাজনৈতিক দলগুলির উপর জীবননির্ভর; সুতরাং দ্বন্দ্ব-সংঘাত-শত্রুতা-কলহ বিশ্লেষণ ক'রে উপান্তে পৌঁছনো কংগ্রেস-কমিউনিস্ট পার্টি-জনসংঘ-দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজগম প্রভৃতির টানাপোড়েনে।

এবং এখানেই শ্রীযুক্ত উঈনারের ব্যাখ্যার মস্ত দুর্বলতা। যে-কোনো দ্বন্দ্বরই দুই পক্ষ: লোকেরা জোট বাঁধে কারণ প্রতিপক্ষকে হটাতে চায়, নিজেরা প্রতিহত না-হয়ে বিরোধী পক্ষকে পর্যুদস্ত করতে চায়। এটা বলা ভুল হবে এই মুখোমুখি বোঝাপড়ায় আমাদের দেশে, গত পনেরো বছরের ইতিহাসে, সরকার মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ-ভূমিতে স্থিত থেকেছেন। রাষ্ট্রশক্তি সর্বদাই কংগ্রেসের কোনো-না-কোনো উপদলের হাতে অর্পিত থেকেছে, এবং ইত্যাকার উপদলগুলি নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ আদৌ ভুলে থাকেনি। কিছু-কিছু লোক তাই ষড়যন্ত্র করেছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের স্বার্থে নিয়োগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে, অন্য-কিছু লোক চেয়েছে রাষ্ট্রশক্তির এবংবিধ ব্যবহার বন্ধ করতে।

শেষ পর্যন্ত তাই শ্রেণীস্বার্থের রাজনীতিতেই ফিরতে হয়, অবশ্য যদি এটা মানা হয় যে আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি মোটা-মুটি শ্রেণীবিভাজনে প্রত্যয়শীল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তো যা মনে

হয় আসলে তা নয়। শ্রীযুক্ত উঈনারের গ্রন্থে, বলতেই হয়, শেষ পর্যন্ত সে-রকম কোনো বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার দ্যোতনা নেই।

১৯৬৩

The Politics of Scarcity By **Myron Weiner. Asia Publishing House, Bombay. Rs. 18·00.**

৪

অপ্রিয়ভাষণ হবে, কিন্তু কথাটি বলতেই হয়। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান অপ্রতিষ্ঠিত। এমন কি সমাজতত্ত্বও নেই। বৈজ্ঞানিক শৈলী পাশে ফেলে রেখে, অন্বীক্ষিক বিচার বাদ দিয়ে, নিছক অনুভূতির ভিত্তিতে কোনো তত্ত্বের বর্ণনা সম্ভব। কিন্তু সেরকম কিছুও সমাজ-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত এদেশে চোখে পড়েনি। ইংরেজি sociology শব্দটাকে ব্যবহার ক'রে নিয়ে অনেকরকম আলোচনা-বিবরণ অবশ্য চলছে, কিন্তু সে-সমস্ত অধিকাংশই প'ড়ে অন্নদাশঙ্করের ছড়া মনে আসে : 'শ্রীমান সমরেশ সেন পড়েছি যা লিখেছেন ; মনে হয় সমরেশ সেন লিখেছেন যা পড়েছেন'। বিদেশী পণ্ডিতদের বই থেকে লম্বা উদ্ধৃতি, অকারণে কটমট শব্দকণ্ডুয়ন, সোজা জিনিশকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলা, আমেরিকা বা ইওরোপে একেবারে হালে যে-ধরনের তত্ত্বচর্চা হচ্ছে তা মোহমুগ্ধ আত্মসাতের প্রবণতা। আর তা না হ'লে স্রেফ কতগুলি ফিরিস্তি : ঐ অঞ্চলে অমুক গ্রামে এই-এই শ্রেণীর লোকের বাস, তাদের জীবিকা ক, তাদের ধর্ম খ, তারা মদ খেতে ভালবাসে কি বাসে না, তাঁদের স্ত্রীলোকেরা বহুগামী কি বহুগামী নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বর্ণনামালাকে আর যা-ই হোক বিজ্ঞানচর্চা বলা চলে না। এবং একই রকম বর্ণনার পুনঃপৌনিকতা থেকে সন্দেহ হয় করণীয় অন্য-কিছুর অভাবে খই ভাজা হচ্ছে।

সম্প্রতি আরো-একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ধনবিজ্ঞানে গণিতের প্রয়োগ, বিশেষ ক'রে গত কুড়ি বছরে, প্রচুর ব্যাপ্তিলাভ করেছে। এটা ঘটেছে ভিতরকার তাগিদেই : ধনবিজ্ঞান পরিশীলিত হ'তে-হ'তে এমন-এক স্তরে পৌঁছেছে যেখানে সূক্ষ্মতম শৈলীপ্রয়োগের উপযোগিতা অনেক। অতএব গণিতে প্রব্রজ্যা : ধনবিজ্ঞানের এই অবস্থায় জিজ্ঞাসার সূত্র শাণিত করতে যেমন গণিতের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন, সূত্রের প্রমাণসন্ধানেও সেই একই প্রয়োজন। কী বিদেশে, কী আমাদের এখানে, সমাজচর্চার অনুরূপ অবস্থায় পৌঁছুতে এখনো অনেক বাকি : অতটা সূক্ষ্ম পরিশীলন সমাজ-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে আদৌ সম্ভব কিনা তা নিয়েও অনেকের মনে নানা প্রশ্ন আছে। কিন্তু ইতিমধ্যে —সবিনয়েই বলছি -যে-ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারা সমাজচর্চা করেন, তাঁদের অনেকেই, মনে হয়, হীনমন্যতায় ভুগছেন। ধনবিজ্ঞানের লোকগুলি কেমন কসরত দেখাচ্ছে, এ-অবস্থায় আমরা যদি কিছু না-করি তা হলে আর মান থাকবে না : এবংবিধ স্বগতসিদ্ধান্তের ফলে সমাজতত্ত্ব পড়িয়ে থাকেন, কিংবা এ-বিষয়ে বই লিখে থাকেন, কতিপয় এমন-কেউ নিজেদের হাস্যকর ক'রে তুলছেন ; তাঁরাও, সম্ভবত গণিতের বিন্দুবিসর্গ না-জেনেই, সমাজতত্ত্বের ফাঁকে-ফাঁকে অঙ্কের কেরামতি দেখাবার চেষ্টা করছেন। ধনবিজ্ঞানে যা এসেছে আপন তাগিদে, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা চলছে নেহাত লোক-দেখানো ভড়ং হিশেবে। ফল যা দাঁড়াচ্ছে তা না অঙ্ক, না সমাজতত্ত্ব, এমনকি ভড়ং হিশেবেও তা শোকাবহ।

আলোচ্য বইটি হাতে পেয়ে এতগুলি রূঢ় কথা বলতেই হলো। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে উৎসর্গিত এই বই, তাঁর কিছু ছাত্র এবং অনুরাগীরা মিলে প্রকাশ করেছেন, দেশী-বিদেশী অনেক পণ্ডিত-মনীষীর রচনা জড়ো ক'রে। না-ব'লে পারছি না, বইটি তাঁর হাতে পড়লে ধূর্জটিপ্রসাদ অবধারিত লজ্জা পেতেন। আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি বিশেষ দিক বইটির ব্যবস্থাপনায় ফুটে উঠেছে। বেশ-কিছু বিখ্যাত ব্যক্তির রচনা সংগ্রহ করা হয়েছে, কিন্তু বইটির

নামে যে-বিষয়ের প্রতিশ্রুতি, বিখ্যাতদের কাছ থেকে ভিক্ষে-করা প্রবন্ধগুলির অনেক ক'টির সঙ্গে তার আদৌ সম্পর্ক নেই। তবু, নামী লোকদের লেখা বাদ দিয়ে বই বের করলে বাজারে হয় তো মান থাকে না, তাই এ-ধরনের চয়ন। পাঁচটি খণ্ডে প্রবন্ধগুলিকে বিন্যস্ত করার চেষ্টা হয়েছে : (ক) Towards a Sociology of Culture in India, (খ Sociology of Culture and Civilization, (গ) Cultural Change and Elite in India, (ঘ) Socio-Cultural Planning and Development, Theoretical Perspective, এবং (ঙ) Socio-Cultural Planning and Development : Processes and Problems in India. তা ছাড়া মুখবন্ধ হিশেবে চলাপতি রাওয়ের, এবং সমাপ্তিতে মুল্‌করাজ আনন্দের, ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ। গোস্তাকি মাপ করতে হয়, মধ্যবর্তী পাণ্ডিত্যের প্রকোপ এড়িয়ে দু'পাশের এই দুই প্রবন্ধই বইটিতে আমার সব চেয়ে সুখপাঠ্য মনে হলো। তত্ত্বের দুরূহ চর্বণ নেই, ভারি-ভারি শব্দ নেই, গম্ভীর-বিশাল উদ্ধৃতি নেই, ভালো, ঝরঝরে ইংরেজিতে ধূর্জটি-প্রসাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের নানা দিক নিয়ে ভালবাসা-জড়ানো আলোচনা।

হায়, এ-দুটো প্রবন্ধের মতো স্বচ্ছতার সঙ্গে যদি সমাজচর্চায় পণ্ডিত ভদ্রমহোদয়-মহোদয়ারা লিখতেন! প্রবন্ধগুলিকে পাঁচটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু সাজানোর মধ্যে আমি কোনো পরম্পরা-সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারলাম না, বিভিন্ন খণ্ডের নামকরণেও তেমন-কোনো যুক্তির স্বাক্ষর নেই। ভারতবর্ষে sociology of culture বস্তুটা কোন্ পর্যায়ে এসেছে, যাকে বলা হয় cultural anthropology—অথবা বিকল্পে social anthropology,—তার সঙ্গে সমাজচর্চার এই বিশেষ বিভাগটির তফাত কোথায়, মিলই বা কোথায়, আমি বুঝে উঠতে অপারগ হলাম। বেশির ভাগ প্রবন্ধেই উদ্ধৃতির দুর্গম অরণ্য, হাইফেন-যুক্ত শব্দমালার অত্যাচার, অন্বীক্ষার বল্‌গাবিহীন অতিকথন, কোন্‌টা উপপাদ্য-কোন্‌টা সম্পাদ্য-কোন্‌টা

প্রতিপাদ্য তা আবিষ্কার করতে হিমশিম হ'তে হয়। ধূর্জটিপ্রসাদ অন্য-অনেক বিষয়ের সঙ্গে sociology of culture-সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করেছেন, লিখেওছেন; কিন্তু তাঁর লেখায় চাতুর্যের সঙ্গে তীক্ষ্ণতাও থাকতো, কী বলতে চাইছেন তা উদ্ধারের জন্য নৈয়ায়িকের স্মরণ নিতে হতো না কখনো। কিন্তু এই বইতে, বিশেষ করে দেশী যে-ক'জন পণ্ডিতের লেখা আছে, প'ড়ে অর্থোদ্ধার করা প্রায় অসাধ্য: হয় তাঁরা অন্যের বুলি কপচাচ্ছেন, নয় তো সন্ধ্যাভাষায় নিজেদের আচ্ছন্ন রাখছেন, নয় তো এক যুক্তি থেকে আরেক যুক্তিতে লাফিয়ে-লাফিয়ে বিহার করছেন, পাঠকদের প্রতি করুণাবশতও যে মাঝে-মাঝে একটা-দুটো সেতুর প্রয়োজন, তাঁদের সেটা কে বোঝাবে?

এই বাহারি পণ্ডিতপনার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ শ্রীযুক্ত শরণের The Faith of a Modern Intellectual। কথার উপর কেবলই কথা, কিন্তু কোনো কথাই গান হয়ে ওঠে না, কোনো অর্থই স্পষ্টবচনে ধরা দেয় না। ছেঁকে-ধরা, ঘিরে-থাকা, রুদ্ধশ্বাস পাণ্ডিত্য: অমুকের উক্তি থেকে উদ্ধার, তমুকের বক্তব্যকে তলোয়ারের ঘায়ে দু'টুকরো করা, কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা চংক্রমণের পর ক্ষুব্ধ হ'তে হয়, ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কে কবে বড়োলোক হয়েছে। তিন সম্পাদকের সম্মিলিত প্রয়াস প্রারম্ভিক প্রবন্ধটি সম্পর্কেও একই কথা: প্রায়-যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউটরিয়ল ক্লাসের জন্য লেখা ছাত্রের রচনা পড়ছি। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে সামাজিক প্রথা-আচারকলা-ব্যবহার-রীতিনীতি-ধার্মিক বিন্যাস কোথায় কী ভাবে বিবর্তিত হচ্ছে, এই বিবর্তনের উপচার-অধিকরণ কী-কী, এই বিবর্তন অধ্যয়ন করতে হ'লে কোন্ ধরনের শৈলীপ্রয়োগ বাঞ্ছনীয়, এ-সমস্ত নিয়েই চিন্তাভাবনা প্রয়োজন; অনুশীলন-অধ্যয়ন ছাড়া সমাজবিজ্ঞানের চর্চা এদেশে এগোতে পারে না; নতুন আধার নিয়ে মক্শো করতে-করতেই হয় তো একদিন চিন্তার বিকাশে দ্যুতি দেখা দেবে। কিন্তু বর্তমান বইতে সে-রকম অনুশীলনের কোনো পরিচয় নেই, পথের ঈষৎ ইশারাও অনুপস্থিত।

এরই মধ্যে যা হোক আমার একটু ভালো লাগলো দক্ষিণ

গুজরাটের পাটিদার সম্প্রদায় নিয়ে শ্রীযুক্ত কাপাদিয়ার প্রবন্ধ, যে-প্রবন্ধের মস্ত গুণ অনাড়ম্বরতা। গুছোনো লেখা, তত্ত্বের ভণিতা নেই. প্রচুর তথ্য আছে, পাঠান্তে অন্তত বলা চলে যে কিছু জ্ঞান আহরণ করা হলো। মানি, অন্য-কোনো শাস্ত্রে—পদার্থবিজ্ঞান কিংবা ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে—এ-ধরনের প্রবন্ধ শাদামাঠা ব'লে বিবেচিত হবে: নিছক বর্ণনা, বর্ণনা পেরিয়ে কোনো বৃহৎ দর্শন বা উক্তির উত্থাপন নেই। কিন্তু পণ্ডিতম্মন্যতার চেয়ে অকপট সারল্য, অন্তত আমার কাছে, শ্রেয়, সকাল-সন্ধ্যা-দুপুর-রাত্রি যে-কোনো সময়ে শ্রেয়।

যে-বন্ধুরা সমাজবিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা-অধ্যবসায় করছেন, তাঁদের সামান্য-একটু অনুরোধ করবো। বৈজ্ঞানিক যুক্তি বাদ দিয়ে কোনো বিজ্ঞান গ'ড়ে উঠতে পারে না; সমাজতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতে চান, তাঁদের তাই সব চেয়ে আগে একটু পরিশ্রম ক'রে বিজ্ঞানসম্মত অন্বীক্ষার ব্যাকরণ শিখে নেওয়া দরকার। এই ব্যাকরণেরও অবশ্য রকমফের আছে: মার্কসীয় ব্যাকরণের সঙ্গে পশ্চিমের দেশগুলিতে প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতির ব্যবধান যথেষ্ট, কিন্তু রকমফের ছাপিয়ে যেটা প্রাধান্য পায় তা নিয়মের নিগড়, উক্তি এবং প্রমাণের মধ্যে ধাপ-মেনে-চলা যুক্তিসাধন। আমাদের দেশের সমাজতাত্ত্বিকদের প্রমথ চৌধুরীর ঘোষালের মতো কম কথা বলার আর্ট শিখতে হবে। আর শিখতে হবে যুক্তিসহ কথা বলার আর্ট।

একজন ধনবিজ্ঞানী, অধ্যাপক টিনবার্গেনের একটি ছোটো প্রবন্ধ কী ক'রে যেন এই বইতে ঢুকে গেছে: "Economic" Methods for Sociological Problems। আমার বক্তব্য খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে ব'লে অধ্যাপক টিনবার্গেনের সব শেষের বক্তব্যটি তুলে ধ'রে এই আলোচনায় দাঁড়ি টানছি:

Many sociological descriptions of the habits or other activities of some groups are not directly helpful in finding out the means to improve people's happiness. Sometimes the economist's

approach may suggest to the other Social Sciences subjects of research which are more relevant to our policy decisions than these sciences' own programs. Again this should not be seen, however, as an attempt to impose "economic" methods of thinking, but rather introducing more generally "operative" attitudes. The sense of urgency of the work to be done felt by development economists reflects the real urgency of so many needs of this world's population, The more this urgency is also felt by other social science workers, the better.

---

1. *Towards a Sociology of Culture in India : Essays in honour of Professor D. P. Mukherji.* Edited By T. K. N. Unnithan, Indra Deva, Yogendra Singh. Prentice Hall of India (Private) Ltd., New Delhi. Rs. 18·00.

অন্ধকারে রাত্রি লেপে যাক

ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, কিন্তু এখনো পাপপুণ্যবোধবিচ্যুত হ'তে পারিনি। ধূর্জটিপ্রসাদ গত হয়েছেন প্রায় চার বছর হ'তে চললো। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মনিযুক্ত তাঁর কয়েক জন প্রাক্তন ছাত্র এবং অনুরাগীরা মিলে স্থির করেন, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত কতিপয় প্রবন্ধ জড়ো ক'রে গ্রন্থ প্রকাশ হবে। ধনবিজ্ঞান-সমাজবিজ্ঞান-রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নানা মহল জুড়ে প্রবন্ধগুলির বিষয়ের বিস্তার হবে, লিখবেন এমন-কয়েকজন যাঁরা ধূর্জটিপ্রসাদকে খুব কাছে থেকে জেনেছিলেন, তাঁর মনীষা ও চরিত্রস্নিগ্ধতার সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছিলেন। কিন্তু, যা হয়ে থাকে আমাদের দেশে, এই প্রস্তাবিত স্মৃতিগ্রন্থের উদ্যোক্তাদের মধ্যে কিছুদিনের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে যায়; পাড়ার সার্বজনীন পুজো একটা ভেঙে যেমন দুটো হয়, ধূর্জটিপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষা উপলক্ষ্য ক'রে, তেমনি, সুতরাং দুটো প্রবন্ধসংগ্রহের সিদ্ধান্ত অচিরে গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় সংগ্রহটির উদ্যোগী হয়ে পড়েন রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁর আরেক প্রাক্তন ছাত্র-ও-অনুরাগীগোষ্ঠী।

এ-সমস্ত ব্যাপারগুলো ঘটে বছরতিনেক আগে। আমি তখন বিদেশে, দু'পক্ষ থেকেই আহূত হই প্রবন্ধ পাঠাবার জন্য, অন্যতম পক্ষ কিছু অর্থসাহায্যের জন্যও অনুরোধ জানান। বিবদমান দুই সুহৃদসম্প্রদায়ের মধ্যে সমব্যবধান বজায় রাখবার সংকল্পে বদ্ধপরিকর আমি, যাঁরা অর্থ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিই; অন্য পক্ষকে ভরসা দিই যথাশীঘ্র প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেবো।

বিদেশে ব'সেও প্রতিশ্রুতিদ্বয় স্বচ্ছন্দে রক্ষা করা যেত, তা তো হয়ই নি, দেশে প্রত্যাবর্তন করেছি দু-বছরের উপর হলো, কিন্তু এখনো পর্যন্ত না-পাঠানো হয়েছে প্রবন্ধ, না পৌঁছে দিয়েছি অন্য

পক্ষকে গ্রন্থপ্রকাশের সুবিধার্থ চাঁদা। ধূর্জটিপ্রসাদকে আমরা অনেকেই গভীর শ্রদ্ধা করতুম, অনেক পেয়েছি-জেনেছি-শিখেছি তাঁর কাছ থেকে, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ভক্তি-অনুরাগে কোনোরকম ফাঁকি ছিল বা আছে তা স্বীকার করা অসম্ভব, অথচ আজ পর্যন্ত প্রস্তাবিত ঐ স্মৃতিগ্রন্থদ্বয়ের একটিও প্রকাশিত হয়নি। আমার মতো আরো বেশ কয়েকজন কথা দিয়ে কথা রাখেননি, ঝগড়াঝাঁটি আরো গড়িয়েছে, বহু বিভঙ্গের মান-অভিমানের পালা। এতটা সময়ের ব্যবধানে, শেষ পর্যন্ত যদিই বা বই দুটো প্রকাশিত হয়, কিছুটা অবাস্তরতার প্রশ্ন নিশ্চিত এসে যাবে, অনেকেই হয়তো বলাবলি করবেন, কেমন-ধারা লোক এঁরা, এতটা গড়িমসি ক'রে পাঁচ বছর গড়িয়ে যাবার পর তাঁরা সময় পেলেন ধূর্জটিপ্রসাদকে তর্পণ করার !

এই অনুযোগ-কটুবর্ষণ অযৌক্তিক হবে না। আমরা যাঁরা এতটা কালহেলন করেছি, করছি, আমরা প্রত্যেকে কৃতঘ্ন। ঈশ্বর-ভক্তির মাপকাঠিতে পাপপুণ্যের হিশেবে মগ্ন হ'তে আমার আগ্রহ নেই, কিন্তু পাপ অত্যন্ত সহজবোধ্য অনুভূতি ; ধূর্জটিপ্রসাদের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানানোর উপলক্ষ্যে এ-ধরনের অবমাননার আয়োজন আমার বিবেচনায় পাপ।

পাপবোধের ক্ষমতা পর্যন্ত আমরা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি। অপরাধবোধের মধ্য দিয়ে খানিকটা পাপস্খালনের সুযোগ মেলে। ন'মাসে-ছ'মাসে বিবেক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, নিজের কাছে নিজেরই মাথা হেঁট হয়, নীরবে আমরা কৃতকর্মের জন্য মার্জনাভিক্ষা করি। এই স্বগত, নিভৃত মার্জনাভিক্ষা হয়তো সুবিধাবাদের অভিব্যক্তি, হয়তো নিছক মতলববাজ, অসাধু অবচেতনা নিজের কাজ হাসিল ক'রে মস্ত খুশি। কিন্তু এই আচরণ যদি অভিনয়ও হয়, তা হ'লেও অন্তত এটুকু বলা চলে, আর যা-ই হোক, আমার সামাজিক বিবেককে আমি এখনো উড়িয়ে দিতে শিখিনি, পাপে আমার ভয়, পাপ ঢাকবার জন্য তাই এখনো আমার ওষ্ঠাগত আকুলি, ক্ষমা চাওয়ার অভিনয় করি, কারণ আমি অপরাধ সম্পর্কে সচেতন।

কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে এই অপরাধচেতন পর্যন্ত বিলীয়মান বস্তু। বিবেক নিয়ে বিলাসিতা করার মতো সময় নেই আমাদের কারো, আমরা ব্যস্ত, সাফল্যের মগডাল থেকে পরের মগডালে আরোহণের কসরতে নিয়োজিত। আমাদের বাড়তি সময় নেই। অতএব বিবেক নেই, স্মৃতি নেই। ধূর্জটিপ্রসাদের স্মৃতি ভাঙিয়ে যদি এই মুহূর্তে আমার কোনো জাগতিক সুবিধা হয় তা হ'লে সময় খরচ করতে রাজি আছি, নইলে আর কেন অপচয়গত হওয়া। আমরা সবাই-ই ধনবিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে যাচ্ছি, ন্যূনতম ব্যয়ে উচ্চতম উপার্জনের সম্ভবপরতার গণিতে আমাদের অখণ্ড আগ্রহ। ধূর্জটি-প্রসাদ-আরাধনায় যখন সতেরো নয়া-পয়সা লাভেরও সম্ভাবনা নেই, তা হ'লে আর কেন।

হাওয়া বদলেছে, কালের প্রকৃতি এখন অন্যরকম। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে বাক্যব্যয় তাই অনেকের কাছেই অশোভন, প্রায়-প্রতিক্রিয়ালগ্ন কালক্ষেপণ ব'লে মনে হবে। তা ছাড়া, শাদামাঠা কোনো স্তুতিকাহিনী বর্ণনা খুবই জোলো লাগবে, এবং ধূর্জটিপ্রসাদ জোলো পদার্থ আদৌ পছন্দ করতেন না। বাংলা দেশে তাঁর পরিচয় সাহিত্যিক হিশেবে, 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর সুবাদে সেই পরিচয়ের শুরু, 'পরিচয়' পত্রিকার মারফৎ তা পরে ব্যাপ্তি পেয়ে থাকে। প্রবাসে থাকেন, পণ্ডিত অধ্যাপক, ক্ষুরধার বুদ্ধি, গানের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রায়ই একহাত লড়েন, দু-একটা 'মননশীল' উপন্যাস লিখেছেন যেগুলো প্রবন্ধেরই নামান্তর, তর্কে-গল্পে-আড্ডায় তুখোড়, ছুটিতে যখন কলকাতায় আসেন শৌখিন বুদ্ধিজীবীমহলে উজ্জ্বল উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ে; তা ছাড়া, বাঙালি হীনমন্যতার বিস্ময়বিস্ফোরিত প্রকাশ, কেমন চকচকে-ঝকঝকে ইংরেজি লেখেন পর্যন্ত; আশ্চর্যরকম সুপুরুষ, দীর্ঘ সুগৌর দেহ, দু' চোখে মেধা-বুদ্ধি-কৌতুকের দীপ্ত আভাস, অবঙ্কিম, প্রলম্বিত নাসিকা, এমনকি তার সামান্য সঞ্চালনেও যেন মনীষা উদ্যত হয়ে আছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে সুচারু পোশাক সম্বন্ধে মস্ত দুর্বলতা:

যে-কোনো পোশাকেই ধূর্জটিপ্রসাদকে মহিমাসম্পন্ন মনে হতো, ধুতি-চাদরে, ঢোলা-পাজামা লখনউই চিকণের কাজ-করা পাঞ্জাবিতে, নিখুঁত-কাটা ইওরোপীয় পরিচ্ছদে। তা ছাড়া, আদিবাস যদিও ভট্টপল্লীতে, আলাপে-আলোচনায়-বাগবৈদগ্ধ্যে কী অনায়াস সৌরমণ্ডল-অন্বয়, আচরণে-ব্যবহারে ঔদার্যের পরাকাষ্ঠা, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, প্রসঙ্গ থেকে অন্যতর প্রসঙ্গের ঠাসবুননে কেমন অবলীলাক্রম অভিগমন-আগমন। আরো যা, বাঙালি বুদ্ধিজীবীমন্যরা শ্রদ্ধার কাকলিতে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে আসতেন, ধূর্জটিপ্রসাদ সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করেন, তিনি বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের পুরোভাগে। আর কী চাই, ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা-অনুরাগ-কৌতূহলের মিশ্রসংযোগের পাত্র কানায়-কানায় উপচে উঠতো।

প্রায় তিরিশ বছর ধ'রে ধূর্জটিপ্রসাদকে শহুরে বাঙালিসমাজ এই শিরোনামায় চিনে এসেছে। এই বিশিষ্ট খ্যাতিযোগে তিনি মজা পেতেন। মজলিশি সামাজিক মানুষ, লোকে তাঁকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা করুক, এটা তিনি বেশ পছন্দ করতেন। লোকেরা আসুক, তাঁকে ঘিরে বসুক, একটু-একটু কফি পান করুক, একটু-একটু তাঁর এই প্রবন্ধটির, ঐ বক্তৃতাটির তারিফ করুক, এ-ধরনের দুর্বলতা তাঁর যথেষ্ট ছিল। অপাপবিদ্ধ দুর্বলতা, যাতে অহমিকার কোনো ছোঁওয়া ছিল না, যা করছি-বলছি-চিন্তা করছি তা আমি যাদের ভালোবাসি, পছন্দ করি, তারা অনুধাবন করছে, শুনছে, সমর্থন করছে, এই আনন্দআকুতিগত দুর্বলতা, যা বলা চলে লোকপ্রেমেরই গোত্রান্তর। আমার যা দেয়, তা উজ্জ্বলতা, তা আমি অকৃপণ বিলিয়ে যাচ্ছি, তা তো আমার সামাজিক কর্তব্যের সামিল, তোমরা তা গ্রহণ করো। এই নিঃসংকোচ দর্শন আসলে তো যে-কোনো সৃষ্টিশীল শিল্পীর তদগত আদর্শ।

জীবনের শেষ কয়েকটি বছর রোগগ্রস্ত অবস্থায়, উৎকীর্ণ শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে তাঁকে কাটাতে হয়েছে। যে-উজ্জ্বলতা তাঁর ব্যক্তিত্বের ওঙ্কার, তার প্রকাশ নির্বাপিত ক'রে দুঃসহ সেই শেষের

কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বুদ্ধির উপলসংঘাতে যে-অজস্র কথারা চতুর্দিকে ছিট্‌কে বেরোতো—রাজনীতি-সমাজনীতির কথা, ধনবিজ্ঞানজড়িত কথা, কবিতার কথা, সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনার কথা, কখনো হয়তো বা দর্শনপ্রসঙ্গ, নয়তো সংগীততত্ত্ব, কিংবা চিত্রকলার কোনো সমস্যার সূত্র ধ'রে কথা, অন্য-কোনো মনোভঙ্গির মুহূর্তে শুধুই লোকঠকানো, লোকরাগানো, লোক-ভ্যাঙানো রঙ্গভরা কথা, মাঝে-মাঝে যা শুনতে-শুনতে মনে হতো হায়, যদি লিখে রাখা যেত, টুকে রাখা যেত, এই উদ্দামতার অপচয় যদি সামান্য-একটু সময়ের জন্যও সংহত ক'রে আনা যেত—, সেই অভিভূত কথা-বলা পর্যন্ত রোগের প্রকোপে ফিসফাস কাতরানিতে পরিণত হয়েছিল। তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে দিনের জাগ্রত সময়ে সর্বদা সিগারেট আবদ্ধ থাকত, বুদ্ধির সচ্ছল উর্ধ্বগামিতার প্রতিস্ব-রূপই যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উপরে উঠতো; সেই পরমপ্রিয় সিগারেটও তাঁকে পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কফি খেতে ভীষণ ভালোবাসতেন, লখনউর কফিহাউসে প্রতি সন্ধ্যায়, নয় তো রবিবারের সকালে, চারটে-ছ'টা টেবিল জুড়ে নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদকে ঘিরে আড্ডা বসতো, সেই বৈঠক একটু পরেই হয় তো ফের জমায়েত হতো তাঁর বাদশাবাগের বাড়িতে, নতুন ক'রে কফির সৌরভে স্নিগ্ধ হয়ে নিয়ে; শেষের দু'তিন বছর সেই কফি পর্যন্ত পান করতে পারতেন না, কণ্ঠনালীতে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধবশত ক্ষান্ত হ'তে হতো তাঁকে। স্তূপীকৃত বই, বসবার ঘর, পড়বার ঘর, শোবার ঘর উপচে যা রান্নাঘরে গিয়ে ঠেকেছিল, সেই বই থেকে পর্যন্ত তিনি প্রতিহত হয়ে ফিরতেন—মনোনিবেশে অসুবিধা হতো, জরাজীর্ণ ভগ্নদশা শরীর প্রতিবাদ জানাতো।

উজ্জ্বলতম ঋতু, প্রতিরুদ্ধ-পরিশ্রান্ত ঋতু, ধূর্জটিপ্রসাদকে এই দুই অবস্থাতেই কাছে থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর অত্যন্ত সন্নিকট স্নেহ দ্বারা সিক্ত হয়েছিলাম অনেকগুলি বছর ধ'রে। তাঁর স্নেহের বহিঃপ্রকাশেরও রূপান্তর হ'তে দেখেছি। যে-স্নেহ ছিল মুখচোরা,

ঘুরিয়ে-বেঁকিয়ে হঠাৎ আলতো ক'রে ঠেলে দিয়ে যা ব্যক্ত করতে পছন্দ করতেন প্রথম দিকে, সায়াহ্নসময়ে তা মোলায়েম অনুরাগ-কোমল হয়ে আসে। শুধু একটি স্মৃতিচিত্র এখানে উল্লেখ করবো, নিতান্ত ব্যক্তিগত হ'লেও করবো। বেশ-কিছুদিনের জন্য দেশ ছেড়ে চ'লে যাবো, তাঁকে লিখেছিলাম হাতে সময় কম, তাঁর সঙ্গে আলিগড়ে গিয়ে আর দেখা ক'রে আসা সম্ভব হবে না। দু-দিন বাদে ট্রেনে চেপেছি কলকাতা আসার জন্য, কলকাতা থেকে বিদেশের প্লেন ধরবো। সন্ধ্যার আবছায়ায় আলিগড় স্টেশনে দশ মিনিটের জন্য ট্রেন থামলো। চিৎকার-ভিড়-দুরন্ত শীতের ছেঁকে-ধরা নিবিড়-হয়ে-আসা কুয়াশা। কামরা থেকে বাইরে তাকিয়ে দেখি, কী ক'রে খবর পেয়েছেন, ধূর্জটিপ্রসাদ দাঁড়িয়ে আছেন, ঝুঁকে-পড়া-শরীর, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, সামনের দিকে ভালো ক'রে দেখতে পারছেন না, অস্ফুট দুটো কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে শ্লেষ্মার আক্রমণ। খুব স্পষ্ট মনে পড়ে না, হয়তো নিচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলাম, অসমর্থ শরীর নিয়ে ঐ শীতের মধ্যে এসেছেন তা নিয়ে হয়তো অনুযোগ জানিয়েছিলাম, প্রত্যুত্তরে ঠোঁটের কোণ দিয়ে হয় তো একটু স্নেহপ্রসন্ন আনন্দে হেসেছিলেন, কিছুই কথা বলা হয়নি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা, একটু বাদে ট্রেনের ঘণ্টা, এক-মুহূর্তের জন্য হয়তো আমার মাথায় একটু হাত রেখেছিলেন, আমার ট্রেনে উঠে-পড়া, ট্রেন চললো, সমস্ত ছায়া-ছায়া কুয়াশা, ধূর্জটিপ্রসাদ তখনো দাঁড়ানো।

আশঙ্কা হচ্ছে, অভিযোগ করা হবে, আমার প্রাগুক্তি সত্ত্বেও, আমি নেহাতই ব্যক্তিপূজা করছি ইতিহাসের—যে-কোনো, ইতিহাসের—বিচার-বিশ্লেষণে ব্যক্তির স্থান নেই, আমার উচ্ছ্বাসপনা সুতরাং শুধু বেমানানই নয়, তা অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক। আরো হয় তো বলা হবে, সমাজের বিশাল-জটিল বিবর্তনক্রমের প্রসঙ্গে কতটুকু মূল্যবান, কতটুকু ঐতিহাসিক তাৎপর্যসিঞ্চিত এক অধ্যাপকের জীবন, তাঁর মায়ামমতাদুর্বলতার বিবরণ, তাঁর অনুধা-প্রশ্ন-উৎসাহের বিশদ ব্যাখ্যা? বাংলা সমাজ-সংস্কৃতির দৈনন্দিন আয়নে-অন্বয়ে

ধূর্জটিপ্রসাদকে এখন যে অবান্তর মনে হয়, তাঁর উপন্যাস-প্রবন্ধাদি ইদানীং যে অপঠিত থেকে যায়, তাঁর নিকটানুরাগীরা পর্যন্ত পাঁচ বছরের মধ্যে যে স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশ ক'রে উঠতে পারেন না এ-সবই কি প্রমাণ নয় যে জনৈককে বাদ দিয়ে, নির্মম বিচারে অবহেলা ক'রে, তবে ইতিহাসের গতি, সে জনৈক যদি ধূর্জটিপ্রসাদ হন, তা হ'লেও ?

মানতে রাজি নই আমি, প্রতিক্রিয়া-আসক্তির অভিযোগের আশঙ্কা সত্ত্বেও নই। কারণ ধূর্জটিপ্রসাদের যে-পরিচয় সাধারণত উল্লিখিত হ তে শোনা যায় না, তা তাঁর ব্যক্তিত্বের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে, তা বিশেষ-এক পরিমণ্ডল, এমন-এক আবহ, যাতে জাদু-ছোঁয়ানো, যে-জাদু মুহূর্তের মধ্যে অন্য-এক আকাশের নীলিমা এনে দিতে পারতো। গ্রন্থপ্রিয় বুদ্ধিজীবী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কাতারে-কাতারে ছড়িয়ে আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন, প্রচুর পণ্ডিত লেখক একসঙ্গে দু'শোটা বিষয় নিয়ে গবেষণা করবেন, মোটা বই ছাপাবেন, বহু সমালোচক কবিতা থেকে রাজনীতি-ধনবিজ্ঞান পর্যন্ত টীকাবিস্তার ক'রে যাবেন। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ নিশ্চয়ই সমাজতন্ত্রের ইশারায় আস্থাশীল, অনেকেই ছাত্রবৎসল, সুহৃদ্‌প্রিয়, আড্ডাখানার প্রেমিক। কিন্তু অণুপরমাণু গুণের ভারাক্রান্ততার কষ্টিপাথরে ধূর্জটিপ্রসাদকে মাপতে যাওয়া বাতুলতা, এবংবিধ গুণাবলী ছাপিয়ে তাঁর মূল্যায়নের উপক্রমণিকা সম্ভব। আমি জাদু শব্দটি ব্যবহার করেছি, কিন্তু জাদুর প্রকৃতিবিশ্লেষণে অপারগ হবো। জাদু তা-ই যা সব-কিছু লেপে দিয়ে যায়, কোনো-এক সার্বিক সম্মোহনে পরিপার্শ্বকে আচ্ছন্ন করে। ধূর্জটিপ্রসাদের ক্ষেত্রে তার প্রচ্ছন্ন প্রকাশ হয় তো তাঁর জীবনযাত্রার ভঙ্গিমা, এমন-এক শৈলী যা বিশেষণের বাইরে, অথচ যা পরম মনোহরণপটিয়সী। এক সঙ্গে চিন্তার ঔদার্য ও চিন্তার বিস্তার; বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের স্বচ্ছন্দ সমন্বয়; অধ্যয়ন, আনন্দ, কৌতুকপিপাসা, এই তিনকে পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রতিভা; বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যুক্তির সুষমাকে যুক্ত ক'রে সশব্দে হেসে ওঠা; পাণ্ডিত্যের কূটকৌশলের সঙ্গে মানসিক সাধারণ

এলোমেলো বৃত্তিগুলি জড়ানো : ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর চল্লিশ বছরব্যাপী অধ্যাপনায় এ-সমস্তই দৃষ্টান্তিত করতে পেরেছিলেন। সে এক সময় ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়ে লখনউ শহরের অন্য-কোনো সত্তা চিন্তা করা যেতো না, এবং ধূর্জটিপ্রসাদকে বাদ দিয়ে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাবা যেতো না। বিশ্ববিদ্যালয় নামে যে-মুক্ত, বিস্তৃত, বহুস্তরসমৃদ্ধ, বুদ্ধিখচিত পরিমণ্ডলের আভাস, সে সব-কিছুই যেন ধূর্জটিপ্রসাদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে বিমূর্ত হতো, বিশ্ববিদ্যালয় মানেই 'যেন ধূর্জটি প্রসাদ। আচার্য-উপাচার্যের উপচার তুচ্ছ, কীটতম ছাত্রও মনে-মনে এটা অনুভব করতে পারতো বুদ্ধিজীবী হবার গৌরব-আনন্দ-পরিপূর্ণতাবোধ অমেয়, কারণ ধূর্জটিপ্রসাদ বুদ্ধিজীবীদের চূড়ামণি, এবং লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধির উচ্ছল প্রবাহের হেতু ধূর্জটিপ্রসাদ সেখানে অধ্যাপনারত। দশকের পর দশক ধ'রে লখনউ-র ছাত্র-সম্প্রদায় বুদ্ধির অনুশীলনে উদ্দীপ্ত হ'তে প্রয়াস করেছে, কারণ তাদের চোখে ধূর্জটিপ্রসাদের ঘোর।

আর যা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা ধূর্জটিপ্রসাদের উদ্‌গ্রীব সমাজ-জিজ্ঞাসা। নিজেকে কোনোদিন মার্কস্‌বাদী ব'লে জাহির করেননি, রঙ্গ ক'রে বলতেন তিনি মার্কস্‌তত্ত্ববিদ্‌। স্রেফ চেতনার আশ্রয়ে জীবনবোধের উপান্তে পৌঁছনো অসম্ভব প্রয়াস, কিন্তু তাঁর প্রয়াসে অন্তত কোনো স্খলন-বিচ্যুতি ছিল না। সমাজের বিবর্তন ইতিহাসের নিয়ম মেনে নিয়ে, ব্যক্তির বিকাশ সমাজের অনুশাসনের অঙ্গুলি-হেলনে, এই আর্য সত্যগুলি ধূর্জটিপ্রসাদ নির্দ্বন্দ্বচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু গ্রহণ ক'রেই ক্ষান্ত থাকেননি, তাঁর অধ্যাপনা-আদর্শের অঙ্গ ক'রে নিয়েছিলেন। বিদ্যার সঙ্গে সমাজবোধের অন্বয় না হ'লে জ্ঞানার্জন তুচ্ছ, রাজনীতি-সমাজনীতি বাদ দিয়ে অস্তিত্ব অসার, অপ্রাকৃতিক : প্রায় চল্লিশ বছর ধ'রে তাঁর ছাত্ররা এই উপলব্ধিগত হয়েছে। এই অর্থেই বলা চলে নিরালম্ব-শৌখিন অধ্যাপনাকে তিনি ইতিহাসের প্রয়োজনে নিযুক্ত করেছিলেন। সমীক্ষায় ধরা পড়বে, নানা দলে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত বর্তমানের অনেক

রাজনৈতিক নেতা তাঁদের প্রথম প্রত্যয়ের দীক্ষা নিয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে, তাঁর জিজ্ঞাসার-আদর্শের-আবেগের পীড়নে। অবশ্য, প্রথম যৌবনে বুদ্ধি যা-ই বলুক, শ্রেণীত্যাগের সংকল্প প্রায়ই ধোপে টেঁকে না, পরিপার্শ্বের নিঃশ্বাস এড়িয়ে সমাজবিপ্লবের আরক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে উদগ্র ভূমিকা নিতে গিয়ে আমাদের সমসাময়িক অনেকেই তাই পশ্চাদপসরণ করেছেন, কেউ-কেউ নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের অভ্যস্ত দুর্গে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কিন্তু তাঁদের অসাফল্যের দায়িত্ব তাঁদের একার, ধূর্জটিপ্রসাদকে তা স্পর্শ করবে না।

আপাতত আমরা নির্লিপ্ত, অধ্যাপনা করি, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমাদের নির্লিপ্ততা সঞ্চার ক'রে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে আসি। ধূর্জটিপ্রসাদের স্মৃতি যদি বেয়াড়া অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলে, অন্ধকারে রাত্রি লেপে যাক।

১৯৬৫

তা হ'লে কেন বুদ্ধিজীবী

জনৈক বুদ্ধিজীবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে আমার বক্তব্য শুরু করি। আমার নিজের কথাই বলছি। জনশ্রুতি, আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, প্রগতিপন্থী অধ্যাপক, এখানে-ওখানে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব-ও-আদর্শগত সমস্যার উপরে ব'লে থাকি, কখনো-কখনো লিখেও থাকি। সমাজবিপ্লব বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মুক্তি পরাহত, তর্কে-আলোচনায় প্রায়ই এই বিশ্বাস ব্যক্ত করি, নাবালক ছাত্রছাত্রী-দের বাহবা কুড়োই।

কিন্তু কতটুকু মূল্য এ-ধরনের বুলি-কপচানোর ? আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সমাজতন্ত্রের আদর্শের সামান্যতম ছোঁয়াও নেই। থাকি পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণে যা একদা শৌখিন সাহেবপাড়া ছিল—এখন পয়সাওলা মারোয়াড়ী-পাঞ্জাবী-অধ্যুষিত—এমন-এক নিভৃত রাস্তার চারতলার আরামদায়ক ফ্ল্যাটে, কাজ করি এমন-এক প্রতিষ্ঠানে যেখানে পড়ানোর সঙ্গে সচ্ছল মাইনের সহ-অবস্থান আছে, শহরে ঘোরাফেরা করি বিদেশ থেকে আমদানি-করা গাড়িতে। বছরে একদিনও ট্রামে-বাসে চড়তে হয় না আমাকে, দাঁড়াতে হয় না র‍্যাশনের লাইনে, ঠেলতে হয় না রেলস্টেশনের ভিড় কলকাতার বাইরে যখন অন্যত্র যেতে হয়, হাওয়াই জাহাজই প্রশস্ত। তাছাড়া প্রতি বছর দু'একবার দেশের বাইরে যাওয়া তো লেগেই আছে। মস্ত রেডিওগ্রাম, তদ্‌গত হয়ে ইওরোপীয় সঙ্গীত শুনি; শখ হ'লে পুরোনো কবিবন্ধুদের নিমন্ত্রণ ক'রে বাংলা কবিতার ঘোর অন্ধকার নিয়ে আলোচনা করি ; গঙ্গায়-মেঘনায়-যমুনায় জল বয়ে যায়

আমাকে মিছিলে দেখা যায় না, ময়দানের মিটিংয়ে দেখা যায় না, গা বাঁচিয়ে, অবসর-বিনোদনের আধার হিশেবে আমার সমাজতন্ত্রে আস্থা। কচিৎ-কদাচিৎ লিখে, অথবা মিহিন বক্তৃতা দিয়ে, আমার

সাম্যবাদী দায়িত্বের লীলা শেষ : সারগর্ভ সব প্রবন্ধ, উষ্মার ভারে টুইটুম্বর নানা বাণী। দেশ থেকে বড়োলোকদের ঝেঁটিয়ে তাড়াতে হবে, এই-এই শিল্লোদ্যোগ রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে, কৃষিক্ষেত্রে ঐ-ঐ মহাজনদের উপর কর বসাতে হবে ; মার্কিন দস্যুরা ভিয়েতনামে যে-পাশব তাণ্ডব শুরু করেছে, তার প্রতিবাদে সবাইকে সামিল হ'তে হবে ; ট্রামের ভাড়া বাড়ানো অবশ্যই অনুচিত ; ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার বক্তব্যে এবং জীবনযাত্রায় কোনো মিল নেই : সন্দেহ হয়, মনে আর মুখেও নেই। আমার প্রবাদিত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস হয় তো নিছক একটি অভ্যাস। কিশোর এবং তরুণ বয়সে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, পরীক্ষায় ভালো করার লোভে সে-বন্ধন আস্তে-আস্তে আলগা ক'রে আনি। তারপর এক কুড়ি বছর কেটেছে জীবিকার মান উপরে তোলার ধাঁধায়, সুবিধান্বেষণের অনেকগুলি অর্গল পেরিয়ে আপাতত ফের কলকাতায় স্থিত হয়েছি। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমেছে, বাইরের লোকের জানা নেই, চুপি-চুপি একটা-দুটো জমি কলকাতার আশেপাশে কেনা আছে, জাগতিক সম্ভোগের মগডালে ব'সে এবার নতুন ক'রে মনে হচ্ছে, সমাজতন্ত্র মন্দ জিনিশ নয়, একটা-দুটো প্রবন্ধ লেখা যাক। এবং, এমনই বাংলা দেশ, একটা-দুটো প্রবন্ধ লিখে ফেলতে পারলেই বুদ্ধিজীবী হিশেবে নাম হয়ে যেতে বাধ্য। অসাধু আমি, প্রবঞ্চক আমি, দুধ-ও তামাকে সমান আগ্রহবান আমি, সেই নামের বেসাতি করছি বিবেককে বিলাসব্যসনের নিচে চাপা দিয়ে। তবে এখনো বোধ হয় মাঝে-মাঝে চক্ষুলজ্জা থেকে ভুগি, গাড়ি হাঁকিয়ে সমাজতন্ত্রের সমস্যার উপর বক্তৃতা দিতে যাই, কিন্তু সভাক্ষেত্র থেকে খানিকটা দূরে গাড়িখানাকে দাঁড় করাই, তারপর বাকিটা পথ হেঁটে যাই।

নিজের কেচ্ছা গাইলাম এতক্ষণ ধ'রে, তার কারণ, অবিনয়ের মতো শোনালেও, বলতেই হয়, বাঙালি বুদ্ধিজীবীর এই স্বরূপটি শুধুই আমার একার নয় : আমার সমসাময়িক এ-রকম আরো অনেকে আছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়ে ছাত্র ছিলেন, আন্দোলন

করেছেন, স্লোগান চেঁচিয়েছেন, নতুন সমাজের নীলিমা-ছাওয়া গল্প-কবিতা লিখেছেন, ১৯৪৫-৫০ এর অন্তর্লীন বিপ্লবের ঘোর লাগা-বছরগুলিতে দু'একবার দু'এক সপ্তাহ ক'রে কারাবরণ করেছেন পর্যন্ত। কিন্তু কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই ; আমার মতোই, সবাই ভদ্র, সবাই সম্ভ্রান্ত। কেউ সদাগরি দপ্তরে বড়ো সাহেব, কেউ ব্যবসাতে ফেঁপেছেন, কেউ মস্ত সরকারি চাকুরে। পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণাঞ্চলে আমার কাছাকাছি থাকেন, ছেলেমেয়েরা ইংরেজি স্কুলে শাণিত উচ্চারণ ও মার্কিনি কেতা শিখছে, বাড়িতে বাংলাভাষায় কথা বলার পাট প্রায় উঠে যাওয়ার মতো, স্ত্রীরা অফুরন্ত বাড়তি সময় নিয়ে কী করবেন ভেবে পান না। মার্কেট থেকে মার্কেটা ্রে কেনা-কাটা করার পরে হয় তো তাঁরা ঘোড়দৌড়ের মাঠে যান, নয়তো গলফ্ রপ্ত করতে শুরু করেন। সন্ধ্যায় প্রতি ফ্ল্যাটে চকচকে ঝকঝকে জনসমাগম, রসালো আড্ডা, প্রাচুর্যে উপচে-পড়া বিন্যাস।

মাত্র কুড়ি বছরে এতটা পরিবর্তন সম্ভবপর সেটা প্রথম ধাক্কায় বিশ্বাস করা অনেকের পক্ষে হয় তো মুশকিল। যাঁরা পরিবর্তিত হয়েছেন, তাঁরা হয় তো মানতেও চাইবেন না কোনো কিছু বিশেষ বদলেছে। তাঁরা সগর্বে বলবেন, তাঁদের বিবেক আছে, লুকিয়ে-চুরিয়ে দু'দশ টাকা তাঁরা এখনো বামপন্থী আন্দোলনের জন্য দিতে প্রস্তুত। 'সাংস্কৃতিক' ও 'সাহিত্যিক' পত্রিকায় তাঁরা সব সময়েই প্রবন্ধ লিখছেন, সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ঘুঁটছেন, অতি বামমার্গিতা কত অপনাশসাধক তা প্রভৃত ব্যাখ্যা ক'রে দেখাচ্ছেন, তা ছাড়া দেশের এবং সমাজের কথা ভেবেই পরিবার নিয়ন্ত্রণ, সাক্ষরতা প্রসার, এ-ধরনের 'গঠনমূলক' কাজে প্রবল উৎসাহে নিজেদের—এমন কি স্ত্রীদের পর্যন্ত—নিয়োগ করছেন। এখনো তাঁরা বই কেনেন, সামর্থ্য বেড়েছে তাই বেশি ক'রেই কেনেন, বামপন্থী বইও কাতারে-কাতারে কেনেন, বসবার ঘরে সবাইকে সগর্বে দেখান সে-সব বই। কুড়ি বছর আগে উগ্র বামপন্থী ছিলেন, অফিস মহলে সেটা তাঁরা সগর্বে প্রচার করেন—এই প্রচারে বিপদের আশঙ্কা বর্তমানে শূন্য, প্রচারগত

গৌরবের পরিমাণই বড়ো। অনেক দপ্তরে মালিক মশাইরা প্রাক্তন বামপন্থী পুষে আমোদ ও আনন্দের খোরাক পান ; চিরস্থায়ী ব্যবস্থার ছত্রচ্ছায়ায় উনবিংশ শতকে আমাদের জমিদাররা হাতি পুষতেন, পাখি পুষতেন, ওস্তাদ পুষতেন, শিল্পপতিরা তেমনি এখন তাঁদের খেয়াল মেটাচ্ছেন নির্বাপিত বামপন্থী পুষে।

দন্তনখহীন আমরা, ক্লীবত্বের চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছি, এভাবে পোষ-মানা যে গ্লানিকর সে-বোধ পর্যন্ত আমাদের অধিকাংশের অন্তর্হিত। সচ্ছলতার মধ্যে থাকা সমাজতন্ত্রের প্রতীপধর্মী সেটা আমরা মানতে রাজি নই। অনেকে আবার এমন শাণিত যুক্তিও ব্যবহার করেন, ব্যবসাবাণিজ্যেরাষ্ট্রচালনায় আমরা দক্ষতা শিখছি, এ-সমস্তই ভবিষ্যতের কথা ভেবে, আমাদের দক্ষতা নতুন সমাজের সুষ্ঠু নির্মাণে কাজে লাগবে ; সমাজতন্ত্রের আদর্শ আমরা ছেড়ে যাইনি, সমাজতন্ত্রের জন্যই তো আমাদের এই ভালো-থাকা ভালো-পরা ভালো-গাড়ি-চড়া।

কেন এমন হয় ? বুদ্ধিজীবীদের কেন এই বিশ্বাসঘাতকতা ? বিশ্বাসঘাতকতার পরেও কেন তাঁদের এতদূর পাপবোধহীনতা ? একদা কিশোরচেতনায় যে-স্বপ্নের অঞ্জন ছুঁয়েছিল, তাতে কোনো ফাঁকি ছিল না। আমরা সবাই-ই একদা ত্যাগে বিশ্বাস করতাম, সাম্যের মন্ত্র তদ্‌গত হৃদয়ে আবৃত্তি করতাম, আস্থা ছিল দেশে সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করতে পারবো, কৃষক-মজুরের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো, তাদের মধ্যে যতদিন সংহতি ও শ্রেণীচেতনা আসছে না, পাশে-পাশে থেকে আশ্বাস দেবো, আশ্রয় দেবো, অভয় দেবো, এক সঙ্গে জলে ভিজবো, রোদে পুড়বো, কাদায় মাখামাখি হবো। আন্দোলনে ঢুকে, প্রথম কয়েক বছর অন্তত, আমাদের আদর্শের সঙ্গে অভিব্যক্তির, ইচ্ছার সঙ্গে কর্মের, কোনো অসদ্ভাব দেখা যায়নি, প্রথমাবস্থায় তো আমাদের চেষ্টার-অধ্যবসায়ের ত্রুটি হয়নি। তবে তিরিশের প্রান্তে পৌঁছে চিড় ধরলো কেন ? চোরের মতো সভয়ে পালিয়ে এলাম কেন ? আমাদের আদর্শের শেষ বিবেকটুকু আজ

কেন নেহাতই সামান্য ক'টি ছেলেভুলানো বক্তৃতায় আর বাগাড়ম্বর-সর্বস্ব প্রবন্ধে পর্যবসিত ?

স্বীকার করতেই হয়, যা হলো, যা হয়েছে, তার হেতু চেতনায়, শ্রেণীগত ইশারায়। শৈশব-কৈশোরের বাষ্প ধর্তব্যের মধ্যে না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মোহ ছাপিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত মানসে ব্যক্তিস্বার্থের প্রচ্ছন্ন আকুলি-বিকুলি প্রভাব ছড়ায়। তত্ত্ব যা-ই বলুক, অতটা অবলীলার সঙ্গে নিজেকে শ্রেণীচ্যুত করা সম্ভবপর নয়। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে অনেক রকম বিভ্রান্তি-হতাশায় অভিজ্ঞ হ'তে হয়, নানা ঝড়ঝাপটা, বহু মোহক্ষয়। এমন-অনেক মুহূর্ত আসে, কোন্‌টা খাঁটি কোন্‌টা মেকি তা পর্যন্ত ঘোলাটে হয়ে পড়ে, *সন্দেহ* হয় যে-নেতাদের এতদিন অন্ধের মতো অবলম্বন ক'রে এসেছি, তাঁরা ভুয়ো, তাঁদের নিজেদেরই আদর্শ সম্বন্ধে অবৈকল্য নেই। কীসের জন্য তা হ'লে আমাদের তিতিক্ষা, কেন কৃচ্ছ্রসাধন, আমরাই বা কেন দ্বিরাচরণে দ্বিধাগ্রস্ত থাকবো ? এমন-ধারা যুক্তির সন্তর্পিত প্রয়োগে যে-হৃদয়দৌর্বল্যের প্রথম প্রকাশ, তা-ই আস্তে-আস্তে প্রগাঢ় রূপ নেয়, আদর্শের প্রতি বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে আসে, তারপর শ্রেণীস্বার্থের বজ্র আঁটুনিতে বন্দী হ'তে হয়। সে-অবস্থায় বিবেকদংশনের বালাই আর থাকে না, বরঞ্চ ঘরের-খেয়ে-বনের-মোষ-তাড়ানো বছরগুলির জন্য অনুশোচনা জাগে বহুগুণ উৎসাহে রজতসাধনায় নিজেদের তখন থেকে আমরা নিযুক্ত করি, প্রথম দিকে যা হারিয়েছি, এবার তা উশুল ক'রে নিতে হবে। তা ছাড়া, আদর্শের বিকৃত ফাঁদে পা দিয়ে যে-স্বাচ্ছন্দ্য-প্রাচুর্যবিলাস-সম্ভোগ থেকে আমরা নিজেদের বঞ্চিত করেছিলাম, আমাদের আনন্দের মধ্য দিয়ে সেই ভোগের সম্পৃক্তি হোক। আমাদের ছেলেমেয়েরা তাই মার্কিনি আদর্শে বড়ো হয়ে ওঠে, স্ত্রীরা বাংলা-ভাষায় কথা বলতে প্রায় ভুলে যান।

আসলে, বাঙালি ভদ্রসমাজের আমরা, বিপ্লবী বামপন্থী আন্দোলনে ধোপে টিঁকি না। নেতাদের কদাচিৎ আদর্শস্খলন ঘ'টে থাকে

সেটা ঠিক, কিন্তু নেতারা এবং আমরা একই সংকীর্ণ শ্রেণীর প্রণালী বেয়ে এসেছি, তাই ব্যাধিটাও এক। দুঃখকষ্ট সহ্য করার, ত্যাগের বন্যায় নিজেদের ভাসিয়ে দেওয়ার, রোমান্টিক অভীপ্সাদি বহিপৃর্থিবীর রূঢ় আঘাতে খুব বেশিদিন সামলাতে পারে না, কিছুদিন বিপ্লব-বিপ্লব খেলা খেলে আমরা তাই সরে পড়ি। বিবেকটাকে যদি পুরো কবর দেওয়া অসম্ভব হয়, তা হ'লে সুখী জীবনের নিরাপদ আরামের আশ্রয়ে অবস্থান ক'রে মাঝে-মাঝে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রবন্ধ লিখি, নয়তো ঘরোয়া বৈঠকে বক্তৃতা দিই। মধ্যবিত্ত বিবেক অল্পেই তুষ্ট হয়, তুষ্ট হয়ে পাশ ফিরে ঘুমোয়।

অনেকে হয় তো বলবেন, ক্ষতি কী যদি ঠিক এমনই হয়? মনের সংবেদনশীল মুহূর্তে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলেরা অনেকে বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দেবে, তাদের বেশির ভাগই দু'-দশবছর বাদে, শ্রেণীস্বার্থের হাতছানিতে, আন্দোলন পরিত্যাগ ক'রে জাগতিক সাফল্যের নিরাপদ দুর্গে ফিরে যাবে, কিন্তু যদি দু'একজনও টেঁকে তাতেই লাভ। তা ছাড়া, যাদের ধ'রে রাখা গেল না, অন্তর্বর্তী সময়ে তারাও তো বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য কিছু-কিছু কাজ করেছে, তার মূল্য তো কম নয়। আন্দোলনে তারা, কয়েক বছরের জন্য হ'লেও, বুদ্ধির প্রখরতা এনে দিয়েছিল, এনেছিল চাতুর্য, দীপ্তি। যারা আন্দোলনে রইলো না তারাও অন্তত কয়েক বছর তো কৃষকদের সঙ্গে মিশেছে, মজুরদের বুদ্ধিপরামর্শ দিয়েছে, স্থানে-স্থানে আন্দোলনের নানা ধাপে যেখানে নেতৃত্বে অপূর্ণতা ছিল, সেই শূন্যতা বুঁজিয়েছে। তারা আন্দোলনে রইলো না, তা নিয়ে আক্ষেপ ক'রে কী লাভ, বরঞ্চ তারা যে স্বল্পকালের জন্যও এসেছিল তা নিয়েই কি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নয়?

আমি বলবো কিছুতেই নয়, একেবারেই নয়। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের ক্ষণিক প্রেম দিয়ে বামপন্থী আন্দোলনের উপকারের চেয়ে ক্ষতি করেছেন অনেক বেশি। ইদানিং আক্ষেপ শোনা যায়, এই দশকের তরুণরা-ছাত্ররা রাজনীতিপরাঙ্মুখ, বামপন্থী

আন্দোলন সম্পর্কে তাদের তেমন উৎসাহ বা আগ্রহ নেই। আমার নিজের সন্দেহ, এই প্রবণতার প্রধান কারণ আমরা, যাঁরা আজ থেকে কুড়ি বছর আগে কলকাতার রাস্তায় বিপ্লব করেছি, বর্তমানে ভীষণ-রকম ভদ্রলোক হয়ে গেছি, উৎকটরকম সম্ভ্রান্ত। আমরা আদর্শ স্থাপন করেছি আদর্শহীনতার, নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়ে হালের ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা দেখাচ্ছি যে বিপ্লবের বুলি বুজরুকির ব্যাপার, আপাতত সুখকর উত্তেজনার মধ্যে সময় কাটাতে সাহায্য করবে, কিন্তু ভবিষ্যতে এ-সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে বাড়ি-গাড়ি-টেলিফোন-রেডিওগ্রাম-রেফ্রিজরেটরই হচ্ছে আসল। তা-ই যদি হয়, জাগতিক সাফল্যই যদি সব শেষের সার কথা হয়, তা হ'লে আর কেন বামপন্থা আন্দোলনে মাথা গলানো, মিছিলে নামা, স্লোগান চেঁচানো, খেতখামারে বা কারখানায় গিয়ে সংগঠন, তার চেয়ে বরং এখন থেকেই শেখা যাক কী ক'রে ভালো চাকরি বাগানো যেতে পারে, দেখা যাক কোন্ চালাকির মারফত কত অল্প সময়ের মধ্যে কত বেশি টাকা করা সম্ভবপর।

অন্য যা ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা এর চেয়েও গুরুতর। শ্রমিক-এবং কৃষক-আন্দোলনের সংগঠনভার এতদিন পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীর দল একচেটিয়া ক'রে রেখেছেন। গাদা-গাদা বুদ্ধিজীবী নানা দলে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের ব্যাপৃত রাখতে হবে, তাঁরা সংখ্যায় এত যে ছাত্র-এবং শিক্ষক-আন্দোলনে সকলের জায়গা করা সম্ভবপর নয়। অতএব এ-সমস্ত মহামান্য বুদ্ধিজীবীরা কৃষক-মজুর সংগঠনে নেমেছেন, কয়েক বছর কাজ করেছেন, তারপর তাঁরা অন্তর্হিত হয়েছেন, নতুন বুদ্ধি-জীবীর দল পুনরায় এসেছেন নেতৃত্ব দিতে, কিছুদিন বাদে তাঁরাও খ'সে পড়েছেন। এই বিচ্ছিন্নতাজাত অহরহ বিপর্যয়ের ফলে অনেক অঞ্চলে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে। আরো যা হয়েছে, বুদ্ধিজীবী আক্রমণের ফলে মজুর-কৃষক শ্রেণীর স্বাবলম্বী হবার প্রয়াস ব্যাহত হয়েছে। বাইরে থেকে তৈরি নেতারা বার-বার গিয়ে জুড়ে বসেছেন, নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, নিজেদের ত্যাগের-দুঃখভোগের কষ্টিপাথরের ভিত্তিতে

নিজেদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব-এবং-প্রেরণা সৃষ্টির সৌভাগ্য থেকে মজুর-কৃষকদের বঞ্চিত ক'রে রাখা হয়েছে।

শ্রেণীবিভাজন বাদ দিয়ে অন্য-কোনো সত্য নেই। ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবীরা সমাজতন্ত্রে বাগড়া দিতে পারেন মাত্র, তার বাইরে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। আমাদের দেশে অন্তত, সমাজতন্ত্র-নির্মাণের প্রয়াসে অন্যতম প্রথম সূত্র হওয়া উচিত এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের নির্মূল উৎখাত। অন্যথা প্রতি পদে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা।

১৯৬৫

উত্তেজনার বাইরে

আমার বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবন কেটেছে ঢাকা শহরে। যাদের সঙ্গে ছেলেবেলায় খেলা করেছি, বিস্তীর্ণ মাঠে গোল হয়ে ব'সে কৈশোরে আড্ডা দিয়েছি, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কবিতা-রাজনীতি-পরচর্চায় যাদের সঙ্গে নরক গুলজার করেছি, তাদের অনেকেই এখন পাকিস্তানে, কেউ-কেউ জাগতিক সাফল্যের চূড়োয়, কেউ-কেউ হয়তো ততটা সফল হ তে পারেনি। ঢাকা ছাড়বার, এবং দেশভাগ হবার, পর এদের অনেকের সঙ্গে বিদেশে দেখা হয়েছে, কখনো অল্প সময়ের জন্য, কখনো বেশ কিছুদিন ধ'রে। হয়তো এমনকি কোনো হোটেল বা হস্টেলে এক সঙ্গে থেকেছি, অথবা কোনো বিদেশী শহরে পাশাপাশি বাসা নিয়ে। খবরকাগজে দু'দেশের মধ্যে অনবচ্ছিন্ন কলহ চলেছে, কাশ্মীর প্রসঙ্গ কাগজে-কলমে উত্তাপ জুগিয়েছে, কিন্তু আমাদের পারস্পরিক হৃদ্যতায় যতি পড়েনি। ভাষার বন্ধন অবশ্য মস্ত বন্ধন ; ভাষার ঈষৎ পূর্ববঙ্গীয় বিন্যাস কানে ঝিকিমিকি মাধুর্য ঢেলেছে। তা ছাড়া, স্বীকার করতেই হয়, পূর্ববঙ্গের বর্তমান অধিবাসীরা মৃত্তিকার অনেক বেশি কাছাকাছি। বিজ্ঞানের তত্ত্বভাণ্ডারে আমার উক্তির কোনো সমর্থন না-ও মেলা সম্ভব, কিন্তু প্রায়ই এটা বিশেষ ক'রে মনে হয়, জীবনধারার ছাপ যেমন চেতনাকে গড়ে, জীবনযাত্রার পরিবেশও তেমনি কিয়ৎপরিমাণে চেতনার আদল গ'ড়ে তোলে। পশ্চিম বঙ্গে আমরা যারা ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত, তাদের তুলনায় সীমান্তের অপরবর্তী মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি, জলের কাছাকাছি। কৃষিগত ঐতিহ্য তাদের পক্ষে এখনো স্মৃতিবহির্ভূত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়নি, তাদের অভ্যাসে-আচরণে এখনো এমন-এক অসংকোচ অনাড়ম্বরতা, এমন-এক সারল্য যা, যদি প্রসন্ন মন নিয়ে এগোনো যায়, অচিরে আঁকড়ে ধরে, আকুলতা জাগে আমাকে এতটা

যারা দিতে চাইছে, দিতে চাইতে পারছে, তাদের সঙ্গে দণ্ড-দণ্ড ধ'রে কথা বলি, তাদের আমার দিক থেকেও আমি গ্রহণ করি, তাদের বরণ করি আত্মীয় হিশেবে।

দেশভাগের উত্তরকালে এই আত্মীয়তাসম্পর্ক স্থাপন সহজতর হয়েছে। সামাজিক-আর্থিক অবস্থার তারতম্য একদা-কাছের মানুষকেই দূরে ঠেলে দেয়, রাজনৈতিক সংজ্ঞায় যে-মানুষ দূরের তাকে তো তা হ'লে আরো। পশ্চিমবঙ্গে এখন যাঁদের মধ্যবিত্ত ব'লে আখ্যাত করা যায়, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গে আমাদের সামাজিক আদান-প্রদানে ব্যবহারিক বাধা ছিল অজস্র, রাজনীতির খিটিমিটি বাদ দিয়েও অজস্র। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির, এবং পাকিস্তানের জন্মের পর, সে-সমস্ত বাধাগুলি আস্তে-আস্তে ঘুচে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা হীনমন্যতার মেঘাচ্ছন্নতা থেকে তাঁদের আকাশকে মুক্ত করতে পেরেছেন, তাঁরা আত্মস্থ হ'তে পেরেছেন: তাঁদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, নিজেদের দেশে এবার তাঁরা ভাগ্য-নিয়ামক, আমাদের সমতায় তাঁরা তাই অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে উঠে আসতে পেরেছেন, অতীতের তিক্ততা-গ্লানি সব-কিছু বিসর্জন দিয়ে। অন্য পক্ষে আমাদের দিক থেকেও আচরণের উচ্চাবচতা ক্রমশ মসৃণ হয়ে এসেছে: উপস্থিতের উৎকীর্ণ চাপে আমরা আমাদের প্রাগবিভূতি ভুলছি। আমরা সহনশীল হচ্ছি, অনুকম্পা শিখছি। এই অনুকম্পা শ্রেষ্ঠমন্যের ভ্রুকুটিকুটিল অনুকম্পা নয়, সমঅবস্থানের অনুকম্পা। আমরা ঝুটো তত্ত্ব-সন্দেহ-গৌরবগর্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিরাবরণ হয়ে পরস্পরের কাছে আসছি: অতএব অনুকম্পা।

মুশকিল হলো এই কাছাকাছি-আসা অধিকাংশই ঘটেছে বিদেশে, তৃতীয় ভূমির সংস্থানে। পূর্ব পাকিস্তানের বন্ধুরা যখন আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছেন, মাত্র অল্প-কয়েকদিনের জন্য এসেছেন, অতিথির রূপে। আমরাও যখন ঢাকা কি চট্টগ্রাম কি রাজশাহীতে গিয়েছি, দু'দিনের অতিথি হয়েই গিয়েছি। দু'পক্ষেই আড়ম্বরের-অভ্যর্থনার ত্রুটি হয়নি, আন্তরিকতাতে কোনো ফাঁকি থাকেনি, কিন্তু,

তা হ'লেও, মানতেই হয়, অতিথি অতিথিই, সময়ের ব্যাপ্তি এত কম, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা রচনা করার সুযোগ কিংবা সময় মেলে না। আপ্যায়ন করতেই প্রহর অতীত হয়ে যায়, কোনো হার্দ্য বিনিময়ের আর ফুরসুত হয় না। ঢাকা থেকে কোনো মাননীয় অধ্যাপক কি অন্য-কেউ এসেছেন, কখনো-কখনো আমরা প্রত্যভিবাদনে গিয়েছি, দু'দিকেই খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু সভাসমিতি সংবর্ধনায় কালহেলন হয়েছে, নিবিড়ে পৌঁছুবার মতো সময় কোনো বারই থাকেনি। সেই সময় উদার হয়ে এসেছে বিদেশে, যখন ঘটনাচক্রে এক জায়গায় স্থিত হয়েছি পূর্ব পাকিস্তানের কোনো বন্ধুর সঙ্গে। দুই গার্হস্থ্য তখন এক হয়ে মিশে গেছে ; রাজনীতির নির্দেশ যা-ই হোক, সেই আড়াল মেনে নিয়েও আমরা ভাষা-গান-সাহিত্যের মোহনা খুঁজে পেয়েছি, সে-অন্বয় আবিষ্কার করেছি জিভের স্বাদে, শিশুর কাকলিতে, নীল-আকাশে গালফোলা-শাদা-মেঘ অবলোকনের সমআনন্দঘনতায়। আর আড্ডায় ধনবিজ্ঞানের হিশেবকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অজস্র-অপরিমিত অফুরন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্লাবনে প্রহরের-পর-প্রহর কাটানোর মধ্যে অপরূপ-এক মানবিকতার জ্যোতির্দীপ্তি : আমরা পরের ধানে মই দিচ্ছি না, নিজের বিত্ত বাড়াবার চিন্তা পিছনে ফেলে এসেছি, আড্ডা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এক অভিব্যক্তি। কথার অঢেলতায় নিজেদের আমরা বিলিয়ে দিচ্ছি, মানবিকতা দিয়ে যে-যে বৃত্তি বোঝা যায়—স্নেহ, প্রীতি, অপরকে-আনন্দ-দিয়ে-উদ্ভাসিত-করার প্রয়াস—তাদের সব-কিছু উজাড় করার জন্যই আড্ডা। এই আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু ছুঁয়ে আসতে পারার সার্থকতায় সৃষ্টির গর্ব। বিদেশে গিয়েই হঠাৎ একদিন বুঝতে পেরেছি দেশটা আলাদা হয়ে গেলে কী হয় কুষ্টিয়ার-দর্শনার ওপারে যারা, তাদের আড্ডা-আমাদের আড্ডা আসলে একই রঙ্গকাহিনী, তাদের কাছে ডেকে নিতে পারলে আমাদের মস্ত লাভ, রঙ্গের অন্তর্গত বিভঙ্গ তাতে বাড়বে, বিন্যাস-প্রতিন্যাসের ঠাসবুনুনিতে আপাত-অধরা এক আশ্চর্য জলতরঙ্গ আমরা সম্মিলিতভাবে সঞ্চার করতে পারবো।

অবশ্য বিদেশে-গ'ড়ে-তোলা এই আত্মীয়তাসম্পর্কগুলিতে অচিরে সময়ের ছায়া পড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের বন্ধুরা হয়তো, বিদেশের মেয়াদ ফুরোনোর পর, ঢাকা কি করাচিতে ফিরে গেছেন, নয়তো আমরাই চ'লে এসেছি দেশে। আড্ডা ঘুচেছে, তার পর থেকে হয়তো নেহাতই বছরে একটা-হুটো চিঠির আদানপ্রদান। খবর-কাগজে কাশ্মীরের ঘনঘটা ক্রমশ কালো হয়ে এসেছে, তজ্জনিত সম্ভবত সামান্য উদ্‌বেগপ্রকাশ, তা ছাড়া প্রধানত ঘরোয়া বিবৃতি : ছেলেমেয়েরা কে কোথায় কী পড়াশুনা করছে, কে কোথায় বদলি হয়েছেন, এই বইটা একটু সংগ্রহ ক'রে পাঠাতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের গানের ভালো কী নতুন রেকর্ড বেরোলো, বন্যাতে আশা করি তোমাদের গ্রামের বাড়ির কোনো ক্ষতি হয়নি, ইত্যাদি। চিঠির বহর, কয়েক বছর কেটে গেলে, ক'মে ক'মে এসেছে, কিন্তু ক্ষতি হয়নি তাতে। খবরকাগজে উত্তাপ দিনের-পর-দিন বেড়ে চলেছে, কিন্তু সেই ডামাডোলের শব্দকে ঢেকে ফেলে মনের মধ্যে অন্য-এক স্বগত উচ্চারণ : লাহোরে কিংবা ময়মনসিংহে আমার একটি ভাই আছে কিংবা বোন আছে, আমাকে কাকা ব'লে ডাকে এমন-একটি বাচ্চা মেয়ে আছে, যার চোখে দুষ্টুমি, সব সময়ই যে আমার কোলে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, সেই মেয়েটির জন্য কিছু ফ্রকের কাপড় কিনে পাঠাতে হবে, আমার সেই বিদগ্ধা বোনটির জন্য একটা-দুটো কাঞ্জিপুরমের শাড়ি, রবীন্দ্রনাথের-গান-পাগল বন্ধুটির জন্য কিছু নতুন রেকর্ড। কাশ্মীর নিয়ে এই ভাইবোনদের সঙ্গে একদা প্রচুর তর্ক করেছি, তাদের মতের সঙ্গে এখনো আমার মত মিলবে না, কিন্তু তাতে কী। তাদের দেশপ্রেমকে আমি সম্মান করবো, যেমন করি তাদের ধর্মবিশ্বাসকে ; সেই সঙ্গে আমিও আমার দেশপ্রেমে একনিষ্ঠ থাকবো, সেখানে তারাও বাধা দিতে আসবে না, কারণ তারা আমাকে ভালোবাসে, আমার আলাদা সত্তাকে সম্মান করে। আরো যা বলা বাকি থাকে, অথচ যা গভীর বিশ্বাসে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত, তা স্বাদেশিকতা ছাপিয়ে : এই মুহূর্তে, এই গোলমালের

মধ্যে, আমি জানি ময়মনসিংহ বা লাহোরে স্থিত থেকে আমার সেই ভাইবোনেরা আমার মঙ্গলকামনা করছে, আমার সেই ভাইঝিটি ভাবছে, কাকা কবে আসবে, এবার এসে ক'দিন থাকবে, তার জন্য ক'বাক্সো চকোলেট সঙ্গে আনবে।

এই মঙ্গলকামনা-চিন্তা-ব্যাকুলতা-প্রীতিনির্ঝর উভপাক্ষিক। যুদ্ধ বাধবার পর দু'দেশের মধ্যে চিঠির বিনিময় বন্ধ হয়েছে, তাতে ব্যাকুলতা বেড়েই গিয়েছে। এদিকে আমরা ভাবছি, ওদিকে ওরা ভাবছে। আমরা যে-ব্যাকুলতার সঙ্গে চিন্তা করছি, নিজেদের মধ্যে উদ্‌বেগ প্রকাশ করছি, ওদের ঠিক ততটাই ব্যাকুলতা। যেহেতু আমরা এদিকে, এবং ওরা ওদিকে, এবং যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি দু'দেশের মধ্যে গত দু'মাসের মুখোমুখি হামলায় আমরা ন্যায়পক্ষে, ওদের দাবি অন্যায়, অতএব যেন আমরা এই সিদ্ধান্তে চট ক'রে না পৌঁছে যাই যে, আন্তরিকতার প্রকাশে আমরা ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যাদের আত্মীয় ব'লে গ্রহণ করেছি, যারা আমাদের আত্মীয় ব'লে বরণ করেছে, যেন বিশ্বাস রাখি তারাও সমান উদ্‌বেগে আমাদের কুশল প্রার্থনা করছে এই থমথমে গোলমেলে ক্রান্তিক্ষণে। এই বিশ্বাসের গ্রন্থি শিথিল হ'লে মানবিকতা কৃত্রিম ভণিতা হয়ে দাঁড়ায়, প্রেম-প্রীতি-অনুরাগ অসাধু প্রবঞ্চনার স্তরে গিয়ে পৌঁছয়। মনে হয়, সে-স্তরে পৌঁছুতে এখনো কিছু সময় বাকি।

ভাষার বন্ধন, নদীমাতৃক বাসভূমির উত্তরাধিকার, বাদ দিয়েও কি আত্মীয়তার নিবিড়তা সম্ভব নয়? সম্প্রতি সংবাদপত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানেব মধ্যে পৃথগীকরণের বিশেষ চেষ্টা চলছে; আমাদের রাজনৈতিক সংঘাত পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের সঙ্গে, অন্য পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে হৃদ্যতাসম্বন্ধস্থাপনে আমাদের একান্ত আগ্রহের প্রকাশ নানাভাবে বিচ্ছুরিত-বিকিরিত হচ্ছে। কিন্তু, হায়, অতটা ত্বরিত কুশলতায় শাদা-কালোর ভেদ টানা মস্ত অবাস্তব ব্যাপার। ভাষার সাযুজ্য নেই, অথচ বিবেককে চাপা দেবো কী ক'রে, বিদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকের সঙ্গেও তো মিশে যেতে

পেরেছি, তারাও অনেকে তো আমাকে ভাই ব'লে গ্রহণ করেছে? বোন ব'লে ডেকেছি, আদর-পরিচর্যা-প্রশ্রয় পেয়েছি অনেকের কাছে, যাদের ভাষা পাঞ্জাবি কি সিন্ধি : তাদের সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে প্রচুর বাক্‌বিতণ্ডা করেছি, কিন্তু বাক্‌বিতণ্ডার শেষে তারাই হয়তো আমাকে সযত্নে কাশ্মীরি রান্না রেঁধে পাশে ব'সে খাইয়েছে। বিদেশে অসুস্থ হয়ে একা শুয়ে আছি যখন, এদেরই মধ্যে কেউ সংসারের নানা ঝামেলার মধ্যে সময় ক'রে নিয়ে আমাকে শুশ্রূষা করেছে, নিজের বাড়িতে নিয়ে তুলেছে, কথাব অবাধ্য হ'লে বকুনি দিয়েছে, বাঙালি মন কবিতা-আসক্ত জেনে গালিবের গজল তর্জমা ক'রে শুনিয়েছে। অনেকে হয়তো বলবেন, দেশের-জাতির উৎকীর্ণ সংকটসময়ে এই ধরনের ব্যক্তিগত ভাবাবেগের কোনো স্থান নেই ; মাতৃভূমির নিহিত স্বার্থ সবচেয়ে আগে : পশ্চিম পাকিস্তানেও নিশ্চয়ই অনেক সদাচারী-সদাশীল-ভদ্রশিষ্ট লোকজন আছেন, কিন্তু আপাতত তাঁরা সবাই আমাদের শত্রু, আমাদের জাতীয় স্বার্থের তদগত সাধনা বন্ধ ক'রে যদি এখন সে-সমস্ত ভালোমানুষের কথা ভাবতে শুরু করি, তা হ'লে অযথা মন দুর্বল হবে, দেশের-ও-জাতির প্রতি কর্তব্যে বিচ্যুতি ঘটবে। একটু যাঁরা অনুকম্পায়ী, তাঁরা আসবেন গীতার উপদেশ নিয়ে ; অসহিষ্ণুদের সম্প্রদায় আসবেন জাতীয় সংহতির বর্ম উঁচিয়ে।

স্বীকার করতে গ্লানিবোধ নেই আমার, আমি পিঠটান দেবো। নিদেন পক্ষে, যদি দেখি আমাকে যিনি অনুযোগ জানাতে এসেছেন, তিনি উদারচরিত, প্রত্যুত্তরে তাঁকে কিছুটা রঙ্গভরে, কিছুটা গভীর প্রত্যয়ের নির্ভরে, উপনিষদের উদ্ধৃতি শোনাবো, নয়তো রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে কোনো মূর্ছনা-আপ্লুত অনুচ্ছেদ। মুশকিল হলো সংবাদ-পত্রের কুচকাওয়াজে আমাদের স্বাদেশিকতার চড়া, কড়া সুরটিই উদগ্র হয়ে ফুটে বেরোয়। অবশ্য সংবাদপত্রগুলিকেও খুব বেশি দোষ দিয়ে লাভ নেই ; যা কর্কশ, তা নিয়েই খবরের কাগজের দিনযাপন, সুতরাং বর্তমানের উত্তেজনার মুহূর্তে মোলায়েম রাগিণীর প্রকাশ আশা করাই অন্যায়। এবং আমাদের এখানে যা, পাকিস্তানের

সংবাদপত্রেও ঠিক তাই, কিংবা হয়তো আরো-একটু বেশি। তা ছাড়া, বিশ্বাসের মূল নিয়ে যেখানে সহিংস দ্বন্দ্ব বেধেছে, দ্বন্দ্বের সাফল্যের জন্যই হয়তো প্রয়োজন বেতারে, খববকাগজে, রাজনৈতিক নেতার ভাষণে অন্ধ আবেগের প্লাবন অব্যাহত রাখার। দ্বন্দ্ব-কলহ-সংঘর্ষ অতিক্রম ক'রে, সংগোপন আড়ালে, আমাদের স্বাদেশিকতার যে-অন্য-এক শুদ্ধশীল সমাহিত ক্ষমাপ্রীতিপ্রসন্ন রূপ আছে, আপাতত তা নিয়ে আলোচনা করলে কার্যকরী ক্ষতি হ'তে পারে অন্তত সে-রকম আশঙ্কা। প্রজাপুঞ্জের স্বপ্নভঙ্গ হোক : এখন যুদ্ধ।

এখানে এবং পাকিস্তানে, যদিও বলা হচ্ছে নীতির জন্য যুদ্ধ করছি, কিন্তু যে-দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, তার অধিবাসীদের ঘৃণা করি না, এই সূক্ষ্ম মীমাংসা আবেগের মুহূর্তে অবলুপ্ত হ'তে বাধ্য। যুদ্ধ কোনো বৈদেহী ব্যাপার নয়। বাচ্চা ছেলে যুদ্ধের ছবি দেখছে চোখে উৎসুক কৌতূহল নিয়ে : বিমান আর ট্যাঙ্কের ধ্বংস দেখেই তার উৎসাহে ক্ষান্তি নেই, তার কাছে যুক্তির সূত্র অত্যন্ত সোজা—ট্যাঙ্ক আর বিমানের সঙ্গে যে-মানুষগুলো ধ্বংস হলো তারাই তো শত্রু। ন্যায়-অন্যায়ের নীতিবোধ শিশুর কাছে মূর্ত রূপ ধ'রে আসে : আমরা ন্যায়ের পক্ষে, প্রতিপক্ষেরা সবাই অন্যায়কারী, সুতরাং বধ্য। যে ক'রেই হোক, শত্রুবধ করতে হবে, শত্রু হচ্ছে সীমান্তের অন্য পারের মানুষগুলো, তাদের উচ্ছেদ ঘটাতে হবে। এই হননচিন্তা কি ভারতবর্ষে, কি পাকিস্থানে, শিশুমনে আস্তে-আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে।

এখানেই মস্ত আশঙ্কা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভরসা ছিল, ১৯৪৭ সালের লজ্জার ভার আস্তে-আস্তে কাটিয়ে উঠে নির্মল মন নিয়ে দুই দেশের লোক পরস্পরের দিকে তাকাতে পারবে, আজ না হোক আগামী কাল। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, সাময়িক উন্মত্ততা-বশত দেশবাসীরা পরস্পরের টুঁটি চেপে ধরেছে, কিন্তু, যদি এমন হতো যে আবেগ-নিষ্কাশন সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন থেকে শুধু আর্থিক প্রগতির চিন্তা, সচ্ছল-সুস্থ-দ্বন্দ্বরহিত জীবনযাত্রার প্রয়াস, আলাদা হ'লেও পাশাপাশি, পরস্পরের কাছ থেকে যা শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ তা

বিনম্রতার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে, পরস্পরকে সাহায্য ক'রে, তা হ'লে আত্মগ্লানির প্রশ্ন অতঃপর অনুক্ত থাকতো। কিন্তু এই বছরের সশস্ত্র সংঘর্ষে সে-সম্ভাবনা বিলোপ পেয়েছে। এমনকি যদি কাশ্মীর সমস্যার কোনো সর্বসন্তোষকর নিরসন দৈবক্রমে দু'এক বছরের মধ্যে ঘ'টে যায়, তা হ'লেও, এই দ্বিতীয়বার মোহভঙ্গের পর, মনের সন্দেহ সহসা বিদূরিত হবে না; মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই দেশের অধিকাংশ লোক হিংসা-ক্রোধ-দ্বেষের দহনে জ্বলবে, দশকের পর দশক ধ'রে দুই দেশের শিশুরা জানবে সীমান্তের বেড়া পেরোলেই শত্রুপক্ষ আচমকা হয়তো কামান ছুঁড়বে, সুতরাং হুঁশিয়ার, এদিকেও কামান নিয়ে তৈরি থাকতে হবে। আমাদের সন্তানাদি এই উদ্‌বেগ-উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বড়ো হবে, এবং পাকিস্তানেও, একদিন যাদের খুব কাছাকাছি পেয়েছিলাম, জেনেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম, তাদের বাড়ির শিশুরাও একই ভয়ে-ঘৃণায়-সংস্কারে ভারতবর্ষের নাম উচ্চারণ করবে।

আমরা তা হ'লে কী করবো? যুদ্ধ একদিন থামবে, কিন্তু হিংসা-সন্দেহ পেরিয়ে স্নেহে-করুণায়-বিনিময়ের আনন্দে আপ্লুত যে-বিশাল-বিস্তীর্ণ তেপান্তর, যা এখন একপাশে মুখ বুঁজে বিষণ্ন হয়ে প'ড়ে আছে, আমাদের শিশুদের কাছে কী ক'রে সেই মায়াবী সংবাদ পৌঁছে দেবো? শিশুমনে অনুভূতির রেখাগুলি গভীর হয়ে বসে, সুতরাং যে-প্রচার, যে-বিদ্বেষ, যে-বিষোদ্গার আজ উপস্থিত মুহূর্তে করা হচ্ছে, তার স্মৃতি আমূল উপড়ে ফেলা অসম্ভব। শিশুরা যা শিখবে, তা-ই ভাববে, এবং আজ যা ভাববে, কাল তা করবে। নিজেদের পাপের বোঝায় আমাদের সন্ততিদের জীবন কেন ক্লেদাক্ত ক'রে তুলবো, শান্ততর মুহূর্তে বিবেকের কাছে এই প্রশ্নের জবাব দাখিল না ক'রে উপায় নেই।

সময় প্রতিকূল, চারদিকে আরক্ত উত্তেজনা, তা হ'লেও, অনুচ্চ স্বরে হ'লেও, কয়েকটি কথা বলতেই হয়। যদি ভবিষ্যৎশান্তি কাম্য হয়ে থাকে, আগামী কাল সম্পর্কে মমতাবোধ জাগে, তা হ'লে অন্তত

কয়েকজনকে, এখানে এবং পাকিস্তানে, ঈষৎ নিরাসক্তচিত্তে কিছুটা আলাদা হয়ে ভাবতে হবে। এই চিন্তা দেশপ্রেমের প্রতীপ আদৌ নয়। দেশ বালি-কাঁকর-পাথরের টুকরো নয়, দেশের অর্থ আবাল-বৃদ্ধবনিতা অধিবাসীবৃন্দ, অধিবাসীদের মনের শান্তি, ভাবনার বিস্তার, অনুরাগের ব্যঞ্জনা। আমাদের দেশপ্রেম এই সমস্ত-কিছুর জন্য ; যাতে চিন্তার প্রব্রজ্যা ব্যাহত না হয়, তার জন্য, শিশুর মনের কোমলতর বৃত্তিগুলি যাতে উদ্ভাসিত-বিকশিত হ'তে পারে, তার জন্য। দেশবাসীর হৃদয়ে মরচে ধ'রে গেলে বৃথা কুরুক্ষেত্র, বৃথা ধর্মযুদ্ধ। যে ক'রেই হোক, এই মরচে-পড়ার আশঙ্কা রোধ করতে হবে। ক্ষমা-প্রেমমাধুর্য বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধে জেতা অর্থহীন অপব্যয়, কারণ তা হ'লে সায়াহ্নসময়ে পরিপার্শ্ব শূন্য মনে হবে, গতানুগতিকতার অবসন্নকর ফাঁদে বাঁধা প'ড়ে সংশয় জাগবে পরের অধ্যায়েও কি একই পুনরাবৃত্তি।

চেতনা-ডোবানো উত্তেজনার কলরোল, কিন্তু এরই মধ্যে কয়েকজনকে সাহস দেখাতে হবে। সংবাদপত্রে সাহস নেই ; তা ছাড়া, সংবাদপত্রের যা আপাত-সামাজিক প্রয়োজন, তাতে সাহসের প্রসঙ্গ অবান্তর। লোকেরা খবরকাগজ পড়ে ঘোরের গহনে ডুবে যাওয়ার জন্য, সেই ঘোর থেকে উদ্ধারের প্রয়াস করা সংবাদপত্রের ধর্ম নয়। এই দায়িত্ব সংবাদপত্র পেরিয়ে, যাঁরা চিন্তা করেন, আগামী সমাজের নীলিমায় যাঁদের দু'চোখ ছাওয়া, তাঁদের। শাদামাঠা কথার প্রস্তাবনায় এই সাহসের শুরু, সামান্য উচ্চারণে সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া আসলে আমরা যেমন, সীমান্তের অন্য পারের লোকেরাও তেমনি ; একই আশা-আকাঙ্ক্ষা-ইচ্ছা-কল্পনার দোলা তাদের মনে, অবিকল একইরকম হিংসাদ্বেষক্রোধলোভমোহ তাদের চেতনা আচ্ছন্ন ক'রে। আরো যা বলা প্রয়োজন, আমরা যেমন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, ন্যায় এবং ধর্ম আমাদের পক্ষে, তাদেরও অনুরূপ আন্তরিক বোধ। অত্যন্ত অল্পসংখ্যক, স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত ব্যক্তি ছাড়া যুদ্ধের অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতি কেউই যেমন এখানে পছন্দ করে না,

এখানেও তাই। তা ছাড়া, আমরা যতটা সংবেদনশীল, আমরা যেমন এখানে আমাদের পাকিস্তানী আত্মীয়বন্ধুদের মঙ্গলচিন্তা করছি, অনুরূপ উদ্‌বিগ্নতার সঙ্গে তাঁরাও আমাদের শুভহিতের জন্য প্রার্থনা করছেন।

ভারতবর্ষের ভূখণ্ডেই ইতিহাসে বহুবার এমন ঘটনা ঘটেছে, মান-অভিমান-যুদ্ধঘোষণা-জয়-পরাজয়-লোকক্ষয়, কিন্তু তারপর নতুন ক'রে প্রেমের পলিমাটি। মানুষ সম্মানরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছে, খাদ্যের জন্য করেছে, আদর্শের জন্য করেছে, প্রতিহিংসার জন্য করেছে, কিন্তু, ঝড় থেমে গেলে আবার সেই পুরোনো শান্ত-পরিনম্র সত্তায় প্রত্যাবর্তন করেছে, যে-সত্তার আকর লোকপ্রেম। যে-আত্মীয়, মনে ফাটল ধরলে তার সঙ্গে যেমন যুদ্ধ হয়, যে-শত্রু, শঙ্খধ্বনি-ঘোষণার পর তাকেও আত্মীয় ব'লে বরণ করা মানুষের ধর্ম। অন্তত আমাদের ইতিহাসে এ-ধরনের অনেক প্রমাণ ছড়ানো।

পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের মন-কষাকষি আপাতত রক্তপাত-শস্যপোড়ানোর পর্যায়ে উপনীত; হয়তো, নিস্তরঙ্গ নদীতে উত্তরণের আগে, আবেগ আরো তীব্রতায় পৌঁছুবে। আমাদের শিশুরা অবশ্যই দেশরক্ষায় ব্রতী হবে, কিন্তু সেই ব্রত প্রেমপ্রীতির প্রফুল্ল কুসুমকে নোংরা ঘোলা জলে বিসর্জন দিয়ে নয়। আমাদের শিশুদের আমরা সবচেয়ে আগে যেন এই পরম প্রতীতি শেখাই: পাকিস্তানেও নিশ্চয়ই এমন-কেউ আছেন, অনেকেই আছেন, যাঁরা এই মুহূর্তে আমার-আপনার জন্য বিধাতার কাছে উজ্জ্বলতা-সচ্ছলতা ভিক্ষা করছেন—যদিও সে-দেশের সঙ্গে আপাতত আমরা সংঘর্ষরত, তা হ'লেও। সে-দেশে যদিও স্বৈরতন্ত্র, সে-দেশের নায়ককুল যদিও আমাদের অনিষ্টচিন্তারত, তা হ'লেও।

১৯৬৫

একটি বাঙালি প্রবন্ধ

দেশে অত্যন্ত অশান্ত সময় যাচ্ছে। অন্নাভাব, প্রায় সব-জিনিশেরই হু হু মূল্যবৃদ্ধি, শিল্পে-বাণিজ্যে মন্দা, বেকার-সমস্যার সম্প্রসারণ, পল্লী-অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান দৈন্য। সব-মিলিয়ে এক ঘন-হয়ে-আসা তমিস্রা, কোনো দিকেই যেন কোনো আশার আলো নেই। দেশের সর্বত্রই এই আশাহত মনের অবস্থা, কিন্তু বাংলা দেশে আরো-একটু বেশি। শরণার্থী সমস্যার অসম্পূর্ণ সমাধান তার একমাত্র কারণ নয়। শিল্পক্ষেত্রে গত কুড়ি বছরে প্রসার অন্যান্য জায়গার মতো বাংলা দেশেও যথেষ্ট হয়েছে, হয়তো তুলনায় অধিক মাত্রায়ই হয়েছে। কিন্তু সাধারণ বাঙালির তা থেকে তেমন-কিছু সুরাহা হয়নি। শিল্পজাত ঐশ্বর্যের বৃহদংশ অবাঙালি যাঁরা এখানে মূলধন খাটিয়েছেন, তাঁদের লভ্য হয়েছে। বাঙালি মূলধন আদৌ গ'ড়ে ওঠেনি। সুতরাং বাংলা দেশের নানা প্রাকৃতিক ও অবস্থানিক সুযোগসুবিধা সত্ত্বেও, এতগুলি পরিকল্পনার প্রসাদ বিতরণ সত্ত্বেও, নিছক বাঙালিদের ভাগ্যে শিকে আদৌ ছেড়েনি। নেহাত যাঁরা সদাগরি চাকরি করেছেন একেবারে উপরের ধাপে, তাঁদের অবস্থা জবররকম ফিরেছে, তাঁদের সম্পদে-শ্রীতে চিক্কণতা-মসৃণতা এসেছে, কিন্তু তাঁরা তো সংখ্যায় নেহাতই মুষ্টিমেয়. হাতের আঙুলে গোনা না গেলেও অন্তত হাজার পেরিয়ে লক্ষের কোঠায় তাঁরা এখনো পৌঁছননি। গ্রামাঞ্চলেও ঠিক তাই : কিছু-কিছু জোতদার এবং মহাজন গত পনেরো-কুড়ি বছরে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু ভাগচাষী-বর্গাদার-ভূমিহীন মজুরচাষীর অবস্থা ক্রমশই অবনতির দিকে।

এমনিতেই বাংলা দেশের হাল শোচনীয়তার গা ছুঁয়ে ছিল; পুরো দেশের সাম্প্রতিক আর্থিক দুর্দশার ফলে তা আরো হেলে পড়েছে। গত পাঁচ বছরে দু'দুটো যুদ্ধের ধাক্কা দেশের লোককে

এখন সামলাতে হচ্ছে। যুদ্ধ যখন চলতে থাকে, উন্মাদনার অভাব হয় না। এক নিখাদ দেশপ্রেমের বন্যায় সাধারণ লোকেরা ভেসে চলে, নেতারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আগে বিদেশী যাঁদের সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে, তাঁদের সঙ্গে ফয়সালার সবগুলি দিক বিচার ক'রে দেখেছেন কিনা, তা নিয়ে কারো চিন্তাভাবনার উদ্রেক হয় না। অরাতিরক্তে স্নান করবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই তখন বড়ো হয়ে ওঠে। ফলটা ভুগতে হয় পরে, যুদ্ধ করার আপাতফলাফলের সঙ্গে যার কোনো যোগসূত্রই নেই। চীন কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের লড়াই, দুটোর একটিও দু'তিন সপ্তাহের বেশি গড়ায়নি, কিন্তু আমাদের মতো গরিব দেশের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ভড়কে দেওয়ার মতো। তা ছাড়া, আগে যেখানে প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের ব্যয় ছিল বছরে আড়াইশো কোটি টাকা কি তারো কম, এখন সেটা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে এক হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সীমিত আয়ে এক দিকে খরচ ওরকম চট ক'রে বেড়ে গেলে অন্য দিকে টান পড়বেই, উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি তাই ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে থেমে এসেছে। করব্যবস্থা যেহেতু সুষ্ঠু নয়, রাষ্ট্রকর্তৃক মুদ্রাস্ফীতির বহর বেড়েছে; তার উপর পর-পর কয়েক বছর অনাবৃষ্টির ফলে, এবং কিছুটা মজুতদারদের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যও, খাদ্যাভাব বহু অঞ্চল জুড়ে দেখা দিয়েছে। গত দু'বছরে জিনিশপত্রের দাম সব-মিলিয়ে দেড়গুণ হয়েছে, গত চার বছরের হিশেব ধরলে দ্বিগুণ। সাধারণ লোকের ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। তা হ'লেও ভারতবাসীর অসম্ভব সহ্যশক্তি, যেটা দোষের না গুণের বলা মুশকিল, মুখ বুঁজে অনেকেই এই মূল্যবিস্ফোরণ মেনে নিয়েছে, নিচ্ছে। নিহিত ক্ষোভ কিছুটা গত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু অভাবের যতটা তাড়না, তার তুলনায় অভিব্যক্তি ঈষৎ সীমিত।

এমনকি এই বাংলা দেশেও সীমিত। এবার বিহারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, অনাবৃষ্টিতে মাঠ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, ফসলের পরিমাণ অন্যান্য বছরের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ, তা সত্ত্বেও ঐ রাজ্যের কোনো

জেলাতেই এক কিলো চালের দাম ছু'টাকা ছাড়িয়ে যায়নি। পশ্চিম বঙ্গে অনেক জায়গাতেই আপাতত চাল চার, এমনকি পাঁচ, টাকায় বিক্রি হচ্ছে। লোকেরা তা-ও মেনে নিয়েছে বিহারে কেন্দ্র থেকে যে-পরিমাণ সাহায্য এসেছে, বাংলা দেশে তার ছিটেও নয়, তেমন-কোনো প্রতিবাদ সোচ্চার হয়নি। অবশ্য বাংলা দেশে জিনিশপত্রের, বিশেষ ক'রে খাদ্যদ্রব্যের, মূল্য যে ঊর্ধ্বগতি তার কারণ স্রেফ কেন্দ্রীয় অবিচারই নয়, আমাদের এখানে প্রশাসনিক নানা ত্রুটি আছে, রাজ্য সরকারের অক্ষমতা অস্বীকার করা চলে না। শাদা-মাটা ভাষায় যাদের কায়েমি স্বার্থ ব'লে অভিহিত করা হয়, তাদের দমনের বিশেষ-কোনো চেষ্টা লক্ষ্য হয় না। এটা লজ্জার কথা, পরিতাপের কথা : এবছরের গোড়া থেকে বাংলা দেশে কিছুটা বাম-পন্থা-ঘেঁষা এক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু ফাটকাবাজ-মুনাফাখোরদের সংযত করবার ব্যাপারে সেই খাড়া-বড়ি-থোড়।

ইতিমধ্যে অন্য অঘটন ঘটেছে। শিল্পে মন্দার ফলে বেতন ও মজুরির হার মূল্যমানবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে তো পারছেই না উপরন্তু নতুন নিয়োগ প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম, এবং বহু কলকারখানা-দপ্তরে ছাটাইয়ের বহর বেড়ে চলেছে। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত বাঙালি পরিবারে দুর্দশার তাই অন্ত নেই। এই দুরবস্থার ঢেউ গ্রামাঞ্চলেও ছড়াচ্ছে, কলকাতা বা দুর্গাপুর-আসানসোল এলাকার কারখানা-গুলিতে বহু গ্রামীণ যুবক নিযুক্ত ছিল, তাদের অনেককেই বেকার হ'তে হয়েছে। বৃষ্টি ভালো হওয়ার ফলে বর্তমান বছরে ফসল যথেষ্টই বাড়বে আশা করা যায়, কিন্তু জোতদার-মজুতদারদের যোগসাজস বন্ধ না করতে পারলে সাধারণ লোকের খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে তা ভেবে নেওয়া অনুচিত হবে ; মূল্যমান অপেক্ষাকৃত স্থিততায় পৌঁছুবে সেরকম আশা পর্যন্ত ছলনাময়ী হ'তে পারে। তা ছাড়া, শিল্পবাণিজ্যের চেহারা কেমন দাঁড়াবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিচারবিবেচনার উপর : তাঁরা যদি সাহস ক'রে বন্ধ-রাখা উন্নয়ন পরিকল্পনায় নতুন ক'রে উদ্যোগসঞ্চার করেন, তা হ'লে বাংলা

দেশের লোকদেরও একটু আসান হ'তে পারে; দপ্তরে একটু বেশি পরিমাণ কেরানির কাজ, কারখানায় আরো-কিছু শ্রমিক নিয়োগ, কয়েক হাজার ঘর বাঙালি পরিবারের কৃচ্ছ্রের তা হ'লে খানিকটা অবসান হয়।

কিন্তু এ-সমস্তই ভবিষ্যৎভাবনা, ইচ্ছার শরীরে আঁকিবুকি দাগ কাটা। উপস্থিত অবস্থা থমথমে। জিনিশপত্রের চড়া দাম, ভাত-ডালের পরিকীর্ণ অভাব, বেকারি, প্রশাসনিক অব্যবস্থা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। তা ছাড়া, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্যই, কেন্দ্রের, এবং অন্যান্য রাজ্যের, পশ্চিম বাংলা সম্বন্ধে একটা গায়ে-পড়া ভাব। এটা নেহাতই পাড়া-বেড়ুনীর গায়ে-পড়া ভাব, যাতে অনুকম্পা কিংবা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নেই, বাংলা দেশের সমস্যাগুলি কিছুটা সময় নিয়ে বুঝে দেখবার সহিষ্ণুতা নেই. নিছক অবসরবিনোদনের মুখরোচক অতথ্য-কুতথ্য সংগ্রহের মোহে এই প্রব্রজ্যা। এ-বছরের শুরু পর্যন্ত, বাইরের পত্রিকাগুলিতে বাংলা দেশ সম্বন্ধে খুব সামান্য খবরই থাকতো: এখন অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম—বাংলা দেশের নেতা এবং অধিবাসীদের লম্বা-চওড়া উপদেশ দিয়ে নিত্যই সম্পাদকীয় ফাঁদা হচ্ছে, খবরকাগজের প্রথম পৃষ্ঠার অনেকটা জায়গা জুড়ে বাংলা দেশ নিয়ে লোমহর্ষক নানা খবর ছাপা হচ্ছে, কিন্তু আসল সমস্যার কী ক'রে সমাধান সম্ভব তা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। যাকে দেখতে পারি না, তার চলন বাঁকা: বাংলা দেশ সম্বন্ধে বিকৃত তথ্য পরিবেশন তাই সম্প্রতি বেড়ে-বেড়ে চলেছে।

বাইরের লোকের কোনো মাথাব্যথা নেই, আমাদের সমস্যা নিয়ে আমাদের নিজেদেরই ভাবতে হবে। ১৯৬২ সালের পর থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কাঠামো অনেকটাই ঢিলে হয়ে এসেছে, কেন্দ্রের ক্ষমতা-প্রতাপ-প্রভাব শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হ'তে-হ'তে চলেছে,

অধিকাংশ রাজ্যের, এবং তাদের মুখ্য মন্ত্রীদের, মনের ভাব অনেকটা আমরা-সবাই-রাজা-আমাদের-এই-রাজত্বে। বাংলাদেশ ধ্ব'সে পড়লে অন্য-কেউও যে নিরাপদ রইবেন না, সে-ভাবনা এখনো অনেককেই স্পর্শ করেনি, নিজেদের নিহিত স্বার্থের প্রসারেই তাঁরা আপাতত নিয়োজিত। এই অবস্থায়—আমার নিজের প্রতীতি এটা—খুব বেশি ভারতপ্রেমে উচ্ছ্বসিত হয়ে এলে অচিরে আমরা, বাঙালিরা, মারা পড়বো। ভারতীয় ঐতিহ্যে তদ্গত শ্রদ্ধা ভালো কথা, তা ছাড়া জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে ভারতচেতনা উদ্‌বোধনে বাঙালিদের তদ্গত প্রয়াসের স্মৃতি অম্লান হবার নয়। ভূগোল যেমন আমরা অস্বীকার করতে পারি না, ইতিহাসকেও সেই সঙ্গে পাশ-কাটানো অসম্ভব, সাহিত্যে-আচারকলায়-ধর্মানুষ্ঠানেও অনেকগুলি সূত্রসম্পর্ক, যাদের হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কিন্তু দেশপ্রেম, ঐতিহ্যভক্তি ইত্যাদি সব-কিছুরই উৎস ভাষার গণ্ডি, ভাষার গণ্ডিতে আবদ্ধ আমরা যারা বাঙালি হিশেবে পরস্পরকে চিনি, জানি, আত্মীয় হিশেবে বরণ করি, তাদের স্বার্থের সৌভ্রাত্র্য। ভারতবর্ষের অন্যত্র সবাই যখন নিজেদের স্বার্থ গুছোতে ব্যস্ত, পশ্চিম বাংলায় তখন অন্যতর বদান্যতায় ভেসে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। এখন থেকে তাই আমাদের আবেগকে অন্য খাতে প্রবাহিত করা প্রয়োজন। রাজনীতির চেহারা যেহেতু ঘুরে গেছে, আমাদের নিজেদের চেতনাকেও তাই পরিবর্তিত ক'রে আনতে হবে। এই পরিবর্তন কারো-কারো বিবেচনায় শোকাস্তিক ব'লে মনে হ'তে পারে, ভারতবর্ষে নৈরাজ্যের সূচনা এ-ধরনের খণ্ডিত রাজ্যচিন্তার মধ্যে নিহিত, এ-রকম অভিযোগের উত্থাপনও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দেশের অন্য-সব অঞ্চলে যে-প্রবণতা ইতিমধ্যেই অনেকদূর এগিয়ে গেছে, তার প্রতিরোধের দায়িত্ব একা এই পশ্চিম বাংলার, এই যুক্তিও সমান দুর্বল।

আসলে দেশরক্ষার, তথা দেশের সংহতিরক্ষার, দায়িত্ব উভ-পাক্ষিক: রাজ্যের যেমন, কেন্দ্রেরও ঠিক ততটাই। সমগ্র দেশের সম্পদ্‌শ্রী বাংলা দেশের সম্পদ্‌শ্রীকে বাদ দিয়ে নয়। সুতরাং কেন্দ্র

থেকে, এবং দেশের অন্যান্য নানা অঞ্চল থেকে, যাঁরা বাংলা দেশে সর্বনাশ হচ্ছে, একটা কিছু করতে হবে, এবংবিধ ত্রাহি চিৎকার করছেন, তাঁদের নিজেদের দায়িত্বের কতটুকু তাঁরা পালন করেছেন সেটা যুক্তিসহ প্রশ্ন। ঘেরাও নিয়ে সম্প্রতি যে-চেঁচামেচি হচ্ছে, ইচ্ছে ক'রেই আমি সেই প্রসঙ্গ তুলছি। সংবাদপত্রে প্রত্যহ অজস্র অভিযোগ: বাংলা দেশে ন্যায়-ও-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর যথেচ্ছাচার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, এ-রকম খুব বেশিদিন চললে বাংলা দেশ থেকে সবাই ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে যাবেন, তখন বাঙালিরা মজা টের পাবে, ইত্যাদি প্রচ্ছন্ন হুমকি রোজ কাগজে ছাপা হচ্ছে, আমরা পড়ছি, দেশের অন্যত্রও সবাই পড়ছেন। কিন্তু যা বলা হয় অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক তা নয়। শিল্পে এ-বছর যে-মন্দা দেখা দিয়েছে, তার জন্য শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলার নতুন সরকার দায়ী নন, শ্রমিকরাও দায়ী নয়, বাংলা দেশের জনসাধারণও নয়। গত পনেরো বছর ধ'রে মসৃণ হারে শিল্পপতিদের লাভের হার বেড়ে-বেড়ে চলেছে, এই প্রথম তাতে যতি পড়েছে। তবে এই যতিপাত শুধু বাংলা দেশেই ঘটেনি, বম্বে-মাদ্রাজ-ব্যাঙ্গালোর-কানপুর-দিল্লি আমেদাবাদেও লাভের পরিমাণ আপাতত হ্রাসপ্রাপ্ত। যেখানে তফাত ঘটেছে সেটা শ্রমিক-আন্দোলনের চরিত্রে: যাঁরা এই রাজ্যে সরকার গড়েছেন, তাঁরা কিঞ্চিৎ অনুকম্পায়ী ব'লে চিরাচরিত প্রথায় এ-বছর শ্রমিকদের লভ্য সংকুচিত রেখে নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা অব্যাহত রাখা মালিকদের পক্ষে এখানে সম্ভব হয়নি। শিল্পপতিরা যে-অনায়াস নিশ্চিন্ত সম্ভোগে অভ্যস্ত, তাতে অতএব চিড় ধরেছে। এবং সেজন্যই আর্তনাদ মুখর হয়ে উঠেছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে আচরণে মাত্রাধিক্য ঘটেনি তা নয়। কিন্তু তিলকে তাল ক'রে বলাও হয়েছে বহু জায়গায়। মন্দার পুরো দায়িত্বটি পুরোপুরি শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া অদ্ভুত প্রস্তাব: এক ঢিলে দুই পাখি এভাবে ঘায়েল হবার নয়। ভৌগোলিক ও আবস্থানিক যে-যে কারণে পশ্চিম বাংলায় শিল্পের পত্তন এবং প্রসার, সেগুলি রাতারাতি উবে

যাওয়ার নয়। বাংলা দেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিলে লাভের বহরও অন্তর্হিত হবে, মনে-মনে শিল্পপতিরা সেটা ভালোই জানেন।

তবু স্বীকার করতে হয়, একধরনের কাকতালীয়তা দেখা দিয়েছে, বাইরে থেকে নতুন মূলধন বাংলা দেশে ঠিক আগের মতো বিনিয়োগ করা হচ্ছে না। জুজুবুড়ির ভয় নিশ্চয়ই এর জন্য খানিকটা দায়ী। এই অঞ্চলে বামপন্থী দলগুলি এমনিতেই বরাবর প্রভাবশীল, ইদানীং তাদের প্রভাব আরো বেড়েই চলেছে কেন্দ্র ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে, বাংলা দেশে অদূর ভবিষ্যতে কী হবে বলা যায় না, ইত্যাকার চিন্তার ফলে কিছু-কিছু শিল্পপতি বাংলা দেশে র'য়ে-স'য়ে নতুন মূলধন খাটাচ্ছেন। তাঁদের মনে ভয়, অজানার ভয়, যে-ভয় স্বাভাবিক।

কিন্তু এখানেই খটকা। আমরা বাঙালিরা তা হ'লে কী করবো? বামপন্থার দিকে ঝুঁকলে পুঁজিপতিরা ঘাবড়ে যাবেন, আমাদের রাজ্যে মুনাফা পুনর্নিয়োগ করা থেকে নিবৃত্ত হবেন, আমাদের মহা অসুবিধা দেখা দেবে। কিন্তু তা ব'লে কি আমরা ভালো ছেলে ব'নে যাবো, সমাজপরিবর্তনের কল্পনা বিসর্জন দেবো, বামপন্থাকে পরিত্যাগ ক'রে জনসংঘ-কিংবা-ঐ-গোছের-কোনো-রাজনৈতিক-প্রতিক্রিয়াশীল-গোষ্ঠীর ছায়ায় আশ্রয় খুঁজবো, শিল্পপতিরা তখন খুশিমনে ফিরে আসবেন, আমাদের উপর দু'হাত উদার করে প্রসাদ ঢালবেন? যেহেতু বাইরের লোকেরা পছন্দ করছেন না, এবং তাঁরা পছন্দ না-করলে আপাতত আমাদের বৈষয়িক ক্ষতি, অতএব আমরা আমাদের বিবেক বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণ করবো, শ্রমিকদের সংগঠিত হ'তে দেবো না, আর্যাবর্তের চিন্তাধারার অষ্টাদশশতকীয়তার অঙ্গে আমাদের 'বিপজ্জনক' চিন্তার সূত্রগুলিকে পিষ্ট ক'রে আনবো?

আমার মনে অন্তত কোনো দ্বিধা নেই। ভারতবর্ষ এগোক না-এগোক, বাংলা দেশ তার নিজের প্রতিভার ঢল বেয়ে এগোবেই। বাংলা দেশের অধিকাংশ মানুষের যদি বামপন্থী চিন্তা-ও-কর্মধারায় আস্থা থেকে থাকে, তা হ'লে শিল্পপতিরা রাগ করবেন, মূলধন অন্যত্র

বিলি ক'রে দেবেন, এই আশঙ্কায় পিছুপা হ'লে চলবে না। অবশ্য প্রাথমিক হুমকিতে কাজ না হ'লে মালিকপক্ষের অনেকেই হয়তো সুর নরম করবেন। কিন্তু তা যদি না-ও করেন, বাংলা দেশের মানুষদেরই বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। রাষ্ট্রের সাহায্যে শিল্পসম্প্রসারণের আয়োজনে ব্যাপৃত হ তে হবে, এবং তা ছাড়া শত কৃচ্ছ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েও নিজেদের নির্ভরে সঞ্চয় সৃষ্টি ক'রে বিনিয়োগের উদ্যোগ করতে হবে। দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে যাঁরা অতীতে ভেবেছেন, এই সমস্যাটির প্রতি তাঁরা আদৌ এতদিন নজর দিয়েছেন ব'লে মনে হয় না। কিন্তু অতীতে কোনো-কিছু করা সম্ভব হয়নি, অতএব ভবিষ্যতেও হাত গুটিয়ে থাকতে হবে, এটা কোনো বিধানই নয়।

অবশ্য সব-গেল-সব-গেল ব'লে এখন যাঁরা চেঁচাচ্ছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আমার সামান্যতম সহানুভূতিও নেই, বাঙালি হিশেবে যেমন নেই, ধনবিজ্ঞানের ছাত্র হিশেবেও নেই। বাংলা দেশে যে-সব শিল্পপতিরা সাম্রাজ্য ফেঁদে বসেছেন, তাঁদের আচরণে ঔপনিবেশিক প্রবৃত্তি বরাবরই অত্যন্ত প্রকট। তাঁদের একমাত্র আগ্রহ আগেও যা ছিল, এখনো তাই: শোষণের অংশ বাড়িয়ে-বাড়িয়ে যাওয়া। যে-ভূমির সংস্থানে দাঁড়িয়ে তাঁরা লভ্যাংশ ঘরে তুলেছেন, তার উন্নয়নের জন্য কোনোদিন তাঁদের মাথাব্যথা দেখা দেয়নি। গবেষণার প্রসারে তাঁদের আগ্রহ প্রায় শূন্য; শ্রমিক সম্প্রদায় নতুন শৈলী আয়ত্ত ক'রে নিজেদের উৎপাদনক্ষমতা যাতে বাড়াতে পারে সে-রকম কোনো ব্যবস্থার কথাও তাঁরা কোনোদিন ভাবেননি। বাংলা দেশে যাঁরা মূলধন খাটিয়েছেন, বাংলা দেশের লোকদের সঙ্গে বরাবর তাঁদের বিযুক্তির সম্পর্ক: এই মূলধন-খাটিয়েদের মধ্যে মুষ্টিমেয় যে-ক'জন বাঙালি ছিলেন বা আছেন, তাঁদের মনোভাবেও কোনো ব্যত্যয় চোখে পড়েনি। আজ অবস্থা অন্যরকম, তাই তাঁদের আকুলি-বিকুলি: কিন্তু ইতিহাসের গতির ইশারাকে না-মেনে উপায় নেই।

কৃষির ব্যাপারেও একই ধরনের সমস্যা। ভারত সরকার কয়েক বছর আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কৃষির ক্ষেত্রে আপাতত উৎপাদন প্রধান লক্ষ্য, বণ্টনব্যবস্থা নিয়ে উপস্থিত মাথা না-ঘামালেও চলবে। এই সিদ্ধান্তেই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, ভূমিসংস্কারের প্রসঙ্গও কিছু দিনের জন্য উহ্য থাক। উৎপাদন বাড়াতে হবে: উৎপাদন বাড়ানোর জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছেন, উচ্চবিত্ত ভূস্বামী তথা জোতদারদের সব দিক দিয়ে মনোরঞ্জন করতে হবে —সস্তায় সার, উন্নত বীজশস্য, কীট-ও-ব্যাধি প্রতিষেধক, নামমাত্র হারে কৃষিঋণ, বিনামূল্যে কৃষিগত উপদেশ: আরো যা, কৃষিজাত মূল্যের দাম উঁচু পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করা হবে। জোতদারশ্রেণীর অতএব বহুপাক্ষিক লাভ: ভূমিসংস্কারের কথাবার্তা শিকেয় তোলা, সুলভে উৎপাদন বৃদ্ধির উপচারপ্রাপ্তি, জাত পণ্যের চড়া দরে বিক্রির ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের এমনধারা সিদ্ধান্তে কৃষির হাল হয়তো ফিরবে, হয়তো ফিরবে না; আগে থেকে প্রত্যয় ক'রে কিছু বলা মুশকিল। উচ্চবিত্ত ভূস্বামীরা যে-সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন, তা যদি তাঁরা সত্যি-সত্যি সদ্‌ব্যবহার করেন, দু'এক বছর আগে হোক, পরে হোক, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অন্য পক্ষে যদি তাঁরা এই সুযোগসুবিধাগুলি নিয়ে ছিন্‌তাই খেলেন, সস্তায়-পাওয়া কৃষিঋণ দাদন খাটাতে কিংবা শস্য মজুত রাখতে নিয়োগ করেন, সার চড়া দামে খোলাবাজারে বিক্রি ক'রে দেন, সেচের অপব্যবহার করেন, তা হ'লে ফসলের পরিমাণ স্বভাবতই তেমন-একটা বাড়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া, আরো-একটা মস্ত প্রশ্ন থেকে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশের পল্লী-অঞ্চলে অসাম্যের মাত্রা গত কয়েক বছরে ভীষণরকম বেড়ে গিয়েছে; জোতদাররা ফুলে কলাগাছ হচ্ছেন, বৈভবে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, কিন্তু ছোটো চাষী এবং ভূমিহীন কৃষক যে-তিমিরে সেই তিমিরে। ভারতবর্ষের গ্রামবাসীদের অন্তত তিন-চতুর্থাংশ কিংবা তারও বেশিকে বঞ্চিত রেখে কৃষি-উন্নয়ন আদৌ সম্ভব কিনা তা নিয়ে সংশয়বোধ আদৌ অযৌক্তিক নয়। এক বছর-দু'বছর

হয়তো উচ্চবিত্ত ভূস্বামীর জমিতে ফলন বাড়তে পারে, কিন্তু, কিছু দিনের মধ্যেই, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা। যাঁরা বর্ধিষ্ণু, তাঁরা সরকারের দৌলতে আরো ফেঁপে উঠবেন, ছোটো-ছোটো কৃষক এবং মজুরচাষীরা এক কোণে মুখ বুঁজে পড়ে থাকবে, এটা সহনীয় ব্যবস্থা নয়। প্রতিবাদ সোচ্চার হবেই। প্রতি রাজ্যে এই প্রতিবাদের রূপ একই বিভঙ্গে প্রকাশ পাবে না, প্রতিবাদের ওজন স্থানপাত্র বিশেষে তফাৎ হ'তে বাধ্য; কোনো রাজ্যে হয়তো দু'দিন আগে, কোথাও দু'দিন পরে অভিযোগের রোল রণিত হবে। দিনমজুর ও নিম্নবিত্ত কৃষকদের সংগঠন যেখানে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়, সেখানে প্রতিবাদ তীক্ষ্ণতর হওয়ার সম্ভাবনা; অন্যত্র হয়তো সংগঠনের সম্প্রসারণের প্রতীক্ষায় বেশ-কিছু দিন এখনো অতিবাহন করতে হবে।

পশ্চিম বাংলায় কৃষক আন্দোলন দানা বেঁধেছে। সংকীর্ণ স্বার্থে যদিও কেউ-কেউ এখানে-ওখানে এই আন্দোলনকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন, তা হ'লেও মানতেই হয় আন্দোলনের প্রধান উৎস ছোটো চাষী এবং ভূমিহীন কৃষকের পুঞ্জীভূত অভিযোগ। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি-এবং-ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে যে-ফতোয়াই দিন না কেন, বাংলা দেশের মানুষকে সেই অনাচারের অংশভাগী হ'তেই হবে, কোনো সংহিতাতেই সে-রকম অনুশাসন লিপিবদ্ধ নেই। উৎপাদন অবশ্যই জাতির উৎকীর্ণ লক্ষ্য, কিন্তু বণ্টনের জন্যই উৎপাদন, যে-উৎপাদনব্যবস্থায় দেশের অধিকাংশ মানুষ তুলনায় দীনতর হয়ে পড়েন, তাকে মেনে নিতে অনেকের বিবেকগত, নীতিগত, বুদ্ধিগত আপত্তি থাকতে পারে। কৃষি-উৎপাদনের দায়িত্ব আমাদের সংবিধান-অনুযায়ী প্রায়-সম্পূর্ণই রাজ্য সরকারের কুক্ষিগত: কেন্দ্রীয় বিধান পাল্টানোর প্রস্তাব তাই মোটেই অক্ষমার্হ নয়। বাংলা দেশের জনসাধারণ সমগ্রভাবে বিচার ক'রে যদি স্থির করেন, গ্রামাঞ্চলে অসাম্য বাড়তে দেওয়া হবে না, জোতদারদের প্রতাপ প্রতিহত করতে হবে, সেই বিচারকে ফলশ্রুত করার অখণ্ড অধিকারও তাঁদের আছে,

থাকবে। যদি রাজ্যের বাইরে থেকে এ-বিষয়ে কেউ নাক গলাতে আসেন, উদগ্র প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ানো তা হ'লে বাঙালিদের কর্তব্য। এই কর্তব্য থেকে আমরা যেন ব্রাত্য না হই।

মানছি, অভিযোগ উঠবে আমি সমস্যার পুরো দায় কেন্দ্রের, এবং বাংলার বাইরে থেকে নাক-গলিয়েদের, উপর চাপিয়ে সস্তায় বাজি মাত করতে চাইছি। বলা হবে, নানা ধরনের যে-যে চিন্তা-উৎকণ্ঠা-বাদানুবাদ দেখা দিয়েছে, সে-সমস্তের সঙ্গে শ্রেণীবিভাজনের সমস্যা জড়ানো, বাঙালিদের নানা সম্প্রদায়ই নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি শুরু করেছেন, কেন্দ্র নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র : কেন্দ্রের শুধু দায়িত্ব, আইন-শৃঙ্খলা যাতে ভয়ংকররকম ভেঙে না-পড়ে, এবং বহিঃশত্রুরা যাতে ভিতরের গোলযোগের সুবিধা নিতে না-পারে, সেজন্য প্রহরায় থাকা।

কিন্তু নিরপেক্ষতারও রকমফের আছে। চেতনায় এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে যেখানে অনেকটাই আড়াআড়ি, আবেগ সেখানে এসে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে দাঁড়ায়, আচরণে-বিচরণে তার ছায়া অতএব স্বতই পড়ে। বাঙালিদের অন্তর্লীন দ্বন্দ্বের কোনো গণতান্ত্রিক সমাধান নিশ্চয়ই সম্ভব, কিন্তু সে-সমাধানের ভার বাঙালিদের উপরেই ছেড়ে দিতে হবে। অধিকাংশ বাঙালি যদি মনে করেন কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিনীতি অশুদ্ধ, জোতদার-ভূস্বামীদের সংরক্ষণে যদি তাঁদের আপত্তি সোচ্চার হয়, যদি তাঁরা ভূমিসংস্কারের হেজে-যাওয়া প্রস্তাবকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে শাণিত ক'রে তুলতে ইচ্ছুক থাকেন, তা হ'লে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীরা কী ভাবছেন, অথবা কেন্দ্রীয় নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রইলো কিনা, সে-সব চিন্তা অবান্তর ; শুধু তা-ই নয়, গর্হিতও।

কাছাকাছি অন্য-একটি প্রসঙ্গে আসি ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ প্রবল ; স্মৃতিতে-ঐতিহ্যে-সাহিত্যে-ভৌগোলিক সখ্যে আমরা পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছি। জাতীয় সংহতি অবশ্যই মহৎ লক্ষ্য : আমরা যে আলাদা হয়েও একত্র,

তার সম্পূর্ণ স্বীকৃতি সব দিক থেকেই কাম্য। কিন্তু একত্র হওয়া এবং একীভূত হওয়া এক কথা নয়। আমাদের আলাদা-আলাদা সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে এই একীকরণ সম্ভব নয়। ভাষার ব্যাপার নিয়ে আপাতত যে-শোকান্তিক পর্ব চলছে, তা থেকেই বোঝা যায় বর্গিবাজি ক'রে মিলন ঘটানো যায় না দেশের সর্বত্র যে-যে বিশেষ প্রতিভার বিচ্ছুরণ, তাদের প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য মেনে নিয়েই তবে সম্মিলিত যাত্রা সম্ভব। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও সেই একই যুক্তি। বাংলা দেশে যদি আমাদের আদর্শ-কল্পনা-স্বপ্ন একটু অন্যরকম হয়, সংহতির দোহাই দিয়ে তাদের মাটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা পণ্ডশ্রমে দাঁড়াবে। প্রতিভাকে ঢেকে রাখা যাবে না, শত বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও তা বিকশিত হবে, দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হবে। এই বিকাশের সুযোগ যাঁরা দিতে চান না, যাঁরা ভারতবর্ষের সব অঞ্চলের সবাইকে একই রকম ভাবতে, করতে, চলতে, চালাতে বদ্ধপরিকর, তাঁরাই আসলে দেশের সর্বনাশ ডেকে আনছেন, তাঁরাই সত্যিকারের দেশদ্রোহী।

প্রায়ই, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশের বাইরে, এঁর-ওঁর-তাঁর মুখে আক্ষেপ শোনা যায়, পশ্চিম বাংলায় সর্বনাশের আর বিশেষ বাকি নেই তরুণ-ও-ছাত্রসম্প্রদায় ব'খে গেছে, ব'খে গিয়ে উগ্র রাজনৈতিক পন্থা গ্রহণ করেছে, দেশকে এরা অচিরে বিদেশী শত্রুর হাতে তুলে দেবে, এদের মধ্যে দেশপ্রেম ব'লে কিছু নেই, অন্ধ মতাদর্শের তাড়নায় এরা বিদেশী ঠাকুরকে বরণ ক'রে নিয়েছে : দেশকে যেহেতু এরা অস্বীকার করেছে, অতএব নির্মম হ'তে হবে, নির্মম হয়ে এদের ঝাড় সমূলে উৎপাটন করতে হবে। কথাগুলি বলা সহজ, বিশেষ ক'রে অন্ধ আবেগের মুহূর্তে আরো বেশি সহজ। কিন্তু কেউ-কেউ আবেগের অন্ধকার হ'তে বেরিয়ে আসতে অক্ষম ব'লে যুক্তির সততা বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয়। উগ্র মতাদর্শে ভক্তি বাংলা দেশের যুবক-কিশোরদের চিরকালীন ঐতিহ্য : দেশ, দেশের সাধারণ লোক, জাতির স্বাধীন সত্তা, জাতীয় গৌরব, এই সমস্ত-কিছু সম্বন্ধে আপ্লুত

প্রেম থেকেই অধিকাংশ সময় উগ্রপন্থায় তরুণসম্প্রদায়ের আস্থার উৎস। এটা বয়সের ধর্ম : যে-আদর্শে পৌঁছুতে চাই, যথাশীঘ্র পৌঁছুতে চাই, সময়ের সঙ্গে চলানি নয়, শত্রুর সঙ্গে সাময়িক বোঝা-পড়া নয়, মধ্যপথে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নয়, এক্ষুণি সংগ্রাম, সম্মুখসংগ্রাম, যে-সংগ্রামের উপান্তে লক্ষ্যের অমরাবতীতে পৌঁছনো। আজ যাঁরা তারুণ্যের দ্বারপ্রান্তে, এমন আদর্শের অসহ্য আনন্দে তাঁদেরই পিতামহরা ক্ষুদিরাম-অরবিন্দের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁদেরই পিতারা সুভাষচন্দ্রের সম্মোহনে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। পিতা-পিতামহের ধর্ম থেকে বাংলা দেশের যুবসম্প্রদায় মোটেই বিচ্যুত হননি : দেশপ্রেম এখনো আদর্শের মধ্যবিন্দু জুড়ে অবস্থান করছে। কিন্তু দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি তথা অভিনিবেশ বদলেছে : যা পরাধীনতা-পাশ থেকে মুক্তিলাভের পিপাসায় একদা আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দোলায়িত করতো, এখন তা সমাজবিপ্লবের একাগ্র স্বপ্নে এসে স্থিত হয়েছে। অতীতে বাঙালি যুবকরা আদর্শের উৎস খুঁজেছেন গ্যারিবল্ডি-ম্যাৎসিনির জীবনচর্চায়, ম্যাকস্যুইনীর আত্ম-ত্যাগে, ডি ভ্যালেরার বৈপ্লবিক শৌর্যে। উপস্থিত মুহূর্তে যদি আদর্শের প্রতিভু হিশেবে অন্য-কোনো দেশের সফল বিপ্লবকে তুলে ধরা হয়, তাতে দোষাবহ কিছু নেই।

কেন্দ্রের কর্তারা যা ভাবছেন, দেশের অন্যান্য জায়গায় রাম-শ্যাম-যত্ন যে-আদর্শ মাথায় পেতে নিয়েছেন, আমাদেরও মাথা নিচু ক'রে তা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে নিতে হবে, এই অসহিষ্ণু সূত্রের নিগড় থেকে মুক্তি প্রয়োজন, নইলে এই বিরাট দেশ ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে যাবে। আপনার দেশপ্রেমকে আমি সম্মান জানাবো, কিন্তু আমার দেশপ্রেমকেও আপনাকে সমান ভক্তিতে স্বীকার ক'রে নিতে হবে ; আমি আর আপনি দুজনেই ভারতবাসী হ'লেও আমাদের আদর্শ ভিন্ন হওয়া সব-সময়ই সম্ভব, সেই সম্ভাবনা আমার সঙ্গে আপনাকেও মানতে হবে। কী ভাষাচর্চার ব্যাপারে, কী শিল্প-অথবা-কৃষি-উন্নয়নের প্রসঙ্গে, কী সমাজের কাঠামো-পরিবর্তনের সমস্যাচিন্তায়,

আমাদের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিতে হবে : বাঙালি হয়ে আমি এই স্পষ্টভাষণ করছি, কিন্তু ভারতবাসী হিশেবেও আমার অভিমত অন্যতর হবার নয়। আমার বাঙালি সত্তা নিয়ে যদি আমি মাথা তুলে বাঁচতে না-পারি, তা হ'লে ভারতবর্ষও আমার কাছে মিথ্যে হয়ে যাবে।

আমাদের প্রকাশনার পূর্ণ তালিকা

পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো।

আমাদের প্রকাশনার পূর্ণ তালিকা

গল্প-সংগ্রহ

চেখভ/অসিত সরকার

চেখভের সেরা প্রেমের গল্প ২৫.০০

মপাসাঁ/গীতা গুহ রায় ও অরুণ চক্রবর্তী

মপাসাঁর সেরা প্রেমের গল্প ৩০.০০

সমারসেট মম/বাণী বসু

মমের সেরা প্রেমের গল্প ২৪.০০

তারাপদ রাহা পরিবেশিত

আরব্য রজনী : ১ম পর্ব ৩০.০০

আরব্য রজনী : ২য় পর্ব ৩০.০০

আরব্য রজনী : ৩য় পর্ব [৩য়, ১০ম, ১১শ ও ১২শ খণ্ড একত্রে] ৩২.০০

আরব্য রজনী : ৪র্থ পর্ব [১৩শ, ১৪শ, ১৫শ ও ১৬শ খণ্ড একত্রে] ৩২.০০

আরব্য রজনী : ৫ম পর্ব [যন্ত্রস্থ]

আরব্য রজনী : ২য়, ৩য় এবং ১০ম থেকে ১৬শ খণ্ড প্রতি খণ্ড ৮.০০

সোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভ্যু ভিন্সির দেশে ও আরও কিছু ১০.০০

সুশীলকুমার দাশগুপ্ত সংগৃহীত

বীরবলের গল্প [যন্ত্রস্থ]

উপন্যাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপসী বিহঙ্গিনী ৫.০০

বিমলজ্যোতি দাস

মঞ্জরী ও মধুকর ৫.০০

অমিয়া চক্রবর্তী

প্রেমের রং ময়ূরকণ্ঠী ৫.০০

সুধাংশু ঘোষ

ফানুসের উপমা ৩.০০

অজিতকৃষ্ণ বসু

শেষ বসন্ত (পেপারব্যাক) ১.৫০

বনশ্রী রায়

ধান শুধু ধান ৪.০০

শিপ্রা দত্ত

আলোছায়ার অন্তরালে ৬.০০

বাণভট্ট/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

কাদম্বরী ৩০.০০

কাওআবাতা/সন্দীপকুমার ঠাকুর

তুষারগ্রাম ৬.০০

নাবোকভ/দেবব্রত রেজ

প্রজাপতি জীবন ৬.০০

কবিতা-সঞ্চয়ন

এজরা পাউণ্ড/সুশীলকুমার দাশগুপ্ত

মুখবন্ধ : কে. সি. লাহিড়ী

এজরা পাউণ্ডের নির্বাচিত কবিতা (মূল রচনা সহ) ৩০.০০

ডাঃ গোপালকৃষ্ণ সরাফ/ সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

মুখোসের মুখ ১০.০০

সন্দীপকুমার ঠাকুর, শ্রীমতী এইকো ঠাকুর ও সুশান্তকুমার বসু অনূদিত

জাপানী কবিতাগুচ্ছ

কোটি পাতার ছন্দ ১৫.০০

নাটক

গোপীনাথ নন্দী

উমাবনম্ (একত্রে চারখানি নাটিকা) ১০.০০

বের্টোল্ট্ ব্রেশট্/অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

মালবাজারের মা-মালতী ১৫.০০

রম্য-রচনা

প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়

[প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি : কলকাতা হাইকোর্ট]

রাস্তা ৮.০০

অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা

ডঃ অশোক মিত্র

[প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী : পশ্চিমবঙ্গ সরকার]

সমাজসংস্থা আশানিরাশা ১৮.০০

সাহিত্য-সমালোচনা

ডঃ ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়

শরৎ-সাহিত্যের স্বরূপ ১৮.০০

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্য ১০.০০

শিল্পচর্চা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাগেশ্বর-শিল্প প্রবন্ধাবলী

[যন্ত্রস্থ]

প্রবন্ধ

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক ৬.০০

শচীন্দ্র মজুমদার

বিবাহ-সাধনা ৩.৫০

চরিত্র-চিত্রণ

বাণভট্ট/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

হর্ষ চরিত ২২.০০

দণ্ডী/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

দশকুমার চরিত ১৬.০০

নির্মলরঞ্জন মিত্র

সেরা মানুষ দাদাঠাকুর ১৮.০০

নিখিল সেন

নবপত্র : সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

ইন্দিরা দূরদর্শিনী ২২.০০

অপরাধ-তত্ত্ব

ডঃ সুকুমার বসু
মুখবন্ধ ঃ প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়
[প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ঃ কলকাতা হাইকোর্ট]
অপরাধ ও অপরাধী ১২.০০

ধর্মতত্ত্ব

কালীপদ সরকার
মুখবন্ধ ঃ ত্রিপুরারি চক্রবর্তী
কৃষ্ণ-কথা চিরন্তনী ১২.০০

ডঃ সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত
মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ ১২.০০

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বকসী
সপ্তসিন্ধু ১০.০০

ভক্তি-গীতি

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়
মায়ের গান ৩.০০

জীবনী-স্মৃতিকথা

সরলা দেবী চৌধুরানী
মুখবন্ধ ঃ ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
জীবনের ঝরাপাতা ২৫.০০

পাবলো নেরুদা/ ডাক্তার ভবানীপ্রসাদ দত্ত
অনুস্মৃতি ৩৫.০০

কালীপদ সরকার
ইতিহাস পুরুষ নেতাজী ২০.০০

বিমানেশ চট্টোপাধ্যায়
কালো চশমার আড়ালে ঃ রাজাজীর সঙ্গে হাজার দিন ৬.৭৫